আল-মামুন

মূল- আল্লামা শিবলী নুমানী

অনুবাদ- আখতার ফারুক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আল মামুন

মূল ঃ আল্লামা শিবলী নুমানী

অনুবাদ ঃ আখতার ফারুক

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

আল-মামুন

মূল ঃ আল্লামা শিবলী নুমানী

অনুবাদ ঃ আখতার ফারুক

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৪৯৪
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ৯২৩.১০২৯৭
তৃতীয় (ইফাবা প্রথম) সংস্করণ
আশ্বিন ১৩৯৪
সফর ১৪০৮
অক্টোবর ১৯৮৭
প্রকাশক ঃ
অধ্যাপক আবদুল গফুর
প্রকাশনা পরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০
প্রচ্ছদ ঃ দেলওয়ার হোসেন
মুদ্রণ ঃ
খান প্যাকেজিং এণ্ড প্রিন্টিং
৬৭, পুরানা পল্টন লেন,
ঢাকা-১০০০
বাঁধাই ঃ ইউসুফ এণ্ড কোং
৮১, পাতলা খান লেন, ঢাকা-১
মূল্য ঃ ৩২.০০

AL MAMUN : A Life History of Caliph Al Mamun written by Allama Shibli Numani in Urdu and Translated into Bengali by Akhter Faruque and Published by Prof. Abdul Ghafur, Director Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka, Bangladesh. October 1987
Price : Tk. 32.00 U.S. $: 2.50

ইফাবা/৮৭-৮৮/প্র-৫৬৩৩/৫২৫০

প্রকাশকের কথা

আল্লামা শিবলী নুমানী লিখিত আব্বাসীয় শাসক আল মামুন-এর জীবন-কাহিনীর অধ্যাপক আখতার ফারুক কৃত বাংলা তরজমা 'আল-মামুন'। এ কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদ শিবলী নুমানীর লেখা এ গ্রন্থে আল-মামুনের চরিত্রের বিভিন্ন দিক অত্যন্ত সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে। অনুবাদ সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ। আশা করি, সেকালের জ্ঞানচর্চার ইতিহাস জানা ও আল-মামুন সম্পর্কিত কৌতূহল নিবৃত্তিতে গ্রন্থখানি অত্যন্ত সহায়ক হবে। আল্লাহ্ আমাদের সঠিক পথ চিনে নিতে সাহায্য করুন।
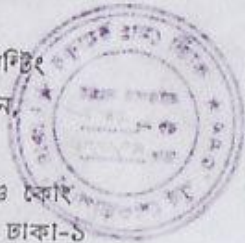
অনুবাদকের বক্তব্য

কিংবদন্তীর মহান নায়ক খলীফা হারুন-অর-রশীদের সুযোগ্য পুত্র খলীফা মামুন-অর-রশীদ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও প্রসারের জন্য পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। ইসলামী দর্শনের সঙ্গে গ্রীক দর্শনের সংমিশ্রণজাত মু'তাযেলী মতাদর্শের বিকাশ ও সম্প্রসারণের ব্যাপারটি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় তুঙ্গে উঠেছিল। মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা ইসলামের প্রতিটি ব্যাপার, এমনকি আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণের ব্যাপারটি পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করার এক প্রবল প্রবণতা তখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। কুরআন কি অবিনশ্বর, না নশ্বর, সে বিতর্কের প্রবল বাত্যায় অবশেষে আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) -কে সে যুগে শাহাদত বরণ করতে হয়েছে। তেমনি আহলে সুন্নত-আল-জামাআতের আরও অনেক মনীষীকে চরম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। তাতেও ইসলামের বিরাট লাভ হয়েছে। উভয় দিক থেকে প্রচুর গ্রন্থ রচিত হয়েছে স্ব স্ব মাযহাব ও মতবাদকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। বলাবাহুল্য, সেগুলো আজ গোটা জাতির অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়েছে।

উপমহাদেশের সাম্প্রতিককালের সেরা ইতিহাসবেত্তা ও গবেষক আল্লামা শিবলী নুমানী হয়ত এ কারণেই আল মামুনের জীবনেতিহাস রচনা করে গেছেন। তাঁর সৃষ্ট নুদওয়াতুল মুসান্নেফিন-এর পণ্ডিতবর্গ মিল্লাতের ইতিহাস রচনার যে গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন করে গেছেন, জাতির ইতিহাসে তা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে উৎকীর্ণ থাকবে। তাঁদের সৃষ্ট সীরাতুন্নবী, সীরাতে সাহাবা, সাহাবিয়াত ইত্যাদি জাতির ঐতিহ্যকে মজবুত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে গেছে। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন তাদের সীরাতে সাহাবা ও সীরাতে সাহাবিয়াত-এর বংগানুবাদ প্রকাশ করেছে। ঢাকার প্যারাডাইজ লাইব্রেরী সীরাতুন্নবীর বঙ্গানুবাদ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়ে মাঝ পথে থেমে গেছে। এটা প্রকাশের ব্যবস্থাও ফাউণ্ডেশনের তরফ হতে হলে হয়ত কাজটি পূর্ণত্বপ্রাপ্ত হত। যা হোক, আল মামুন প্রকাশ করে ফাউণ্ডেশন এ ব্যাপারে অন্তত তাদের আরও কিছু দায়িত্ব পালন করল।

আল মামুন-এর এটা তৃতীয় সংস্করণ। অপর দুই সংস্করণ পর্যায়ক্রমে [illegible] কিতাব ঘর ও বুক সোসাইটি ছেপেছিল। এবারে ফাউণ্ডেশন [illegible] ছাপায় আশা করেছিলাম তা মুদ্রণ প্রমাদমুক্ত হবে। দুর্ভাগ্য [illegible] প্রমাদের ভূত এখানে এসেও হানা দিতে ছাড়েনি। আশা করি [illegible] সংস্করণে তার পুনরাবৃত্তি হবে না। আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে [illegible] দ্বারা উপকৃত হবার তওফীক দিন—আমীন।

বিনীত
আখতার ফারুক

উৎসর্গ

মুদ্‌ওয়াতুল মুসান্নেফীনের মরহুম
মনীষীবর্গের মাগফিরাত
কামনায় নিবেদিত

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

ভূমিকা

যুগ বদলের সাথে সাথে মুসলমানদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যও অনেকটা বদলে গেছে—আজও যাচ্ছে। তবুও একটা বিষয় তাদের মধ্যে দেখা যায় যে, জাতীয় ঐতিহ্য নিয়ে আগে যেরূপ তারা গর্ব বোধ করত, জাতীয় ইতিহাস পড়ে যেরূপ তারা আনন্দ পেত ও আগ্রহ প্রকাশ করত, তা তাদের ভেতরে আজও বিদ্যমান রয়েছে। তারা বিশেষ খ্যাতির সাথে জাতীয় কাহিনীগুলো রক্ষা করে আসছে, তাদের ভেতরে সেগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করার পরম আগ্রহও পরিলক্ষিত হচ্ছে।

তবে, পার্থক্য হচ্ছে এই যে, এক শতাব্দী আগে যে ভাষা ছিল আমাদের জাতীয় ও সরকারী ভাষা, যা যুগ যুগ ধরে অব্যাহত গতিতে চলে আসছিল এবং তখনকার দিনে ইসলামী প্রেরণাও সবার ভেতরে যথেষ্ট ছিল বলে সেই ভাষায় জাতীয় ইতিহাসের সংখ্যাও ছিল অশেষ। তাই সেদিন ইসলামের বিস্ময়কর কাহিনীগুলো গল্পের মতই ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল। যেখানে সেখানে যখন তখন কথায় ও কলমে সেগুলোর ব্যাপক ব্যবহার চলত। ফলে, গোটা দেশের সাহিত্য-আলোচনা করলে দেখা যায়, তার প্রতিটি বাক্যই যেন আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত অথচ উজ্জ্বল একটা দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।

কিন্তু যে ভাষা আমাদের নিত্যকার প্রয়োজন মেটায়, তাতে সে যুগের তুলনায়, এমনকি প্রয়োজনের তুলনায়ও জাতীয় ইতিহাসের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। ভারতের অনেক ইতিহাসই লেখা হয়েছে। মোগলদের আর তৈমুরলঙ্গের বংশধরদের কীর্তিকলাপ খুব জাঁকালোভাবেই তাতে দেখানো হয়েছে। তবুও এ কথা না মেনে উপায় নেই যে, গোটা ভারতের ইতিহাসও আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটা ক্ষুদ্রতম অংশ বৈ নয়।

ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে আজ থেকে তেরশ' বছরের চাইতেও বেশ কিছু আগে। এই সুদীর্ঘকালের ভেতরে তার জয়-পতাকা কোথায় কখন উড্ডীন হল, কাদের মাথায় কবে মুকুট পরাল, কাদেরে নিয়ে কোন সিংহাসনে

ঘটাল, কত রাজ্য ভাঙল আর কতটাই বা গড়ল, কখন বনু উমিয়ার উত্থান ঘটাল, কখনই বা আব্বাসীয়দের তারকায় দ্যুতি ছিল, কোনদিন দায়লামের মাথায় তাজ রাখল, কোনদিনই বা সেলজুকদের জ্ঞান গরিমায় মহিমান্বিত করে তুলল, কোন যুগে আইউবীদের রোমক ও সিরিয়ার বিশাল সাম্রাজ্য ওলট-পালট করে ফেলার ক্ষমতা দিল, কোন যুগেই বা মুসলমীনদের জাগিয়ে তুলে ইউরোপকে পয়মাল করে দিল—এসবের ইতিহাস অনেক।

যদিও এসব ঘটনার পেছনে ছিল বহু দেশের বহু বংশের বহু মানুষের কীর্তিকলাপ, তবু তার মূলে ছিল ইসলাম। ইসলামের মহান ঐক্যসূত্র তাদের এক দেশের এক জাতিতে পরিণত করেছিল। তাই তাদের প্রত্যেকের ইতিহাসই আমাদের জাতীয় ইতিহাস হয়ে আছে। কিন্তু আমাদের ভাষায় সেসব তন্ন তন্ন করে খুঁজে পাব কি ?

আমাদের ভাষার এ দৈন্য দেখে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। যদিও এ ভাষা দিন দিন ধাপে ধাপে উন্নত হয়ে এমন কি উচ্চশিক্ষার বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হবার যোগ্যতাও প্রায় অর্জন করে ফেলেছে, তথাপি যে আলেম সমাজ আরবী ও ফার্সী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করে জাতীয় ইতিহাসের মূল সম্পদগুলোর একচেটিয়া মালিক-মুখতার সেজে বসেছেন, তাঁরা মাতৃভাষার দিকে আদৌ লক্ষ্য দিচ্ছেন না। বই-পুস্তক লেখা তো দূরের কথা, মাতৃ-ভাষায় চিঠিপত্তর লেখাও যেন তাঁরা পাপ মনে করেন।

আদপে, আমাদের মাতৃভাষাও অত্যাল্পকালের ভেতরে এত দ্রুত এগিয়ে গেছে যে, অনেকের মতই আমাদের সেই সাধাসিধে নেক বান্দারাও তার সাথে তাল সামলিয়ে চলতে পারেন নি। তাই আজ যখন তাদের কিছুটা সম্বিৎ ফিরেছে, তখন দেখতে পেলেন যে, এতদিনে তা সবদিক থেকেই ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে গোটা দেশের উপরে যথেষ্ট আধিপত্য জমিয়ে বসেছে। আমার তো আজও সন্দেহ জাগছে যে, আমাদের সে বুজুর্গরা হয়তো এখনও আরব্য রজনী ও পারস্য উপন্যাসের রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে চলছেন।

অবশ্য এ যুগের আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ সমাজ মাতৃভাষার মর্যাদা বুঝেছে। তাই তাদের ঐকান্তিক অভিলাষ হচ্ছে মাতৃভাষার চরম উন্নয়ন। তারই ফলে গোটা দেশের সাহিত্যে এক নবযুগের সূচনা দেখা দিয়েছে। আজ নিত্য-নতুন ধরনের বই বাজারে আত্মপ্রকাশ করছে।

কিন্তু যুগের মারপ্যাঁচে পড়ে যেহেতু আমাদের নবীন সমাজ আরবী ফার্সী শেখার সুযোগ থেকে একেবারেই বঞ্চিত রয়েছে, তাই তা থেকে তারা কোনই কল্যাণ অর্জন করতে পারছে না। জাতীয় ইতিহাসের সত্যিকারের মূল্যবান সম্পদগুলো তাই তাদের দৃষ্টির অন্তরালেই রয়ে গেল। অথচ তাদের অনুসন্ধিৎসু মন ও মগজ তো আর শূন্য থাকতে পারে না। তা পূর্ণ করতে অগত্যা তারা নাটক-নভেলের দিকে ঝুঁকে পড়ে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়ে চলেছে। এর ফলে মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে সন্দেহ নেই। তবে আক্ষেপের ও অনুধাবনের ব্যাপার হচ্ছে এই, আজ মাতৃভাষা যে আরবী-ফার্সী ভাষার বদলে আমাদের জাতীয় ভাষা হয়ে বসেছে, তা বিলায়ী ভাষার সব সম্পদ থেকেই বঞ্চিত রয়েছে। অথচ উত্তরাধিকার-সূত্রেই সেগুলো এ-ভাষার প্রাপ্য ছিল।

এসব দেখেশুনে বহু ভেবেচিন্তে বেশ কিছুদিন ধরে আমি একখানা বিস্তারিত ও পরিপূর্ণ 'ইসলামের ইতিহাস' লিখব বলে ইচ্ছা পোষণ কর-ছিলাম। কিন্তু, মুশকিল হল এই, সে জন্য ছোট-বড় সব বংশেরই বিস্তা-রিত ঘটনা উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়ে উঠছে না। অপরদিকে কিছু বাদ দিয়ে কিছু করার যৌক্তিকতাও খুঁজে পেলাম না। অবশেষে এ সিদ্ধান্তেই পৌঁছলাম যে, ইসলামের জগদ্বিখ্যাত বীর নায়কদের জীবন কাহিনী নিয়ে একটা সিরিজ বের করব। ইসলামে যত খিলাফত ও সুলতানাত এল আর গেল তাদের প্রত্যেক বংশের শ্রেষ্ঠতম খলীফা বা সুলতানের জীবনালেখ্য রচনা করব এবং তাদের জীবনধারাকে এ-ভাবে লিপিবদ্ধ করব যেন তাতে একাধারে ইতিহাস ও জীবনী উভয়ের বৈশিষ্ট্য সমাবিষ্ট হয়। এ উদ্দেশ্যে আমি যেসব রাজবংশের যাঁকে যাঁকে নির্বাচিত করেছি, তাঁদের নাম নিম্নে দেয়া হল :

	বংশ পরিচয় :	শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি :
১.	খুলাফায়ে রাশেদীন	দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.)
২.	বনু উমাইয়া	ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক
৩.	আব্বাসীয়া	মামুন আল রশীদ
৪.	বনু উমাইয়া (স্পেন)	আবদুর রহমান নাসের
৫.	বনু হামদান	সায়ফুদ্দৌলা
৬.	সেলজুক বংশ	মালিক শাহ
৭.	নূরীয়া বংশ	নূরউদ্দীন মাহমুদ জংগী

৮.	আয়ুবিয়া	সুলতান সালাহউদ্দীন
৯.	মুজেদীন (আন্দালুসিয়া)	ইয়াকুব ইবনে ইউসুফ
১০.	তুরস্কের তুর্কী বংশ	সুলায়মান দি গ্রেট

এসব ছাড়াও মুসলিম জাহানে আরও বহু বংশ রয়েছে যারা রাজমুকুট ও রাজতখতের অধিকারী হয়েছিল। কিন্তু, জেনেশুনেই আমি তাদের বাদ দিয়েছি। তাদের কতিপয় সম্পর্কে (যেমন গজনভী, মোগল ও তৈমুর বংশ) তো আমাদের দেশে বেশ কিছু বই-পুস্তক রয়েছে। আবার কোন কোন রাজবংশ মর্যাদা বা ন্যায়পরায়ণতার দিক থেকে ততখানি খ্যাতি অর্জন করেনি, যার জন্য তাদের জাতীয় বীর নায়কদের ভেতরে গণ্য করা যেতে পারে।

এ সিরিজের যে বইখানা এখন আমি জাতির সামনে পেশ করছি, তা হচ্ছে বিশ্ববিশ্রুত খলীফা মামুন আল রশীদ আব্বাসীর জীবনালেখ্য। এ বইয়ের নামও রাখা হল তাই আল মামুন।

অবশ্য এ ব্যাপারে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে না পারায় আমিও কম দুঃখিত নই। বিশেষত খুলাফায়ে রাশেদীন ও বনু উমাইয়া ছেড়ে তিন নম্বরের আলোচনা এক নম্বরে নিয়ে এলাম। আগামীতেও হয়ত এভাবে আমার দ্বারা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভবপর হবে না। তবে এ ধারণা দৃঢ়ভাবেই পোষণ করছি যে, জীবনকাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা যদি অনুকূল থাকে তা হলে গোটা সিরিজ ইন্‌শাআল্লাহ পূর্ণ করব।

মামুন আল রশীদের জীবনেতিহাস সম্পর্কে আরবী ভাষায় যত বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ রয়েছে, এ খণ্ড রচনার সময়ে সৌভাগ্যবশত তার অধিকাংশ গ্রন্থই আমার হাতে রয়েছে কিন্তু আমি স্পষ্টভাবেই স্বীকার করছি, বর্তমান যুগে ইতিহাস সৃষ্টির মান যতখানি উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং ইউরোপের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভংগি ইতিহাস রচনার মূলনীতি ও বিভিন্ন দিকে যেসব দর্শনসম্মত মানদণ্ড দাঁড় করিয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সেকেলে ধরনের ইতিহাসগুলো আদৌ যথেষ্ট নয়।

আবু জা'ফর জরীর তিবরী রচিত 'তারীখে কবীর' (১), মাসউদীর 'মুরাওয়াজুজ জাহাব' (২), ইবনে খালদুনের 'জর্যী' ইবনুল আসীরের 'কামিল', জাহাবীর 'দওলুল ইসলাম', সয়ুতির তারীখুল খুলাফা,'

কেরমানীর 'ওয়ুল ওয়াল হাসাইন' আখবারুদ দউল আব্বাসীর তারীখে ইবনে ওয়াজেহ', বালাজুরীর 'ফতুহুল বুলদান' (৩), ইবনে কুতায়বার 'মা'আরিফ ই'লামুল ই'লাম', 'আন্ নাজুমুজ জাহিরা' ইত্যাদি তথ্যপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য যেসব ইতিহাসগ্রন্থ ইসলামের ইতিহাসের ভেতরে শীর্ষ-স্থানীয় বলে মনে করা হয়, আব্বাসীয় বংশের বিশেষত আল মামুন সম্পর্কে জানবার জন্য সেগুলোর চাইতে গ্রহণযোগ্য আর কি হতে পারে ?

কিন্তু এসব ইতিহাস পড়ে যদি জানতে চান যে, সেকালের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থা কি ধরনের ছিল, শাসনক্ষেত্রে ও কোর্ট-আদালতে কি ধরনের আইন কানুন চলত, দেশের রাজস্ব কত ছিল, সামরিক শক্তির পরিমাণ কি ছিল,কি কি বিভাগ ছিল রাষ্ট্রের, এ সবের একটা খবরও তাতে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এমন কি তৎকালীন শাসনকর্তাদের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ও চরিত্র সম্পর্কে যদি জানতে চান, তারও এরূপ কোন বিস্তারিত আলোচনা সেসব গ্রন্থে মিলবে না, যা থেকে কারুর চরিত্র আপনার চোখে ভেসে উঠবে। তাতে যেসব ঘটনা খুব বাড়িয়ে লেখা হয়েছে, যা নিয়ে হাজার হাজার পৃষ্ঠা ভরে দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে কে কিভাবে গদী দখল করল গৃহবিবাদ হল কতটুকু, কত দেশ কে জয় করল, বিদ্রোহ কোথায় কখন মাথা চাড়া দিল, কার কখন চাকরী গেল আর হল ইত্যাদি। এ সব ঘটনাও আবার এরূপ জগাখিচুরী পাকিয়ে লেখা হয়েছে যে, না তার কোন কার্যকারণ খুঁজে বের করা যায়, না তা থেকে ইতিহাসের কোন সূক্ষ্ম পরিণতি বা ফলাফল বের করা যায়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, এই মামুন আল রশীদের শাসন-কালেই কয়েকটি বিদ্রোহ দেখা দেয়। এ সম্পর্কে যে ইতিহাসই হাতে নিন না কেন, বেশ বিস্তারিত আলোচনা দেখতে পাবেন। কিন্তু যদি খুঁজতে যান যে, কোন অন্তর্নিহিত কারণ থেকে এর সৃষ্টি হয়েছে আর কখন থেকেই বা তার বীজ অংকুরিত হল, তা হলে আপনি হতাশ হবেন এবং সেসব নিজকে মাথা খাটিয়ে আবিষ্কার করে নিতে হবে। বিশ্বের ইতিহাসের প্রতিটি ঘটনা বিভিন্ন ঘটনার সাথে কার্যকারণের সূত্রে গাঁথা রয়েছে। সেসব খুঁজে বের করা ও তার থেকে সমালোচনার দৃষ্টি নিয়ে ঐতিহাসিক ফলাফল বের করে নেয়াই হচ্ছে ইতিহাস বিজ্ঞানের মূল প্রাণ। ইতিহাস বিজ্ঞানের নব আবিষ্কার ও প্রয়োগের মাঝে ইউরোপীয়দের যে গৌরব করার রয়েছে, তা এসব নিয়েই।

এসব বলার উদ্দেশ্য অবশ্য আমার এ নয় যে, আগেকার যুগের ইতিহাস-বেত্তাদের সমালোচনা করছি। তাঁরা যা কিছু করে গেছেন, সে জন্যে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব বংশধররাই কৃতজ্ঞ থাকবে। কিন্তু যুগ প্রতিটি পদক্ষেপ এগিয়ে চলছে। কে বলতে পারে যে, কালকে যাকে উন্নতির চরম স্তর বলা হয়েছে, তাকে আজও তাই বলা হবে?

এ ছাড়া আরও একটা সুস্পষ্ট ব্যাপার এই, প্রত্যেক যুগের রুচি এক নয়। যেসব ব্যাপারকে আগেকার লেখকরা নেহাৎ নগণ্য ও উপেক্ষণীয় মনে করে পুস্তকে ঠাঁই দেয়া অমর্যাদাকর মনে করেছেন, আজ হয়ত আমরা তারই খুঁজে হয়রান। সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার থেকেই আজ আমরা আবিষ্কার করতে চাই সে যুগের সর্বসাধারণের জীবনধারা ও সমাজপদ্ধতি।

এই উদ্দেশ্যেই আমি পুস্তকের দুটো খণ্ড রেখেছি। প্রথম খণ্ডে সে সব সাধারণ ঘটনা সন্নিবেশ করেছি যা সাধারণত অন্যান্য ইতিহাসে করা হয়। মানে, মামুনের জন্ম, সিংহাসনারোহণ; উত্তরাধিকার লাভ, গৃহবিবাদ, বিদ্রোহ, রাজ্য জয় ও মৃত্যু। দ্বিতীয় খণ্ডে আমি মামুনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা এরূপ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি যা থেকে সেগুলো সম্পর্কে যে কেউ মোটামুটি একটা ধারণা নিতে পারে। যদিও এই বিশেষ অংশ সাজাবার সময়ে কোন বিশেষ ইতিহাসের অনুসরণ করা হয়নি। তবে বিভিন্ন অনুবাদ গ্রন্থ স্থানীয় ভৌগোলিক আলোচনার বই, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, চিত্রকলা ইত্যাদি যেখান থেকে যা পাওয়া গেছে তুলে নিয়েছি। সেক্ষেত্রেও এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে ভুলিনি যে, যা কিছুই লেখা হোক না কেন নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের ভিত্তিতে যেন লেখা হয়।

পাঠক বন্ধুরা যেন যথাস্থানে পৌঁছে একবার দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকাটাও দেখে নেন।

পটভূমি

মামুন আল রশীদের মূল ইতিহাস শুরু করার আগে আব্বাসীয় বংশের সিংহাসন লাভের গোড়ার অবস্থাটা সংক্ষেপে আলোচনা করে নেয়া আজ। কোন কোন ইতিহাসকার বনু উমাইয়াদের সিংহাসনচ্যুতি ও আব্বাসীয়দের সিংহাসন লাভের কাল মনে করেন একই। তা ছাড়া এ ব্যাপারে সার্বজনীন ধারণার আলোকেও এ কথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে আব্বাসীয়রা অকস্মাৎ প্রচণ্ড আঘাতে দীর্ঘ দিনের একটা শক্তিশালী রাজবংশকে ধ্বংস করে দিল। কিন্তু ইতিহাসের বিচারে এ কথা কল্পনাও করা যায় না যে, এত বড় একটা শক্তিশালী রাজবংশ মাত্র আকস্মিক এক আঘাতেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। এটাও কম আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে, রসুলের ঘনিষ্ঠ যারা যত বেশি খিলাফতের দাবী সর্ব-দাই তাদের ততখানি বেশি বিবেচিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে আব্বাসীয়দের এড়িয়ে কি করে বনু উমাইয়ারা সিংহাসন দখল করে বসল?

এ ব্যাপারটা বুঝাবার জন্যেই আমাকে খিলাফতের ধারা সম্পর্কেও মোটামুটি কিছুটা আলোকপাত করতে হবে। তা এমনিভাবে লেখা হবে যাতে করে সে সম্পর্কিত সব প্রশ্ন ও জটিলতার আপনা থেকেই অবসান ঘটবে। মূলত তা হবে খিলাফতের রাজনৈতিক দিক সম্পর্কে ইতিহাস দর্শনের মূল রহস্য।

রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আবির্ভাবের আগে আরবের সকল শক্তি ও গৌরবের কেন্দ্রে ছিল কুরায়েশ বংশ। কিন্তু কুরায়েশরাও সমান দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। বনু হাশিম ও বনু উমাইয়া। আল্লামা ইবনে খালদুনের মতামতে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দিক থেকে সর্বদা বনু হাশিমের ওপরে উমাইয়ার স্থান ছিল। তবে রসূলে-খোদার আবির্ভাবের ফলে বনু হাশিম প্রতিদ্বন্দ্বীদলের ওপরে মর্যাদা লাভ করে এবং দুনিয়ার চোখে তারা গৌরবোজ্জ্বল রূপে ধরা দেয়।

রসূলে খোদার তিরোধানের পরে খিলাফত নিয়ে ঝগড়া সৃষ্টি হল,

তখন আপাতত সবাই আবুবকর সিদ্দীক (রা.)-কে খলীফা হিসেবে মেনে নিল। তার পরেও বনু হাশিম তাদের খিলাফতের ব্যাপারে অগ্রগণ্যতার দাবী বিস্মৃত হয়নি। তারা এ ব্যাপারে তাদের ব্যর্থতার জন্যে যেরূপ আশ্চর্যবোধ করছিল, তেমনি অনুতপ্তও ছিল।

যা হোক, হযরত আবুবকর (রা.)-এর পরে অবশ্যই তারা পূর্ব ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে অগ্রসর হ'ত। কিন্তু হযরত আবুবকর (রা.) যখন সবাইকে ডেকে যথারীতি হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতের জন্যে শপথ নিলেন, তখন তাদের সে পরিকল্পনাও ব্যর্থ হল। হযরত উমর (রা.)-ও আবার তাঁর ইন্তে কালের সময়ে ছ'জন নিরপেক্ষ জননায়কের ওপরে তাদের ভেতর থেকে পর-বর্তী খলীফা নির্বাচনের ভার দিয়ে গেলেন। হযরত আলী (রা.)-ও তাদের অন্যতম ছিলেন। তবুও হযরত আব্বাস (রা.) তাঁকে পরামর্শ দিতে কসুর করেন নি যে, একজন সমর্থক না থাকলেও যেন তিনি তাঁর খিলাফতের দাবী থেকে চুলমাত্র বিচ্যুত না হন। তিনি যাতে ভাগ্যের উপরে বংশের দাবী ন্যস্ত না করেন সেজন্য তাঁকে সতর্ক করে দেয়া হয়। কিন্তু হযরত আলী (রা.) ছিলেন নিঃস্বার্থ সত্যের সৈনিক। সবার বিরুদ্ধে গিয়ে একা কোন কিছু নিয়ে দাঁড়াবার পরামর্শকে তিনি আদৌ পছন্দ করলেন না। তাই সবার পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত হয়ে আবদুর রহমান বিন আওফ যখন হযরত উসমান (রা.)-এর হাতে হাত দিয়ে তাঁর ওপরে খিলাফতের দায়িত্ব বর্তালেন, তখন হযরত আলী (রা.) ধৈর্যধারণ করে সেই ভাগ্যলিপি অম্লান বদনে মেনে নিলেন।

হযরত আবুবকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) হাশেমী ছিলেন না, উমাইয়া বংশেরও ছিলেন না। তাই তাঁদের খিলাফতের সময়ে বনু হাশিম বা বনু উমাইয়া কোন বংশের লোকেরই বিশেষ কোন ভূমিকা ছিল না।

হযরত উসমান (রা.) খিলাফতের তখতে আরোহণ করেই বনু উমাইয়াদের হাতে বড় বড় দায়িত্বগুলো অর্পণ করলেন। আমীর মুআবিয়া (রা.) অবশ্য আগেও সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন। তবে এ সময়ে তাঁর ক্ষমতা এতখানি চরমে পৌঁছেছিল যে, তাঁকে স্বাধীন নরপতি বললেও অত্যুক্তি হয় না।

হযরত উসমান (রা.) প্রায় বার বছর খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যদিও খিলাফতের শেষ দিকে স্বজনপ্রীতির অভিযোগে তিনি জনপ্রিয়তা হারিয়েছিলেন, এমন কি শেষ পর্যন্ত তাঁকে শাহাদৎ বরণ করতে

হয়েছিল, তথাপি তাঁর দীর্ঘকাল খিলাফত পরিচালনার ভেতরে বনু উমাইয়ারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভূত ক্ষমতা অর্জন করে নিয়েছিল।

এর ফলেই দেখা যায় যে, হযরত আলী (রা.)-র খিলাফতের যুগে হযরত মুআবিয়া সহজেই নিজকে শাসনকর্তা বলে ঘোষণা করতে সমর্থ হলেন। ব্যক্তিত্ব ও ধর্মীয় মর্যাদার বিচারে হযরত আলী (রা.)-র সাথে হযরত মুআবিয়ার কোন তুলনাই হতে পারে না, তথাপি অনেকদিন ধরে তিনি হযরত আলী (রা.)-র সাথে সামনে মুকাবিলা করে শাসনকার্য চালিয়েছিলেন। এমন কি উভয়ের ভেতরকার যুদ্ধ-বিগ্রহের শেষ ফলও আমীর মুআবিয়ার অনুকূলে দেখা দিয়েছিল।

এখান থেকেই ইসলামের ইতিহাসে বনু হাশিম ও বনু উমাইয়া বংশ প্রতিদ্বন্দ্বী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল এবং দু' দলের ভেতরে ধারাবাহিক ক্ষমতার লড়াই শুরু হল। ইমাম হাসান (রা.) অবশ্য আপোষমূলক মনোভাব নিয়ে এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে খিলাফতের দাবী থেকে বিরত রইলেন। ফলে আমীর মুআবিয়া একচ্ছত্র শাসন-ক্ষমতার অধিকারী হলেন।

ঠিক তখুনি আবার বনু হাশিম ও হযরত আলী (রা.)-র ভক্তরা ইমাম হুসায়েন (রা.)-কে খলীফা নির্বাচিত করার প্রয়াস পেল। ইমাম হুসায়েন (রা.) তাতে অসম্মতি প্রকাশ করায় তারা মিলে তাঁর দূর সম্পর্কীয় ভাই মুহাম্মদ বিন হানিফার হাতে গোপনে আনুগত্যের শপথ নিল। পরে বিভিন্ন শহরে তারা প্রচারক মনোনীত করে বা-দস্তুর পাল্টা খিলাফত কায়েম করে নিল।

এরপরে ইমাম হুসায়েন (রা.)-কে কেন্দ্র করে কারবালায় যে হৃদয়বিদারক ঘটনা অনুষ্ঠিত হল আমি তা নতুন করে বলা প্রয়োজন মনে করি না। দুঃখের বিষয় এই, কারবালার সেই শিক্ষণীয় লোমহর্ষক ঘটনা হাশিমী বংশের স্মরণীয় সবকিছুই স্মৃতির আড়াল করে দিল। বেশ কিছুকালের জন্যে এ ভরসা সবাই ছেড়ে দিয়েছিল যে, এই পবিত্র বংশ থেকে কখনও আবার খিলাফতের দাবী উত্থাপিত হতে পারে।

ইমামদের মৃত্যুর পরে মুহাম্মদ বিন হানফিয়ার দল হয়তো তাদের গুপ্ত পাল্টা সরকার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করত। কিন্তু বনু হাশিমদের ভেতরেই আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের নামক অপর এক শক্তিশালী পুরুষ খিলাফতের দাবী নিয়ে দাঁড়ালেন। এমন কি তিনি স্বীয় অশেষ সাহস ও

বীরত্বের সাহায্যে হিজায ও আরবের সীমান্ত এলাকায় এক স্বাধীন সরকার
কায়েম করলেন।

সেই সময়ে বনু উমাইয়ার মারওয়ান ইবনে হাকাম (হযরত উসমা-
নের চাচাত ভাই ও তাঁর মীর মুনশী) ২৪ হিজরী বা ৬৮২ খৃস্টাব্দে
সিরিয়া ও মিশরের ওপরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করল। যদিও সে নিজে
রাজকার্যে বেশি সাফল্য লাভ করতে পারেনি, তবু তার সুযোগ্য পুত্র আব-
দুল মালিক ইবনে মারওয়ানই প্রকৃতপক্ষে ৬৫ হিজরী বা ৬৮৪ খৃস্টাব্দে
বনু উমাইয়া রাজবংশের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে গড়ে তুলেন। তাঁর সময়েই
আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের মক্কা মুআজ্জমায় অবরুদ্ধ হয়ে শহীদ হন।

ফলে গোটা মুসলিম জাহান আবদুল মালিক ইবনে মারোয়ানের কর-
তলগত হয়।

এই উমাইয়া রাজবংশ তথা মারওয়ান শাহী প্রায় পঁয়ষট্টি বছর পর্যন্ত
শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই অল্প সময়ের ভেতরেই এই বংশের
দশজন শাসনকর্তা সিংহাসনে আরোহণ করেন। আবদুল মালিক, ওয়ালিদ
সুলায়মান ও হিশামই ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও শক্তিশালী শাসক
একমাত্র ওয়ালীদের দেশজয় যদি বিবেচনা করে দেখা হয়, তা হলেও
আব্বাসীয় বংশের দীর্ঘ ছ'শ' বছরের খিলাফত তার সমকক্ষতা লাভ
করতে পারবে না। তাঁর সময়ে ইসলামী খিলাফতের আয়তন এতখানি
বেড়ে গিয়েছিল যে, সিন্ধু, আফগান, ইরান, তুর্কিস্থান, আরব, সিরিয়া
এশিয়া মাইনর, স্পেন ও প্রায় গোটা আফ্রিকা ইসলামের ঝাণ্ডার নীচে
এসে গিয়েছিল।

এসব সত্যেও বনু হাশিমরা কোনদিন নিশ্চেষ্ট ছিল না। তারা তাদের
সংগ্রাম অবিরাম গতিতে অব্যাহত রেখে চলছিল। যখনই সুযোগ পেত
জোরে-শোরে উমাইয়াদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হ'ত। যদিও
ওলিদ ও হিশামের শক্তিশালী হাত তাদের অনেকটা দমিয়ে রাখতে সমর্থ
হয়েছিল, তথাপি তাদের আন্দোলনের ফলে উমাইয়া বংশের ভিত্তি নড়ে
গিয়েছিল। তাই যখন অনুরূপ শক্তিশালী শাসক রইল না তখন স্বভাবতই
মারওয়ানী রাজবংশের ইমারত ধ্বসে পড়ল।

তখন পর্যন্ত সাদাত ও উলুভীরা খিলাফতের জন্যে সংগ্রাম চালাচ্ছিল
আব্বাসীয়রা তখনও এ ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেনি। উলুভীদের ভেতরে

মুহাম্মদ হানাফিয়ার পুত্র বা হযরত আলী (রা.)-র পৌত্র আবদুল্লাহ্‌র বিরাট
দল ভক্ত ছিল। খোরাসান ও ইরানের বিভিন্ন স্থানে তাঁর গুপ্ত প্রচা-
রক ছিল। ৭১৮ খৃস্টাব্দে তাঁকে বিষ দ্বারা শহীদ করা হয়। তাঁর
সন্তান না থাকায় এবং সাদাত গোত্রের ভেতরে কোন যোগ্য ব্যক্তি
না থাকায় হযরত অব্বাসের প্রপৌত্র মুহাম্মদ ইবনে আলীকে তিনি স্থলা-
ভিষিক্ত করে যান। এভাবে উলুভীদের সংঘবদ্ধ শক্তি আব্বাসীয়দের দিকে
চলে গেল। আব্বাসীয় রাজবংশ পত্তনের এটাই ছিল যেন পয়লা দিন।

এর পরে আব্বাসীয়দের প্রচারকগণ গোটা ইরাক ও খোরাসানে ছড়িয়ে
পড়ে। ফলে ১০২ হিজরী (৭২০খৃঃ), ১০৫ হিজরী (৭২৩ খৃঃ), ১০৯
হিজরী (৭২৮ খৃঃ), ১১৮ হিজরী (৭৩৬ খৃঃ)-তে তাদের পক্ষ থেকে উল্লেখ-
যোগ্য বিপ্লব সৃষ্টি হয়। কোন কোন সময়ে বনু উমাইয়ারা এ ষড়যন্ত্রের
সন্ধানও পেয়ে গিয়েছিল। ফলে, যার যার উপরে তাদের বিন্দুমাত্র
সন্দেহ হয়েছিল, তাদেরই হত্যা করেছিল।

এই অবসরে উলুভীরাও পৃথকভাবে খিলাফতের দাবী নিয়ে মাথা তুলছিল।
১২২ হিজরীতে যায়েদ বিন আলী ও ১২৬ হিজরীতে ইয়াহিয়া বিন
যায়েদ নিজ নিজ সাহস ও উচ্চাকাংখার প্রমাণ দিয়েছিল। তারা প্রকাশ্য
ময়দানে নেমে বীরত্বের সাথে লড়াই করে প্রাণ দিয়েছিল। এই
থেকে উলুভীদের দাবীর কোন সুরাহা হয়নি বটে, কিন্তু আব্বাসীয়-
দের দুশমনদের শক্তি অনেকটা হ্রাস পেল অর্থাৎ উলুভীদের সাথে যুদ্ধে
লড়তে গিয়ে উমাইয়াদের যথেষ্ট শক্তি ক্ষয় হল।

১২৬ হিজরীতে মুহাম্মদ বিন আলী মারা গেলেন। তাঁর পুত্র ইব্রাহীম
তাঁর স্থলে আব্বাসীয়দের ইমাম নিযুক্ত হলেন।

১২৭ হিজরীতে ইব্রাহীমের দলে আবু মুসলিম খোরাসানী নামক এক
জনৈক শক্তিশালী সেনানায়ক যোগ দিল। তারই প্রচেষ্টা ও শক্তি তাদের
[illegible] দান করল এবং আন্দোলনকে পুরোমাত্রায় সাফল্যমণ্ডিত করল।
তাকে আব্বাসীয় খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতাও বলা হয়।

আবু মুসলিম খোরাসানী এই দলে যোগ দিয়ে নিজের পক্ষ থেকে
[illegible] আমনায়ক বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত করল এবং সমগ্র মুসলিম জাহানেই
তারা ছড়িয়ে পড়ল। আব্বাসীয়দের সমর্থকদের কালো পোশাক ধারণের
নির্দেশ দিয়েছিলেন। এসব ছিয়াপোষ প্রচারকেরা পারস্যের সব এলাকায়

ছড়িয়ে পড়ে গোপনে ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করে চলল। সর্বত্র একটা নির্দিস্ট দিন ঘোষণা করে দেয়া হল যেদিন একই সংগে সবাই যেন মাথা তুলে দাঁড়ায়।

এভাবে ১২৯ হিজরী মুতাবিক ৭৪৬ খৃস্টাব্দের ২৫শে রমযান বুধবার দিবাগত রাতে আবু মুসলিম খোরাসানী খিলাফতে আব্বাসীয়া প্রতিষ্ঠার কথা সাধারণ্যে ঘোষণা করল এবং ইব্রাহীমের প্রেরিত ঝাণ্ডা সমুন্নত করল। এই সংবাদ পেয়ে বিভিন্ন দিক থেকে দলে দলে লোক এসে তাদের সাথে যোগ দিতে লাগল।

আবু মুসলিম বিশেষ কৃতিত্বের সাথে জয়ের পর জয় করে খোরাসানের দিকে এগিয়ে চলল এবং বনু উমাইয়াদের অনুচরবর্গকে পর পর পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে চলল।

তখন বনু উমাইয়াদের শেষ শাসনকর্তা মারওয়ানুল হেমার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল। খোরাসানের গভর্নর তাকে লিখে জানাল ঃ আব্বাসীয়দের ইমাম ইব্রাহীম খলীফা হিসেবে নিজকে ঘোষণা করেছে। তার সহায়ক আবু মুসলিম খোরাসানী খোরাসানের কয়েকটি জেলা দখল করে নিয়েছে এবং এখনও তার বিজয় অভিযান অব্যাহত গতিতে চলছে।

ইমাম ইব্রাহীম ছিলেন তখন হামীমায়। তাঁর দলবল ও সৈন্য-সামন্ত সবাই আবু মুসলিমের নেতৃত্বে সুদূর খোরাসানে বিজয় অভিযানে ব্যস্ত ছিল। মারওয়ান সুযোগ বুঝে বোলকার আমীরকে লিখল ঃ ইব্রাহীমকে শৃংখলাবদ্ধ করে আমার কাছে রাজধানীতে পাঠিয়ে দাও। যেহেতু তার সাথে তখন তেমন কেউ ছিল না, তাই অতি সহজেই তাকে গ্রেফতার করা গেল।

তিনি যাবার সময় স্বীয় দুচারজন উপস্থিত সহচরদের বলে গেলেন ঃ তোমরা কুফা গিয়ে আবুল আব্বাস আস্ সাফ্ফাহকে তোমাদের খলীফা নির্বাচন করে নেবে। আবুল আব্বাস ছিলেন ইব্রাহীমের আপন ভাই।

সাফ্ফা এই খবর পেয়ে কুফায় পৌছে ১৩২ হিজরী (৭৪৯ খৃঃ) ১২ই রবিউল আউয়াল শুক্রবার নিজেকে খলীফা বলে ঘোষণা করলেন। তারপর অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে সেখনকার জামে মসজিদে গিয়ে খেলাফতে আব্বাসীয়ার নামে অত্যন্ত মার্জিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ খুতবা পাঠ করলেন।

এদিকে আবু মুসলিম সমরখন্দ, তহারিস্তান, তুস, নিসাপুর, রে, জুর্জান [illegible] সৈন্য পাঠালেন এবং এসব এলাকা আব্বাসীয় খলীফার শাসনে এসে গেল।

তুস শহরে স্বয়ং মারওয়ানের পুত্র আবদুল্লাহ্র সাথে আবু মুসলিমের অন্যতম সেনাপতি আবু আউনের মুকাবিলা হল এবং সে যুদ্ধে আবদুল্লাহ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল।

এ খবর পেয়ে মারওয়ানের লক্ষাধিক সৈন্যের বিরাট একটা দল বনূ উমাইয়াদের শাহী পরিবারের সবার সমভিব্যাহারে আবু আউনকে বাধা দিতে এগিয়ে এল। ওদিকে আস্ সাফ্ফাহ তার চাচা মুহাম্মদ বিন আলীকে আবু আউনের সহায়তার জন্যে পাঠালেন। মারওয়ান এ যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে মিশরে পালিয়ে গেল। এভাবে কিছুদিন সে মিশরের এখানে সেখানে পালিয়ে কাটাল। অবশেষে ১৩২ হিজরীর ২৮শে জিলহজ্ব বুসীর নামক মিশরের এক শহরের গীর্জায় আবদ্ধ হয়ে নিহত হল। তার নিহত হবার সাথে সাথে মারওয়ানী রাজবংশের যবনিকা-পাত ঘটল।

এর পরে আব্বাসীয়রা নিষ্ঠুরভাবে পাইকারী হত্যা চালালো। তারা সর্বসম্মতভাবে এ সিদ্ধান্ত নিল যে, বনু উমাইয়ার একটা শিশুকেও দুনিয়ার বুকে জীবিত থাকতে দেয়া হবে না। এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে খুঁজে খুঁজে তারা যেখানে বনু উমাইয়ার লোক পেল, হত্যা করতে লাগল। তাতেও আব্বাসীয়দের প্রতিশোধ গ্রহণের পিপাসার পরিতৃপ্তি ঘটল না। তারা তারপরে বনু উমাইয়া খলীফাদের কবর খুঁড়ে আমীর মুআবিয়া, ইয়াযিদ, আবদুল মালিক, হিশাম প্রমুখকে তুলে ফেলার ব্যবস্থা করল। তাদের একটা হাড় মিললেও তা আগুনে নিক্ষেপ করা হল।

বনু উমাইয়াদের ভেতরে আবদুর রহমান নামক এক ব্যক্তি কেবল কোনমতে প্রাণ বাঁচিয়ে স্পেনের অন্তর্ভুক্ত আন্দালুসিয়ায় গিয়ে পেঁছল। সেখানে ধীরে ধীরে সে শক্তি সঞ্চয় করে এরূপ এক শক্তিশালী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করল যাকে আব্বাসীয়রা সব সময়ই ঈর্ষার চোখে দেখতে বটে, কিন্তু তাদের কিছুই করতে পারেনি।

আব্বাসীয় খিলাফত একাধারে পাঁচশ পঁচিশ বছর পর্যন্ত কায়েম ছিল।

এই দীর্ঘকালের ভেতরে ছত্রিশ জন খলীফা খিলাফতের আসন অলংকৃত করেছিলেন। মামুন ছিলেন তাঁদের ষষ্ঠ খলীফা। নিম্নে প্রদত্ত তালিকা থেকে তাদের খিলাফত ও বংশধারার পরিচয় মিলবে।

হারুন-অর-রশীদ

বড়ই শান-শওকতের খলীফা ছিলেন তিনি। শাহযাদা ছিলেন যখন, রোমান সাম্রাজ্যের ওপরে আক্রমণ পরিচালনা করে অশেষ বীরত্বের সাথে জয়ের পর জয় করে ভূমধ্যসাগর উপকূল পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। খিলাফতের আসনে বসেও তিনি ইসলামী খিলাফতের আয়তন এতখানি বাড়িয়ে তুলেছিলেন যে, খিলাফতে আব্বাসীয়ার সেটাই ছিল চরম প্রসারতা। কোন আব্বাসীয় খলীফাই রাজ্যের এতখানি প্রসারতা দেখিয়ে যেতে পারেন নি। রোমের অধিপতি কায়সর কয়েকবার রাজস্ব দিতে অস্বীকার করেছিলেন বাগদাদের খলীফাকে। কিন্তু প্রতিবারেই তিনি পরাজিত হয়েছিলেন খলীফার হাতে।

কায়সরের রাজধানী হারীকলী (১) বিধ্বস্ত করলেন খলীফা। তারপর কায়সর থেকে এই শর্ত লিখিয়ে নিলেন যে, এ শহর আর কোন দিন গড়ে তুলতে পারবে না।

শাহী জাঁকজমক, শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-গরিমার পৃষ্ঠপোষকতায় হারুন-অর-রশীদের নাম রূপকথার নায়কের মত দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

গুণীর আদর তাঁর অন্যতম বিশেষত্ব ছিল। তাঁর উদার আহবানে সে যুগের সব দেশেরই সেরা জ্ঞানী-গুণীরা এসে খলীফার দরবার উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন। তাই বাগদাদ ছিল সেদিন গোটা দুনিয়ার জ্ঞান ও শিক্ষা কেন্দ্র।

খলীফা স্বয়ং ছিলেন একজন মস্ত বড় গুণী ব্যক্তি। তাঁর জ্ঞানচর্চার দরবার তৎকালীন সাহিত্য সৃষ্টির প্রাণ ছিল। যদি তিনি বার্মেকীদের ওপরে অতখানী নিষ্ঠুর না হতেন, তাদের রক্তে যদি তাঁর ইনসাফের হাত রঞ্জিত না করতেন, তা হলে তাকে বাদ দিয়ে আমি অন্য কাউকেই আব্বাসীয় খলীফাদের ভেতরে আমার বিষয়বস্তুরূপে নির্বাচিত করতাম না। তবে, যেই মামুন-আল-রশীদ সম্পর্কে আমি লিখতে যাচ্ছি, তিনি এই বিশ্ববিশ্রুত হারুন-অর-রশীদেরই সুযোগ্য সন্তান।

—গ্রন্থকার

আবির্ভাব

১০৭ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসের এক বিস্ময়কর রাতে বি
বিশ্রুত খলীফা আল মামুন দুনিয়ার বুকে পদার্পণ করেন। একাধ
খলীফা আল হাদীর পরলোকগমন, রূপকথার নায়ক খলীফা হারু
অর-রশীদের সিংহাসনারোহণ ও আল মামুনের জন্মগ্রহণ এ রাতটি
বিশ্বের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে।

খলীফা আল্ মাহদী মানবলীলা সম্বরনের প্রাক্কালে অসিয়াত ক
গেলেন যে, "আমার মৃত্যুর পরে আল্ হাদী এবং তাঁর তিরোধানে
পরে হারুন-অর-রশীদ খিলাফতের মসনদ অলঙ্কৃত করবেন।" অ
আল্ হাদী অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে হারুনকে খেলাফতের অধিক
থেকে বঞ্চিত করবার মতলব এঁটেছিল। পক্ষান্তরে আল্ হারুন ছিলে
নিতান্তই শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি। তিনি কোনরূপ কলহ বা গৃহবিবাদ থে
সর্বদাই দূরে থাকতেন। আল্ হাদীর দুরভিসন্ধি চরিতার্থের পক্ষে ত
আর কোন অন্তরায় ছিল না। কিন্তু সব দুরভিসন্ধির চির অন্তরায় অন্তর্যা
অন্তরাল থেকে অকস্মাৎ তার জীবনান্তর ঘটিয়ে আসন্ন গৃহ বিসম্বাদে
অবসান ঘটালেন। আল্ হাদীর আকাশ কুসুম পরিকল্পনা তাঁর প্রাণবায়
সংগে সংগোপনে শূন্যাকাশে মিলে গেল।

আল্ হারুন তখন সুখনিদ্রায় বিভোর ছিলেন। সহসা প্রধানম
ইয়াহ্ইয়া বার্মেকী এসে তাঁকে জাগ্রত করে সহাস্যে তাঁর খেলাফ
প্রাপ্তির সুসংবাদ দান করলেন। হারুন সে কথাকে বিদ্রূপ ভেবে বললে
দেখ, তুমি কি কথা নিয়ে পরিহাস করছ? ভাই সা'ব শুনতে পেলে এ
পরিহাসই হয়ত তোমার প্রাণের হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। ইয়াহ্ইয়া তদুত্ত
বললেন: নিয়তি এই সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। আপনি এখ
নিশ্চিন্তে খেলাফতের আসন অলংকৃত করুন।

ইত্যবসরে রাজপরিবারের বিশেষ সংবাদদাতা এসে আরেকটি সুসংবা
জ্ঞাপন করল: রাজপ্রাসাদে রাজ্যের উত্তরাধিকারী ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এ

[illegible] সন্তানই উত্তরকালে পৃথিবীর ইতিহাসে 'মামুন দি গ্রেট' নামে পরি-
[illegible] হন। সৌভাগ্যের নিদর্শন স্বরূপ হারুন তাঁর নাম রাখেন আবদুল্লাহ।
[illegible] খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা আস্ সাফ্ফার প্রকৃত নামও ছিল
আবদুল্লাহ্।

মামুনের মাতা মা'রাজেল ছিলেন জনৈকা দাসী। হিরাতের বাগিস
[illegible] শহরে তাঁর জন্ম হয়। খোরাসানের গভর্নর আলী ইবনে ঈশা তাঁকে
[illegible] স্বরূপ হারুনের কাছে পাঠিয়েছিলেন। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসের
[illegible] মামুন জন্মের তিনদিন পরেই মাতৃহারা হন এবং চিরতরে মাতৃ-
[illegible] লালিত হবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হন।

শিক্ষা-দীক্ষা

আনুমানিক পাঁচ বৎসর বয়সে পদার্পণ করতেই মামুনের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে বিশেষ যত্ন নেয়া শুরু হয়। খলীফার দরবারের বিখ্যাত আরবী ভাষাবিদ ও বৈয়াকরণিক মহাপণ্ডিত কাসাঈ ও ইয়াযিদীর হাতে তাঁর কুরআন শিক্ষার ভার অর্পিত হয়। শৈশব থেকেই মামুনের ধীশক্তি ও মনন শক্তির বিস্ময়কর বিকাশ সকলকেই বিমুগ্ধ করেছিল।

পণ্ডিতবর কাসাঈর শিক্ষাদানের পদ্ধতি ছিল এই যে, তিনি ছাত্রকে পড়তে বলতেন এবং নিজে নির্বাক হয়ে আনতশিরে তা শুনতে থাকতেন। ছাত্র যখনই কোথাও ভুল পড়ত, তৎক্ষনাৎ তিনি মাথা তুলে ছাত্রকে তা শোধরে দিতেন। শিশু মামুন এতই চতুর ছিল যে, উস্তাদ মাথা তোলা মাত্র সে নিজেই ভুল সেরে পড়ত এবং উস্তাদকে কখনই তার ভুল ধরবার সুযোগ দিত না।

একদা তিনি কাসাঈর কাছে সূরা সফ্-এর সবক পড়ছিলেন। প্রতি-দিনের ন্যায় আজও উস্তাদ নত হয়ে ছাত্রের সবক শুনতে লাগলেন। মামুন যখন এই আয়াত পাঠ করল ঃ

يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون ۝

(হে বিশ্বাসীগণ! যাহা তোমরা কর না তাহা বল কেন ?)

তখন অজ্ঞাতসারেই কাসাঈ মাথা তুলে আবার নত করলেন। মামুন তৎক্ষণাৎ স্বীয় পাঠ দ্বিতীয় বার পড়ে ভুল দেখতে না পেয়ে মহা ভাবনায় পড়লেন। কারণ, মামুন জানত যে, তার উস্তাদ কোন ভুল না পেলে মাথা তুলতেন না। অথচ তিনিও কোন ভুলের কথা উল্লেখ করলেন না। কিছুক্ষণ পরে কাসাঈ যখন চলে গেলেন, মামুন তৎক্ষণাৎ পিতা হারুন-অর-রশীদের সমীপে উপস্থিত হয়ে বলল ঃ

আব্বা! আপনি যদি উস্তাদজীকে কিছু দেবার অংগীকার করে থাকেন তা হলে যথাশীঘ্র সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন। হারুন-অর-রশীদ বললেন ঃ হ্যাঁ, আমার কাছে তাঁরা বেতন বৃদ্ধির জন্যে আবেদন করেছিলেন এবং আমিও তা মঞ্জুর করেছিলাম। তিনি কি তোমার সংগে এই প্রসংগ নিয়ে আলোচনা করেছেন ? মামুন বলল ঃ না। হারুন-অর-রশীদ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তবে তুমি কিরূপে জানলে ? মামুন তখন উপরোক্ত ঘটনা উল্লেখ করে বলল ঃ উস্তাদজী ছাত্রের পড়ায় ত্রুটি না পেলে যখন মাথা তোলেন না, তখন বুঝলাম যে, সেই আয়াতের শব্দে ভুল না থাকলেও মর্মে কোথাও ভুল ঘটেছে।

শিশু পুত্রের মুখে এরূপ বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় লাভ করে হারুন-অর-রশীদ বিস্ময় ও পুলকে আত্মহারা হলেন।[1]

ইয়াযিদী মামুনের শুধুমাত্র শিক্ষকই ছিলেন না, অভিভাবকও ছিলেন। মামুনের সাধারণ আচার ব্যবহার ও স্বভাব চরিত্রের পর্যবেক্ষণের দায়িত্বও তাঁর উপরে ন্যস্ত ছিল। তিনি অত্যন্ত সততার সাথেই এই দায়িত্ব সম্পাদন করেছিলেন।

একদা ইয়াযিদী যথাসময়ে এসে মামুনকে যথাস্থানে পেলেন না। মামুন তখন প্রাসাদের অভ্যন্তরে অন্য ব্যাপারে লিপ্ত ছিল। দাস-দাসীরা ইয়াযিদীর আগমনবার্তা মামুনকে জ্ঞাপন করা সত্ত্বেও মামুনের আসতে কিছুটা বিলম্ব ঘটল। এই সুযোগে দাস-দাসীরা ইয়াযিদীর নিকট অভিযোগ জানাল ঃ হুযুর! আপনার অবর্তমানে শাহযাদা আমাদেরে বড়ই উত্যক্ত করতে থাকে। অতঃপর মামুন যখন এসে দেখা করল, ইয়াযিদী তৎক্ষণাৎ তাকে [illegible] সাতটি বেত্রাঘাত করল। মামুন সেই প্রচণ্ড আঘাতের যন্ত্রণায় অধীর হয়ে বিছানায় গড়িয়ে কাঁদছিল। এমন সময়ে দাস-দাসীরা এসে ফজল ইবনে ইয়াহিয়া বার্মেকীর আগমনবার্তা জ্ঞাপন করল। মামুন তাকে ভেতরে আসবার অনুমতি প্রদান করে তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছে বিছানায় স্থির হয়ে বসল। অতঃপর জাফর এসে চুপি চুপি তার সাথে অনেক কথা আলোচনা করে চলে গেল। ইয়াযিদীর মনে সন্দেহের উদ্রেক হল যে, মামুন হয়ত বা জাফরকে তাঁর দণ্ডদানের বিরুদ্ধে কিছু বলেছে। তাই জাফরের নিষ্ক্রমণের পরেই তিনি মামুনকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে নাকি ? তদুত্তরে নিতান্ত ভদ্র ও বিনীতভাবে মামুন বলল ঃ তওবা! আমি তো পিতা হারুন-অর-রশীদের কাছেও এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অভিযোগ জানাব না। সে ক্ষেত্রে জাফরের কাছে আবার কি বলব ? শিক্ষা-দীক্ষায় যে আমারই অশেষ কল্যাণ হচ্ছে তা কি আমি বুঝি না ?[2]

১. মুন্তাখাব কিতাবুল মুখতার মিন আনওয়ারুল আখবার।
২. তারীখুল খুলাফা—সয়ূতী—২১৯।

দরবারের বিশ্বস্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ওপর খলীফাদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষা-দীক্ষা ও লালন-পালনের ভার ন্যস্ত থাকত। তাঁদের বিশেষ যত্ন ও প্রচেষ্টায় শাহ্যাদাগণ গড়ে উঠত। এই প্রথা অনুযায়ী ৭৯৮ খৃস্টাব্দে হারুন-অর-রশীদ শাহ্যাদা মামুনকে জাফর বর্মেকীর হস্তে সমর্পণ করেন। জাফর বার্মেকীর সুযোগ্য অভিভাবকতার ফলে মামুনের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অন্যান্য রাজকীয় ও মানবীয় গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশলাভ ঘটে। কারণ, জাফর বার্মেকীর মন্ত্রীত্বসুলভ গুণাবলী ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁরই প্রচেষ্টায় মুসলিম জাহানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসার লাভ ঘটে। একই সঙ্গে কবি ও পণ্ডিত মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদীও মামুনের অন্যতম অভিভাবক ছিলেন।

ইতিহাসবেত্তাদের মতে আল মামুন ছিলেন কুরআনে হাফিজ। সয়ূতীর মতে মুসলিম খলীফাদের ভেতরে হযরত আবুবকর (রা.), হযরত উসমান (রা.) এবং মামুন-অর-রশীদই শুধু কুরআনে হাফিজ ছিলেন। যা হোক, কুরআন মজীদ সমাপনের পরে তিনি আরবী ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন আরম্ভ করেন এবং অত্যল্পদিনের ভেতরেই তাতে অভূতপূর্ব ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এমন কি মহাপণ্ডিত কাসাঈ যখন সে সম্পর্কে তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্ন দ্বারা পরীক্ষা করলেন, তখন তিনি এত তড়িৎ ও যথাযথ জবাব দিলেন যে, উস্তাদ ও ছাত্রের প্রতিভায় বিমুগ্ধচিত্তে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। এ খবর শুনে খলীফা হারুন-অর-রশীদ পুত্রকে সস্নেহে বুকে টেনে নিলেন।[১]

এই পরীক্ষায় হারুন-অর-রশীদের দ্বিতীয় পুত্র আমীনও অংশ গ্রহণ করেছিল। মামুন থেকে বয়সে সে এক বছরের ছোট ছিল। বেগম যোবায়দার গর্ভে তার জন্ম হয়েছিল বলে স্বভাবতই তার ভেতরে কিছুটা অহংকার ছিল। কারণ, দুই দিক থেকেই সে বংশ গৌরবে ছিল ধন্য।

ইয়াযিদী আমীন ও মামুন উভয়কেই বক্তৃতা ও বিতর্কে পারদর্শীরূপে গড়ে তোলার জন্যে বিশেষ শিক্ষাদান করেছিলেন। পরিশেষে উপরোক্ত বিষয়ে তাদের অভাবিত সাফল্য দেখে স্বয়ং ইয়াযিদীও বিস্মিত হলেন। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বলতেন: উমাইয়া বংশের শাহযাদাগণকে বিশুদ্ধ ভাষা ও উচ্চারণ শিক্ষালাভের জন্যে দূর-দূরান্তের বিশেষ বিশেষ [illegible] নিকট প্রেরণ করা হ'ত। অথচ তোমরা দেখছি যে, ঘরে বসেই [illegible] অপেক্ষা অনেক উচ্চাঙ্গের ভাষাভিজ্ঞ ও বাগ্মী হয়েছ।

[illegible] মসজিদের এক জু'মার দিবসের বিরাট সমাবেশে মামুন সর্ব-[illegible] যে বক্তৃতা দান করেছিলেন তা এতই প্রাঞ্জল, সাবলীল, হৃদয়স্পর্শী [illegible] উদ্দীপ্ত ছিল যে, শ্রোতাবৃন্দ তাতে অভিভূত ও অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে-[illegible]। আবু মুহাম্মদ ইয়াযিদী মামুনের এই অবিস্মরণীয় বক্তৃতার [illegible] এক 'প্রশংসা-গীতি' রচনা করেছিলেন। কিতাবুল আগানিতে সেই [illegible]গীতি' (কাসীদা) উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, খলীফা হারুন-অর-[illegible] ইয়াযিদীকে পঞ্চাশ হাজার দিরহাম পুরস্কার দিয়েছিলেন।

[illegible] শাস্ত্র শিক্ষাদানের জন্যে খলীফা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ থেকে [illegible] ফকীহ্গণকে বাগদাদে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। তাদের নিয়মিত [illegible] মামুন একজন সুদক্ষ ফকীহ্ হবার মর্যাদা লাভ করেন। বিখ্যাত [illegible] হাশিম, উবাদ ইবনুল আওয়াম, ইউসুফ ইবনে আতিয়া, আবু [illegible], ইসমাঈল, হাজ্জাজুল আওয়ার প্রমুখের নিকট থেকে তিনি হাদীস [illegible] পারদর্শিতার সনদ লাভ করেন।

[illegible] মালিক ইবনে আনাস হাদীস শাস্ত্রের তৎকালীন ইমাম ছিলেন। [illegible] ইমাম শাফেয়ীর মত জগদ্বিখ্যাত ইমামগণও তাঁর শিষ্যত্বে গৌরব [illegible]। খলীফা হারুন-অর-রশীদ তাঁকে অনুগ্রহপূর্বক রাজপ্রাসাদে [illegible] করে শাহ্যাদাগণকে হাদীস শিক্ষা দানের জন্যে অনুরোধ জানা-[illegible]। [illegible] তিনি লিখলেন: বিদ্যার কাছে সবাই ছুটে আসে। বিদ্যা [illegible] কাছে যায় না। তিনি আরও জানালেন: যে বিদ্যা তোমারই গৃহ [illegible] নিঃসৃত হল, তুমি যদি তার মর্যাদা দান না কর তা হলে কিভাবে তা [illegible] লাভ করবে? এই পত্র পেয়ে খলীফার চৈতন্যোদয় হলো এবং তিনি [illegible] শাহ্যাদাগণকে ইমাম মালিক (রা.)-এর সাধারণ শিক্ষাগারে [illegible] জন্যে নির্দেশ দিলেন।[১]

[illegible] হারুন-অর রশীদ একজন বিখ্যাত ফকীহ্ ও বিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। [illegible] একমাত্র বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলন 'মুআত্তাই ইমাম [illegible]' অধ্যয়ন করবার জন্যে তিনি প্রায়ই হযরত ইমাম মালিক (র.)-এর [illegible] হাজির হতেন এবং নিজ সন্তান আমীন ও মামুনের সঙ্গে একত্রে

১. দাফ্তরী ফী জীক্রে জুরী—২৯ পৃঃ।

১. [illegible] ইয়াকুতুল মুস্তা'সাম, ৭৩ পৃঃ।

সেই ইমাম সাহেবের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষায় অংশ গ্রহণ করতেন।[1]

খলীফা হারুন-অর-রশীদের সময়ে বাগদাদে যেরূপ উঁচুদরের আলেম-দের সমাবেশ ঘটেছিল, তা অন্য কোথাও দেখা যায়নি। খলীফার একান্ত ইচ্ছা ছিল এই যে, শাহযাদাগণ যেন কোন ধরনের, বা যে কোন স্তরের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত না থাকে।

ফিকাহ্ ও হাদীস চর্চার তদানীন্তন কেন্দ্রস্থল কূফায় এসে একবার খলীফা সকল ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসকে একত্রিত করেছিলেন। শুধুমাত্র আবদুল্লাহ্ ইবনে ইদরীস্ ও ইয়াহিয়া ইবনে ইউনুস খলীফার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। খলীফার ইচ্ছা ছিল হযরত ইমাম মালিক (র.)-কে বুঝতে দেয়া যে, তিনি ছাড়াও হাদীসের মর্যাদা দানের লোক রয়েছে। উপরোক্ত বিখ্যাত মুহাদ্দিসদ্বয় উপস্থিত না হওয়ায় খলীফা আমীন ও মামুনকে তাঁদের খিদমতে উপস্থিত হয়ে হাদীস শিখার জন্যে আদেশ দিলেন। ইবনে ইদ্রীস তাদের কাছে পর পর একশত হাদীস একই সঙ্গে বর্ণনা করলেন। তাঁর বর্ণনা শেষ হওয়া মাত্র মামুন একে একে সব কয়টি হাদীসই তাঁকে কণ্ঠস্থ শুনিয়ে দিলেন। ইবনে ইদ্রীস মামুনের এরূপ তীক্ষ্ণ ও মেধা শক্তির পরিচয় পেয়ে আনন্দ ও বিস্ময়ে বিমোহিত হলেন।

সে যুগের প্রচলিত যাবতীয় বিদ্যার উপরেই মামুনের পূর্ণ আধিপত্য ছিল। বিশেষতঃ ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য ও ইতিহাসে তাঁর চাইতে অধিক পার-দর্শী আর কাউকেও দেখা যায় না। বস্তুত, কাসাঈ ও ইয়াযিদীর মত প্রতিভাশালী পণ্ডিতগণ যাঁর গৃহশিক্ষক, যিনি আবু নাওয়াস্, আবুল আতা-হিয়া, সিবওয়াইয়া ও ফারার অপরিসীম জ্ঞানভাণ্ডার থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করেছেন, তাঁর সাথে জ্ঞানের সমকক্ষতা আর কে দাবী করতে সাহসী হবে?

শৈশবে তিনি একবার আসমায়ীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ

ما كنت الا كلحم ميت   دعا الى اكله اضطرار

এই পংক্তিটি কার?

আসমায়ী বললেন ঃ ইহা তো ইবনে উমাইয়া আল মাহলাবী রচিত। তখন মামুন বললেন ঃ চরণ দুটি অত্যন্ত উচ্চাংগের বটে, কিন্তু এতো অমুক কবিতা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এতদ্শ্রবণে আসমায়ী বিস্ময়ে

১. সয়ূতী, ২৯৭ পৃঃ ' মুআত্তার যে অংশ হারুন-অর-রশীদ পাঠ করিয়া-ছিলেন উহা বহুদিন যাবৎ মিসরের লাইব্রেরীতে বিদ্যমান ছিল।

[illegible] হয়ে গেলেন।[1]

সেই সময় থেকেই মামুন কবিতা লিখা আরম্ভ করেন। মামুনের স্বভাব ছিল ধীর ও শান্ত, দৃষ্টি ছিল গগনস্পর্শী ও মেজাজ ছিল নেহাৎই কাব্যোপযোগী। তাই তাঁর কবিতা হ'ত খুবই ভাবগম্ভীর, প্রাঞ্জল ও হৃদয়-গ্রাহী।

এক সময়ে হারুন-অর-রশীদ সেনাবাহিনীকে বিশেষ কারণে এক সপ্তাহের মধ্যেই সফরের জন্যে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দান করেছিলেন। কিন্তু সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও যখন তাদের কোন সাড়া পাওয়া গেল না তখন মামুন দরবারের বিশিষ্ট পারিষদগণের অনুরোধক্রমে নিম্নোক্ত পংক্তি রচনা করে খলীফার নিকট পেশ করলেন ঃ

يا خير من دبت المطى به ومن تقدى بسرجه الفرس

শ্রেষ্ঠতম হে ঘোড়সোয়ার! সদা যার অশ্ব পৃষ্ঠে বাস
নিত্য যার জীনে বাঁধা ঘোড়া ; বল তার কিসে আজ ত্রাস?

هل غاية في المسير نعرفها ام امرنا في المسير ملتبس

প্রবাসীর যাত্রার সময়
আমাদের কার জানা রয়?
সে সমস্যা আজিও সবার
জীবনের হেয়ালী কি নয়?

ما علم هذا الا الى ملك من نوره في الظلام نقتبس

সে পরম জ্ঞানের সন্ধান
শাহানশার শুধু জানা আছে
চরম আঁধার মাঝে মোরা
আলো পাই সদা যার কাছে।

হারুন-অর-রশীদ এর পূর্বে জানতেন না যে, মামুন কবিতাও লিখতে পারেন। কবিতার ভেতরে যদিও মামুনের তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ দেখতে পেয়ে পিতা খুবই মুগ্ধ হলেন, তথাপি এর প্রত্যুত্তরে তিনি পুত্রকে লিখলেন ঃ "প্রাণাধিক পুত্র! কবিতা তোমার জন্যে নয়। সাধারণ লোকের পক্ষে কবিতা গৌরবের বিষয় হলেও মহান ও

১. দারাতুল জীনান ; ইয়াকীই ; তরজমায়ে আসমায়ী।

বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও দায়িত্ববান ব্যক্তির জন্যে আদৌ গৌরব বহন করে আনবে না।"

৮০৩ খৃস্টাব্দে ঠিক একই তারিখে ইবরাহীম মুসেলী, কাসাঈ ও আব্বাস ইবনুল আখনাফ পরলোকগমন করেন। খলীফা হারুন-অর-রশীদের নির্দেশক্রমে স্বয়ং মামুন-অর-রশীদ তাঁদের জানাযার নামায পরিচালনার জন্যে নিয়োজিত হন। মামুন জানাযার ইমামতিতে দাঁড়িয়ে উপস্থিত সকলের নিকট জিজ্ঞেস করলেন ঃ কার জানাযা অগ্রে আদায় করছি? জনসাধারণ জবাব দিল ঃ ইবরাহীম মুসেলীর। মামুন বাধা দিয়ে বললেন ঃ তা হবে না। আব্বাসের জানাযা অগ্রাধিকার পাবে। তদনুসারে নামায সমাপনের পর যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন দরবারের জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ আব্বাস কোন্ গুণে অগ্রাধিকার পেল? মামুন জবাব দিলেন ঃ এই চার পংক্তি কবিতার জন্যে ঃ

[illegible]

দুর্নাম ছড়াল সবে তব প্রেমে আমি আত্মহারা
মিথ্যা বলে উড়াইনু তব যেন না দুষে তাহারা
সে প্রেমিকাকে বাসি ভাল ঝোপ বুঝে মারে কোপ যেই
প্রণয় সাগরে ডুবে কভু যেবা হারায় না খেই।

আল্লামা আবুল ফারাজ ইস্পাহানী এই ঘটনাটি ইবরাহীম মুসেলীর জীবনালেখ্য বর্ণনা প্রসংঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তা থেকে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, সেই সময় সাহিত্যচর্চা এরূপ মর্যাদাপূর্ণ ব্রত ছিল যা এমন কি ধর্মীয় কার্যেও বিবেচিত হ'ত।

বিভিন্ন বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভের পরে আল মামুন অবশেষে দর্শনশাস্ত্রে মনোনিবেশ করলেন। হারুন-অর-রশীদ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বিরচিত মূল্যবান রচনা সম্পদগুলো আরবীতে অনুবাদের জন্যে যে বিশেষ সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন তাতে হিন্দু, মুসলমান, পার্সি, বৌদ্ধ, খৃস্টান ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মের মনীষীগণ নিয়োজিত ছিলেন। তাঁরা বিশেষতঃ দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্রে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলী অনুবাদ করতেন। মামুনের দর্শনশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভের পক্ষে তা

খুবই সহায়ক হয়েছিল। মামুনের জ্ঞানচর্চার এই বিশেষ দিকটি সম্পর্কে আমি তাঁর রাজনৈতিক জীবন আলোচনার পরে শেষাংশে বিশেষভাবে আলোচনা করব বলে এখানে আর বেশি আলোচনা করতে চাই না। এই পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে আমি তাঁর শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্য, গবেষণামূলক কার্যাবলী, যুগের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন নতুন বিভিন্ন মসলার সৃষ্টি ও সমাধান নিরূপণ এবং দর্শনশাস্ত্রের নবরূপায়ণ ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোকপাত করব। সুতরাং এখানে শুধু তাঁর শিক্ষাজীবনের প্রাথমিক পর্যায় সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করলাম।

মনোনয়ন

হারুন-অর-রশীদের দ্বাদশ সন্তানের ভেতরে চারজনই খিলাফতের আস
লাভের যোগ্যতা রাখতেন। মামুন, আমীন, মু'তামিন ও মু'তাসিম
তাদের ভেতরে মু'তাসিম যদিও সবচাইতে সাহসী ও কুশলী যোদ্ধা ছিলেন
তথাপি সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন বলে হারুন তাঁকে উত্তরাধিকারীর দাবীদা
থেকে বাদ দিয়েছিলেন। আমীনের জননী যোবায়দা এবং মামা ঈসা ইবনে
জা'ফর ইবনে আল মনসুর রাজদরবারে বিশেষ প্রতিপত্তির অধিকারী
ছিলেন। কারণ দরবারের অধিকাংশ আমীর উমরাহ ও সেনাবাহিনী
বেশীর ভাগ সেনানায়কই ছিলেন বনু হাশিম গোত্রের এবং তাঁরা এক
বংশোদ্ভূত হওয়ায় বেগম যোবায়দার সাথে আঁতাতে যোগদান করলেন।

৭৯১ খৃস্টাব্দে ঈসা ইবনে জা'ফরের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী ফজল ইবনে
ইয়াহিয়ার মারফৎ আমীনকেই উত্তরাধিকার মনোনয়নের জন্যে খলীফা
নিকট দরবারের সুপারিশ পেশ করা হয়। আমীনের বয়স তখন সবেমা
পাঁচ বৎসর। রাজ পরিবারের কেউ কেউ তাই এই প্রস্তাবের প্রতিকূ
মত প্রকাশ করেন। তবুও ফজলের পরামর্শ উপেক্ষা করা খলীফার পক্ষে
সম্ভবপর হয়নি। তিনি দরবারের সকলের নিকট থেকে আমীনের জন
আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করালেন।

আমীন একাধারে মেধাবী, বিজ্ঞ, সুবক্তা, ভাষাবিদ, সাহিত্যিক
ধর্মশাস্ত্র বিশারদ এক সুদর্শন সুপুরুষ ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন খুব
সুখপ্রিয় ও অলস। হারুন ক্রমাগত পুত্রের এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি বিশেষভাবে
লক্ষ্য করতে লাগলেন। পক্ষান্তরে মামুনের অতুলনীয় গুণাবলী ক্রমেই তাঁকে
আকৃষ্ট করছিল। একদিন তিনি প্রকাশ্যেই বললেন ঃ আমি মামুনের ভিতরে
মনসুরের দূরদর্শীতা, মাহদীর দৃঢ়তা ও হাদীর শান-শওকতের সমাবেশ
দেখতে পাচ্ছি। তাকে আমার সহিতও তুলনা করা যেতে পারে। আমি
আমীনকে খিলাফতের ব্যাপারে মামুনের উপরে স্থান দিয়েছি। অথচ আমি
জানি যে, সে অমিতব্যয়ী ও ভোগ-বিলাসপ্রিয়। হেরেমের দাসী-বাঁদী

সুন্দরী দাসীরাই তার নিত্যকার সঙ্গিনী ও পরামর্শদাতা। যদি মহিষী
যোবায়দার অনুরোধ ও বনু হাশিমের চাপে না পড়তাম তা হলে মামুনকেই
উত্তরাধিকারী মনোনয়ন দান করতাম।[১]

হারুন এক দিন তার ছোট ছেলে আবু ঈসাকে (যার সৌন্দর্য ছিল
অনিন্দ্য ও অনুপম।[২]) আক্ষেপের সাথে বলেছিলেন ঃ হায়! তোমার
রূপ যদি মামুনের হ'ত! এমন কি মামুনকেও তিনি মাঝে মাঝে
বলতেন—সব সৌন্দর্যই যদি তোমার ভেতরে সমাবিষ্ট হ'ত তা হলে
কতই ভাল হত। যদি আমার কোনরূপ ক্ষমতা থাকত তা হলে আবু
ঈসার দেহের রূপ তোমাকেই দান করতাম।[৩]

এসব কথা শুনতে পেয়ে যোবায়দার প্রাণে খুবই আঘাত লাগত।
তাই মাঝে মাঝে হারুনকে এই বলে ভর্ৎসনা করত যে, তুমি এক
বাঁদীর ছেলেকে আমার ছেলের উপরে স্থান দিয়ে নীচ মনোবৃত্তির পরিচয়
দিচ্ছ। এ নিয়ে উভয়ের ভেতরে বেশ বহাস চলত। যেহেতু সাধারণ
লোকজনের বিচারেও আমীনের চাইতে মামুনের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে যোবায়দা
রাজী ছিলেন না, তাই হারুন প্রায়ই তার সামনে উভয়ের পরীক্ষা নিতেন।
ফলে পরীক্ষার ফল দেখে যোবায়দাকে প্রায়ই লজ্জা পেতে হ'ত।

হারুন একদিন তার কাছের কতগুলো মিসওয়াকের দিকে ইংগিত
করে আমীনকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এগুলো কি জিনিস? আমীন জবাব
দিল ঃ কয়েকটি মিসওয়াক। এর পরে মামুনকে তা জিজ্ঞেস করায় সে
জবাব দিল ঃ যিদ্দু মুহাসিনুকা ইয়া আমিরুল মু'মিনীন!

আরেক দিন হারুন-অর-রশীদ তাঁর খাস গোলামদের সংগোপনে
ডেকে বললেন ঃ তোমরা গিয়ে আমীনকে গোপনে জিজ্ঞেস কর যে, খলীফা

১. মসউদী, ২১১ পৃঃ।
২. [illegible], ৪৮।
৩. আব্বাসীয়, খলীফা ও সমগ্র আব্বাসীয়দের ভেতরে আবু ঈসা সবচাইতে সুন্দর ও সুশ্রী ব্যক্তি। তার উপরে তিনি ছিলেন সঙ্গীত ও কাব্যে পারদর্শী। মামুন এবং আবু ঈসার মধ্যে অত্যন্ত সৌহার্দ ছিল। আল্লামা আগানী লিখেছেন—মামুন তাঁর পরে ঈসাকে খলীফা রূপে মনোনীত করতে চেয়েছিলেন। আক্ষেপের বিষয় যে, ইউসুফের মত সৌন্দর্যের অধিকারী আবু ঈসা মামুনের জীবদ্দশায়ই মারা গেল। মামুন শোকে কয়েকদিন অবধি খানাপিনা ত্যাগ করেছিলেন।– লেখক।

হয়ে সে তোমাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করবে। ভৃত্যরা তাই করল। আমীন আনন্দাতিশয্যে বলে উঠল : আমি তোমাদের এত বেশি পুরস্কার ও জায়গীর দেব যে, তোমরা তা পেয়ে ধন্য হয়ে যাবে।

ঠিক এই প্রশ্ন আবার ভৃত্যরা গিয়ে মামুনের কাছে উত্থাপন করল। মামুন তখন চিঠি লিখছিল। তৎক্ষণাৎ সে চিঠির ফাইলটা ভৃত্যদের মুখের ওপরে ছুঁড়ে মেরে বলল : বদমায়েশ সব! আমীরুল মু'মিনীন যদি বেঁচে না রইলেন, তা হলে আমরা বেঁচে আর কি করব? তাঁর জন্যে আমরা আমাদের সবকিছু উৎসর্গ করব নাকি?

এতকিছু জেনে শুনেও হারুনের ক্ষমতা ছিল না আমীনের মনোনয়ন বাতিল করা। তাই মামুনের জন্যে তিনি শুধু এতটুকু করলেন যে, আমীনের পরে তাকে খলীফা করার জন্যে সবার থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন এবং আপাততঃ তাকে খোরাসান ও হামদানের গভর্ণর নিযুক্ত করলেন (১৮২ হিঃ)। তৃতীয় সন্তান কাসেমকে সাওর ও আওয়াসেমের শাসনকর্তা করে মামুনের অধীন করে দিলেন। এমন কি কাসেম শাসনকার্যে অযোগ্যতার পরিচয় দিলে মামুন তাকে পদচ্যুত করতে পারবে, এ ক্ষমতাও দেয়া হল।

হারুন যদিও তাঁর জীবদ্দশায় এভাবে ছেলেদের রাজ্যভাগ করে দিয়ে ছিলেন, তবুও আমীন সম্পর্কে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না! তিনি জানতেন যে, আমীন স্বার্থপর ও বিলাসী। যেহেতু বনু হাশিমের সব নেতারা ও সেনাদলের বেশির ভাগ আমীনের সমর্থক ছিল, তাই সহজেই সে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা রাখত। তাই তিনি ১৮৬ হিজরীতে যখন মক্কাশরীফ গেলেন, আমীনকে তখন একাকী কা'বা ঘরের ভেতরে ডেকে খুব করে বুঝালেন। পরে মামুনকেও সেখানে একাকী ডেকে তাদের ভাবী-জীবন সম্পর্কে অনেক কিছু আলোচনা করলেন। তারপর ভিন্নভাবে উভয়ের থেকে এ শপথনামা লিখিয়ে নিলেন যে, পিতা যেভাবে রাজ্য বন্টন করবেন, তাতেই তারা খুশি থাকবে এবং একে অপরের অধি-কারে হস্তক্ষেপ করবে না।

'রওজাতুস সাফা' প্রণেতা লিখেছেন যে, সেই বন্টন অনুসারে মামুন কেরমান শাহ, নেহাওন্দ, কুম, কাশান, ইস্পাহান, পারস্য, কেরমান, রে, কাওমস, তাব্রিস্তান, খোরাসান, যাবেল, কাবুল, হিন্দুস্তান, তুর্কিস্তান ও

এশিয়া মাইনর লাভ করেন। পক্ষান্তরে আমীন পেলেন বাগদাদ, বসরা, কুফা, শামাত, ইরাক, মুসেল, হেজাজ, মিসর প্রভৃতি এলাকা।

এই বন্টন ব্যবস্থা মেনে নেয়ার জন্যে উভয়ের থেকে শপথনামা লিখিয়ে [illegible] নেয়া হল। তারপর খলীফা সেখানে মজলিস আহবান করলেন।

মজলিসে বার্মেকী পরিবারের ইয়াহিয়া, জা'ফর ও ফজল বার্মেকী, আব্বাসীয় রাজপরিবারের গণ্যমান্য সবাই এবং দরবারের সব আলেম ও [illegible] উপস্থিত ছিলেন। সেই বিরাট সমাবেশে খলীফা দাঁড়িয়ে [illegible] শপথনামা পাঠ করে শোনালেন। তারপর সে শপথনামা দু'টো মূল্য-[illegible] পাত্রে রেখে কা'বা শরীফের দ্বারপ্রান্তে রেখে দিয়ে দারোয়ানদের থেকে শপথ নেয়া হল যে, তারা হেফাজত করবে। স্থির হল, আগামী হজ্জের মৌসুমে সর্বসাধারণের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে এটা ঘোষণা করা হবে।

সে শপথনামা দুটো যদিও বেশ লম্বা এবং তাতে অনেক বাজে কথাও লেখা রয়েছে, এমন কি তাতে রাজনৈতিক দূরদর্শীতামূলক তেমন কিছু নেই, তবুও সেই দূর অতীতের লেখার ভেতর থেকে তৎকালীন চিন্তাধারা ও কার্যধারা সম্পর্কে একটা ধারণা নেওয়া যেতে পারে ভেবে আমি হুবহু তার অনুবাদ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।[১]

১. আল্লামা আরযানী (২৭২ হিঃ) তাঁর "মক্কার ইতিহাস" নামক গ্রন্থে শপথ-নামা দুটো পুরোপুরি উধৃত করেছেন (১৬১-১৬৬ পৃঃ)। ইবনে ওয়াজেহ কাতেব আব্বাসীয় সে দুটোকে তাঁর ইতিহাসে মতভেদ সহ উধৃত করেছেন।

চুক্তিপত্র

এক

"সেরা দাতা ও পুরস্কারক আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।"

"এ চুক্তিপত্রটি মুহাম্মদ বিন হারুন আমীরুল মু'মিনীন হারুনের জন্যে লিখেছেন। সুস্থে, সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় আমাকে আমীরুল মু'মিনীন খিলাফতের উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনয়ন দান করেছেন। সব মুসলমানকে সাধারণভাবে আমার আনুগত্য অপরিহার্য করা হয়েছে। আমার পরে স্বেচ্ছায় আমার ভাই আবদুল্লাহ্‌ বিন হারুনকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী বলে মেনে নিচ্ছি এবং মুসলমানদের সব ব্যাপার তখন তারই এখতিয়ারে থাকবে। আমীরুল মু'মিনীন তাকে স্বীয় জীবদ্দশায় এবং তাঁর অন্তর্ধানের পরে খোরাসান প্রদেশের সব ক'টি জেলা, সৈন্যদল, রাজস্ব, ডাক, অফিস-আদালত এক কথায় সব কিছুরই মালিক-মুখতার করেছেন। তাই আমিও একরার করছি যে, আমীরুল মু'মিনীন আমার ভাইকে যা কিছু অধিকার ও খিলাফত মুসলমানদের ওপরে দান করেছেন, আমিও সানন্দে সে সবের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছি। খোরাসান প্রদেশ ও তার জেলাগুলোর শাসনভার আমীরুল মু'মিনীন যে আমার ভা'য়ের ওপরে ন্যস্ত করেছেন এবং যা কিছু বিশেষ ধন-সম্পদ ও জমিদারী তাকে দান করা হয়েছে, স্থাবর-অস্থাবর যত সম্পদের অধিকারী তাকে করা হয়েছে, তা সবই তার অধিকারে থাকবে বলে আমি স্বীকৃতি দিচ্ছি। তাতে আমি কোনরূপ ওজর-আপত্তি তুলব না। আমি ও আমার ভাই আবদুল্লাহ্‌ উভয়ে আমাদের যার যার অধিকারের সবকিছু যথাযথভাবে জেনে ও বুঝে নিয়েছি। যদি এর পরেও কোন ব্যাপার নিয়ে আমাদের ভেতরে মতবিরোধ দেখা দেয়, তা হলে আবদুল্লাহ্‌র কথাই সমর্থনযোগ্য হবে। তাকে যে সব ক্ষেত্রে অধিকার দেয়া হয়েছে এবং যা কিছু তাকে দান করা হয়েছে, তাতে আমি কোনদিনই হস্তক্ষেপ করব না, জোরপূর্বক তা থেকে এক কপর্দকও স্পর্শ করব না। তা থেকে এক কপর্দকও কেড়ে নিব না—হোক তা যতই ছোট বা বড় বস্তু। যে সব রাজ্য তাকে দেয়া হয়েছে, তা নিয়েও আমি কোনদিন কথা তুলব না। সে সব এলাকার শাসনক্ষমতা থেকে আমি কখনো তাকে পদচ্যুত করব না। অথবা কাউকে তার স্থানে মনোনীত করব না। খিলাফতের উত্তরাধিকারী হিসেবে তার ওপরে অন্য কাউকে স্থান দেব না। তার প্রাণ, রক্ত, দেহ, এমনকি তার একটা লোমের অগ্রভাগও আমি ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেব না। তার আংশিক বা পুরোপুরি কাজে, তার যা কিছু ক্ষমতা ও অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমি কখনও কিছুমাত্র অন্তরায় সৃষ্টি করব না। তার কোন কাজ আমি রদ-বদল করতে পারব না। তার থেকে, তার কোন কর্মচারীর থেকে বা তার কোন মুনশী থেকে আমি কোনরূপ হিসাব-নিকাশ তলব করতে পারব না। খোরাসান ও আর যেসব প্রদেশ ও এলাকার শাসনভার আমীরুল মু'মিনীন তাঁর জবীদ্দশায় সুস্থে ও সজ্ঞানে তাকে অর্পণ করে গেলেন, যে সব ব্যবস্থা তার কিংবা তার কর্মচারীদের ওপরে সোপর্দ করলেন যেমন রাজস্ব, কর, ডাক, সাহায্য, আয়কর ইত্যাদির প্রতি আমার কোনই দাবী থাকবে না এবং অন্য কাউকেও আমি তাতে হস্তক্ষেপ করার জন্যে নির্দেশ দেব না, সে ধরনের কোনরূপ ধারণাও কখনো পোষণ করব না। নিজের জন্যে তার থেকে কোন নির্দিষ্ট জমিজমা বা জায়গীরও চাইব না। আমীরুল মু'মিনীন হারুন খলীফা থাকাকালীন যা কিছু তাকে দান করলেন সেগুলো এই চুক্তিপত্রে উল্লেখ করা হল এবং যা স্বীকার করে নেবার জন্যে আমার থেকে ও অপরাপর সভাসদ থেকে শপথ নিলেন, তা থেকে বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ হব না। অপর কাউকেও সে অধিকার ক্ষুণ্ণ করার জন্যে নির্দেশ দিব না। কাউকে এই প্রতিশ্রুতির বিরোধিতা করার কিংবা ভংগ করার জন্য বাধ্য করব না। এ ব্যাপারে কেউ অনুরূপ কোন পরামর্শ দিলেও শুনব না। এমনকি প্রকাশ্য কিংবা গোপন সহানুভূতিও থাকবে না আমার সেরূপ পরামর্শের প্রতি। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন কিছুই কুপরামর্শ দিয়ে আমাকে এ প্রতিজ্ঞা থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। তার অধিকার ও প্রাপ্য কখনো আমি ভুলব না, এড়িয়ে যাব না, তার প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করব না। সেরূপ অসৎ পরামর্শ কোন ভাল লোকে দিক কিংবা খারাপ লোকে দিক, সত্যবাদী দিক কিংবা মিথ্যাবাদী দিক, সাধু উপদেষ্টা দিক কিংবা অসাধু ধাপ্পাবাজ দিক, নিকটাত্মীয়রা দিক কিংবা দূর-সম্পর্কীয়েরা দিক, এক কথায় আদম সন্তানের যে

কোন নর বা নারী সেরূপ কুপরামর্শ হিসেবে দিক না কেন, তা পরামর্শ হিসেবে দিক কিংবা কারসাজিতে ফেলে দিক, কথায় দিক কিংবা ইংগিতে দিক, সত্যভাবে দিক কিংবা অসত্যভাবে দিক কিছুতেই আমি এরূপ কোন কিছু স্বীকার করব না যাতে করে আমার এই চুক্তির চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি আবদুল্লাহ্‌র ক্ষতি করতে চায় বা কোন অকল্যাণ কামনা করে কিংবা তার সংগে চুক্তি ভংগ করার প্রয়াস পায় অথবা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতলব আঁটে বা তার জান, মাল ও রাষ্ট্রের আংশিক বা সামগ্রিক প্রকাশ্যে বা গোপনে ক্ষতি সাধনের প্রয়াস পায় তা হলে আমার ওপরে ফরজ হবে তার সাহায্য করা এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে যত্নবান হওয়া। নিজের সবকিছু হেফাজতের জন্যে যে ব্যবস্থা রাখব তার জন্যেও সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করব। তার সাহায্যের জন্যে প্রয়োজনীয় সৈন্য পাঠাব, যে কোন শত্রুর মুকাবিলা করার জন্যে এগিয়ে যাব এবং যে কোন অবস্থায়ই তাকে একা ফেলে সরে আসব না। যদ্দিন আমি বেঁচে থাকব, তার সবকাজ নিজের ভেবেই করব। যদি আমীরুল মু'মিনীনের ইন্তেকাল সময় উপস্থিত হয়, তখন যদি আমি এবং আবদুল্লাহ্‌ উভয়ে তাঁর কাছে থাকি কিংবা আমাদের এক-জন থাকে অথবা আমাদের কেউ যেখানেই থাকি না কেন, আমার ওপরে ফরজ হবে আবদুল্লাহ্‌কে খোরাসানের শাসন ক্ষমতা অর্পণ করে সেখানে তক্ষুণি প্রেরণ করা এবং সেখানের শাসনভার, সৈন্যসামন্ত সব কিছুই তার হাতে ন্যস্ত করা। আমি তাতে মোটেও বিলম্ব ঘটাব না কিংবা কোনরূপ বাধাবিপত্তি সৃষ্টি করব না। সে যেখানেই যাক সেখান থেকে যথাসত্বর তাকে খোরাসানে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করব এবং তাকে একচ্ছত্রভাবেই সেখা-নেই অধিষ্ঠিত করব। কাউকে তার সাথে অংশীদারও করব না। আমীরুল মু'মিনীন যে সব সভাসদ, সেনানায়ক ও সৈন্যদল, মুনশী ও কর্মচারী, দাস-দাসী তার জন্যে নির্ধারিত করেছেন, তাদের সবাইকেই তার সাথে যেতে দেব। তাদের কাউকে ফিরিয়ে রেখে অন্য কাউকে তার সাথে পাঠাব না। আবদুল্লাহ্‌র ওপরে কোন পর্যবেক্ষক বা তার পেছনে কোন গুপ্ত-চর রাখব না। এমনকি ছোট বড় কোন ব্যাপারেই তাকে বাধা দেব না।

এ চুক্তিপত্রে যে সব শর্তের কথা আমি লিখলাম সে সম্পর্কে আমীরুল মু'মিনীন হারুনকে এবং আবদুল্লাহ্‌ বিন আমীরুল মু'মিনীনকে দায়িত্ব অর্পণ করছি। আল্লাহ্‌র ওপরে, নিজের ওপরে, নিজের পূর্বপুরুষদের

[illegible] কি সমস্ত মুসলমানদের ওপরে এর দায়িত্ব অর্পণ করে সবাইকে [illegible]। আল্লাহ্‌ পাক আম্বিয়া ও সাধারণ মানব জাতির থেকে [illegible] প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন, যেরূপ কঠিন শপথ ও ওয়াদা পালনের [illegible] কঠোর নির্দেশ রয়েছে, এবং যা ভংগ করার বা বদল করার [illegible] তাঁর কঠোর নিষেধ রয়েছে, আমি সেরূপ প্রতিজ্ঞাই করছি। তাই [illegible] মু'মিনীনের হারুন ও আবদুল্লাহ্‌ বিন আমীরুল মু'মিনীনের [illegible] চুক্তিপত্রের মাধ্যমে আমি যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হলাম, তা যদি [illegible] সেরূপ কোন চিন্তা করি কিংবা তা পরিবর্তন করার খেয়াল [illegible] ছোট হোক, বড় হোক, নর কিংবা নারী হোক, ভাল বা মন্দ [illegible] মানুষ হোক তার পরামর্শে যদি সেরূপ কিছু পাই এবং [illegible], তা হলে মহান আল্লাহ্‌র নিকট থেকে, তাঁর প্রতিনিধিত্ব থেকে [illegible] থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুশরিকরূপে কেয়ামতের দিন উপস্থিত [illegible]। [illegible] আমার যে সব স্ত্রী রয়েছে অথবা আগামী ত্রিশ বছরের [illegible] যে সব স্ত্রী আমার হবে, সবার ওপরে তিন তালাক বায়েন হবে। [illegible] আমার ওপরে ফরজ হবে ত্রিশ বছরের ত্রিশটা হজ্জ খালি পায়ে [illegible] মক্কা শরীফে গিয়ে আদায় করা। কিন্তু আমার এ মানত [illegible] যেন আল্লাহ্‌ কবুল না করেন। আমি প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপই শুধু [illegible] যাব। তাছাড়া আজ যেসব ধনসম্পদ আমার কাছে রয়েছে [illegible] আগামী ত্রিশ বছরে যা কিছু আমি উপার্জন করব তা কা'বা [illegible] জন্যে হাদিয়া স্বরূপ পাঠিয়ে দেয়া আমার ওপরে ওয়াজিব হবে। [illegible] দাসী আমার রয়েছে অথবা আগামী ত্রিশ বছরে আরও যেসব [illegible] আমার মিলবে সবই আযাদ হয়ে যাবে।

[illegible] কথা এই চুক্তিপত্র দ্বারা আমি আমীরুল মু'মিনীন হারুন [illegible] বিন আমীরুল মু'মিনীনের সাথে যে ওয়াদায় আবদ্ধ [illegible] তা পূরা করা আমার ওপরে অপরিহার্য হবে। এর বিরুদ্ধে [illegible] কখনো কোন দুশ্চিন্তা স্থান পাবে না এবং এ ছাড়া অন্য [illegible] আমার মনে জাগতে পারবে না। যদি তা হয়, তা হলে [illegible] যে সব প্রায়শ্চিত্তের কথা উল্লেখ করলাম তা সবই [illegible] আমার ওপরে অপরিহার্য হবে। সে সময়ে আমীরুল মু'-[illegible] সেনানায়ক; সৈন্যদল,, সব প্রজা ও সর্বসাধারণ মুসলমান [illegible] খিলাফতের বাইয়াত থেকে মুক্ত হবে এবং আমার তাদের ওপরে

খিলাফতের নামে কোনই অধিকার থাকবে না এমন কি আমি একজন রাস্তার ও হাট-বাজারের সাধারণ ব্যক্তিরূপে গণ্য হব। আমার আনুগত্যের কারুর আর প্রয়োজন থাকবে না। তাই সর্বসাধারণ যেসব শর্ত সহকারে আমার আনুগত্যের শপথ নিয়েছে তাদের তা ভংগ করা জায়েজ হবে।

চুক্তিপত্র

দুই

মামুনও এ ভাবের একটা চুক্তিপত্র লিখে দিয়েছিলেন অথবা তাঁর পক্ষ থেকে লিখানো হয়েছিল। যার সংক্ষিপ্তসার হল এই:

"আমীরুল মু'মিনীন হারুন-অর-রশীদ আমীনের পরবর্তী খলীফা-রূপে আমাকে মনোনয়ন দান করেছেন। আমীন এক চুক্তিপত্র দান করেছেন। তাতে তিনি আমার দাবী ও অধিকার মেনে নিয়ে তা সর্বতোভাবে রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন। আমিও আমীনের আনুগত্য মেনে চলব। যদি তিনি সৈন্য বা অন্য কিছুর সাহায্য চান তা হলে আমি যথা সময়ে তা করব। যদ্দিন তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি ভংগ না করবেন, তদ্দিন আমি তাঁর সাথে পূর্ণ সহযোগিতা রেখে চলব। যদি আমীন চান যে, তাঁর পরে তাঁর কোন ছেলেকে আমার পরবর্তী খলীফারূপে মনোনয়ন দান করবেন তা হলে আমি তা এই শর্তে মেনে নেব যে, তিনি আমার অধিকার আদৌ ক্ষুণ্ণ করবেন না। কিন্তু, স্বয়ং আমীরুল মু'মিনীন যদি আমার পরবর্তী খলীফারূপে অন্য কাউকে মনোনয়ন দান করেন তা হলে আমীন ও আমাকে তাই মেনে নিতে বাধ্য থাকতে হবে।"

* * *

অনেক লোক হারুন-অর-রশীদের জীবদ্দশায় আমীন ও মামুন সাধারণত শাসনকার্য ও রাজ্য সংরক্ষণের ব্যাপারে সমান অংশই গ্রহণ করতেন। কিন্তু সে সময়কার কতিপয় অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, আমীন খিলাফতের দায়িত্ব কোনমতেই সামলাবার যোগ্যতা রাখতেন না। তাই হারুন তাঁর দায়িত্ব ও অধিকার অনেকটা হ্রাস করে দিয়েছিলেন। সাথে সাথে তিনি ক্রমেই মামুনকে প্রাধান্য দিতে লাগলেন। তাঁর এ সব কার্য-কলাপ প্রকারান্তরে এটাই প্রমাণ করত যে, খিলাফতের গুরুদায়িত্ব বহন করার যোগ্যতা শুধু মামুনেরই রয়েছে—আমীনের নয়।

১৮৯ হিজরী মুতাবিক ৮০৪ খৃস্টাব্দে খলীফা প্রকাশ্যেই কেরমাসীন নামক স্থানে বললেন—ধন-সম্পদ, রাজস্ব, অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ যা রয়েছে সবই মামুনের। তারপর সমস্ত দরবারের লোক জমায়েত করে ঘোষণা করলেন—তোমরাও এ কথার সাক্ষী থেকো।

১৯০ হিজরীতে যখন রোমান সাম্রাজ্যের ওপরে আক্রমণ চালানো হয় তখন রেক্কা শহরে (বাগদাদের স্থলে যে স্থানকে রাজধানী করা হবে বলে নির্ধারিত হয়েছিল) মামুনকেই খলীফা তাঁর স্থলাভিষিক্ত বলে ঘোষণা করেন। এমনকি প্রতীক অনুষ্ঠান হিসেবে মামুনকে তিনি খলীফা মনসূরের খিলাফতের মোহরযুক্ত আংটি প্রদান করেন। অবশ্য আমীন খলীফার এসব কার্যকলাপ বড়ই ঈর্ষার চোখে দেখতেন। কিন্তু তাঁর কিছু করার ছিল না। ১৯৩ হিজরীতে যখন খোরাসানের কোন কোন জেলায় বিদ্রোহ দেখা দিল তখন খলীফা স্বয়ং সে বিদ্রোহ দমন করতে সসৈন্যে অগ্রসর হলেন। পথিমধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সংগে সংগে সে খবর রাষ্ট্রময় ছড়িয়ে পড়ল।

ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তোলার জন্যে আমীনের ছিল সেটা একটা সুবর্ণ সুযোগ। কারণ, দরবারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা সবাই ছিলেন তাঁর সমর্থক। বিশেষ করে উজীরে আজম ফজল বিন রব্বী' ছিলেন আমীনের ডান হাত। তিনি ছিলেন আরব সন্তান। তদুপরি আমীন তাঁরই দায়িত্বে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেছেন। হারুনের সাথে যদিও সে সময়ে আমীন বা মামুন কেউই ছিল না কিন্তু ফজল বিন রব্বী'র প্রভাবে দরবারের ওপরে আমীনেরই কর্তৃত্ব ছিল। হারুনের অসুস্থ হবার খবর শোনামাত্র আমীন জনৈক দূতের মারফৎ দরবারের সভাসদদের নামে বহু চিঠি পাঠালেন।

হারুন সেই অসুস্থতা নিয়েই ১৯৬ হিজরীর ৩রা জমাদিউসসানী ইন্তেকাল করলেন। হারুনের মৃত্যুর খবর পাবার সংগে সংগে আমীনের দূত তার চিঠি দরবারের সবারই কাছে পৌঁছালেন। তাতে লেখা ছিল, "যার যার সৈন্য, রাজস্ব ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাজধানী বাগদাদে উপস্থিত হও।"

অবশ্য এ ফরমান পেয়ে সভাসদদের কোন কোন সেনাপতি ও কর্মকর্তা তা মেনে নিতে দ্বিধা করছিলেন। কিন্তু ফজল বিন রব্বী'র ব্যক্তিত্ব এরূপ ছিল যে, গোটা দরবার তার ইংগিতে উঠত বসত। তিনি সবাইকে

[illegible] দিলেন যে, রাজধানী যখন আমীনের হাতে তখন মামুনের সেখানে [illegible] মূল্য নেই। যেহেতু স্বভাবত সৈন্যদল বাগদাদের ভক্ত ছিল, তাই [illegible] হাত করার ব্যাপারে আমীনের চাতুরী সহজেই সাফল্যমণ্ডিত হল।

[illegible] মামুনের এর চাইতে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে যে, সৈন্য-[illegible] তার বিরুদ্ধে গেল ও রাজকোষ (যাতে মণিমুক্তা ও অন্যান্য উপকরণ [illegible] নগদ দেরহাম ছিল পঞ্চাশ কোটি) তার হাতছাড়া হল। মোট কথা [illegible] কিছুই যেন বাগদাদের দিকে ছুটে চলল।

মামুন তখন ছিলেন মার্ভে। যখনই তিনি এ খবর পেলেন, দরবারের [illegible] ডেকে পরামর্শ চাইলেন। সবাই উত্তেজিত হয়ে বললেন, "দু" [illegible] পেলে আমরা এক্ষুনি শাহী ফৌজ ফিরিয়ে নিয়ে আসতে [illegible]।'

কিন্তু ফজল বিন সুহায়েল (মামুনের উজীরে আজম) মামুনকে [illegible] ডেকে নিয়ে বললেন—অসংখ্য শাহী ফৌজের মুকাবিলায় আপ[illegible] এ নগণ্য সৈন্যদল জয়লাভ তো দূরের কথা, পরাজিত হয়ে প্রাণ বাঁচা-[illegible] আপনাকেই শত্রুর হাতে তুলে দেবে। যদি ভাল মনে করেন [illegible] চিঠি পাঠিয়ে আগে আপনি সৈন্যদের অবস্থা জেনে নিন।

মামুন তাই করলেন। বিশেষ দূতের মারফৎ তিনি দরবারে চিঠি পাঠালেন। ফজল বিন রব্বী' সে চিঠি পাঠ করে বললেন—আমি তো [illegible] অনুসারী। জনমত যেদিকে থাকবে, আমিও সেদিকে থাকব। [illegible] আবদুর রহমান নামক এক সেনপতি মামুনের দূতের [illegible] বল্লমের অগ্রভাগ রেখে বললো—যদি তোমার প্রভু এক্ষণে [illegible] তা হলে এই বল্লম তার পার্শ্বভেদ করে চলে যেত।

মামুনের সামনে ছিল তখন বিপদের পর বিপদ। একদিকে তার [illegible] ও সৈন্যদল নেই বললেই চলে ; অপরদিকে এই ভ্রাতৃবিরোধের সুযোগে [illegible] প্রায় সমগ্র সীমান্ত এলাকা বিদ্রোহ ঘোষণার জন্যে প্রস্তুত [illegible]। মামুনের তাই হতাশায় ভেংগে পড়ার উপক্রম হলো। খিলাফতের [illegible] চিরতরে জলাঞ্জলী দিতে বসলেন। যদি বিজ্ঞ প্রধানমন্ত্রী ফজল [illegible] তাঁকে দৃঢ়তার সাথে সান্ত্বনা না যোগাতেন তা হলে মামুন [illegible] শাসনকার্য থেকে হাত গুটিয়ে ফেলতেন। তাই তিনি ফজলকে [illegible] বলে দিলেন—রাজ্যভার সামলানো আমার কাজ নয়। ভাল-

মন্দ সব কিছুর মালিক তুমি। আমি রাজ্যের সব দায়িত্ব তোমার হাতে ছেড়ে দিলাম।

ফজল পড়লেন মহা বিপদে। কোন কূল দেখছিলেন না তিনি। বাহ্যত এমন কোন দিক ছিল না যে দিকে পা রেখে তিনি মামুনের কিশতী পার করতে পারেন। পরন্ত তিনি এ ব্যাপারে মামুনের সেনাপতিদের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। অমনি সবাই কানে হাত রেখে বলল—হায়! কি করে আমরা ভাই-ভাইয়ের বিরোধে দখল দেব? অসম্ভব ব্যাপার!

এতেও ফজল দমে গেলেন না। তিনি তাঁর দূঢ় দূরদর্শী অন্তরে দেখতে পেলেন, মামুনের সাফল্যলাভ সুনিশ্চিত। যদিও মামুনের সৈনাদল ক্ষুদ্র, তথাপি তার জ্ঞানচর্চার দরবার আলেম-ফাজেলদের বৃহত্তর দল অলংকৃত করে থাকতো। সেসব বিজ্ঞ ও প্রসিদ্ধ আলেমদের প্রভাব রাজ্যময় ছড়িয়ে দিল। জনসাধারণ তাঁদের সাধনা ও মনীষার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাশীল ছিল। ফজল এসব ধর্মনেতাদের সহায়তা পেয়ে অসাধ্য সাধন করলেন। বড় বড় সেনাপতির দ্বারাও এ কাজ তার পক্ষে আদৌ সম্ভবপর হ'ত না।

দরবারের সেই সুধী আলেম দল দেশের দিকে দিকে ছুটে গেলেন এবং ফতোয়া ও ওয়াজ নসীহত দ্বারা গোটা দেশের জনতাকে মামুনের পেছনে এরূপ দৃঢ়ভাবে সংঘবদ্ধ করে তুললেন যে, যে কোন মুহূর্তে তারা ওলামা সমাজের ইংগিতে বিপ্লব সৃষ্টির জন্যে প্রস্তুত হল।

মামুনের ব্যক্তিগত প্রভাবও জনসাধারণের ভেতরে যথেষ্ট ছিল। তাঁর জ্ঞান ও যোগ্যতার সুখ্যাতি ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। তার ওপর তিনি সমগ্র খোরাসানের জনসাধারণের কল্যাণের জন্যে তাদের এক চতুর্থাংশ রাজস্ব ক্ষমা করে দেয়ায় তারা মামুনের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হল। তারা সমবেত কণ্ঠে এ কথাই ঘোষণা করে চলল—আমাদের ভাগ্নেয় ও হযরতের চাচাত ভাই'র জন্যে কেন আমরা প্রাণ উৎসর্গ করব না?

মামুনের মাতা ছিলেন ইরানী। তাই ইরানের জনসাধারণ তাকে ভাগ্নেয় বলে ডাকত।

মামুন বনাম আমীন

সামরিক সাফল্য অর্জনের পরে মামুন সম্পর্কে আমীনের আর কোন মাথা ব্যথা ছিল না। আমীন এখন অভিষেক অনুষ্ঠানের ব্যাপার নিয়ে মেতে উঠলেন। সিংহাসনে আরোহণের পরের দিনই তিনি মনসুরের [illegible] সামনে একটা শকুন তৈরী করিয়ে নিলেন। দিকে দিকে লোক পাঠালেন—গায়ক, ভাঁড় ও রসিক ব্যক্তিদের যে যেখানে রয়েছে বেতন ভাতা নির্ধারিত করে সব রাজধানীতে পাঠিয়ে দেবার জন্যে। হাতী, সিংহ, সাপ, বাঘ ও ঘোড়া ইত্যাদির মত নৌকা গড়ালেন এবং তাতে চড়ে জলপথে বিহার শুরু করলেন। এ সব উৎসবের প্রাচুর্যে ডুবে মামুনের কথা ভাববার অবকাশ অমীনের কমই ছিল।

কিন্তু যে ফজল বিন রব্বী' ছিলেন মামুনের সব ব্যর্থতার মূলে আর যার কৃতিত্বের বদৌলতে তিনি আমীনের উযীরে আযম পদ অলংকৃত করেছিলেন, মামুন সম্পর্কে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না আদৌ। তিনি আমীনকে বারবার বলে মামুনকে খিলাফতের অধিকার থেকে বঞ্চিত করায় রাজী করালেন।

আমীন গোড়ার দিকে এ প্রস্তাবে সম্মত ছিলেন না। ফজল তখন তাঁকে বুঝালেন যে, খলীফা প্রথমে যখন আপনার খিলাফতের বাইয়াত নিয়েছেন সবার কাছ থেকে, তখন তো মামুনের প্রশ্ন সেখানে ছিল না। তাই এখন তা পরিবর্তন করার অধিকার খলীফার ছিল না। ফজলের এ যুক্তি আমীনের মনঃপুত হল। তাই তিনি স্থির করলেন, মামুনের স্থলে মূসাকে ভাবী খলীফা হিসেবে মনোনয়ন দিয়ে সবার থেকে আবার নতুন করে বাইয়াত আদায় করা হবে। মূসা ছিল তাঁরই অল্পবয়স্ক পুত্র।

আমীন যখন তার নতুন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে দরবারের সবার মতামত জানতে চাইলেন, তখন আবদুল্লাহ বিন হাশেম নির্ভীকভাবে জবাব দিলেন ইসলামের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কাউকে ওয়াদা ভংগ করতে দেখা যায় নি। আপনি মনে রাখবেন, আজ থেকে আপনি ইতিহাসে নতুন

অধ্যায় সৃষ্টি করতে চলছেন।

আমীন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—চুপ হও! আবদুল মালিক তোমার চাইতে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। তিনি বলে গেছেন—এক বনে দুই বাঘ থাকতে পারে না।

এরপরে সেনাপতিদের ডাকা হল। সেনাপতি খোসায়মা তাঁকে সাফ সাফ বলে ফেললেন—যদি আপনি মামুনের সাথে প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন, তা হলে আমাদের সাথেও আপনার সম্পর্ক এখানেই শেষ হবে।

আমীন এবারে ঘাবড়ে গিয়ে সে ইচ্ছা ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু ফজল বিন রব্বী'র যাদুর প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই সারা দেশে তিনি ফরমান পাঠিয়ে দিলেন যে, সর্বত্র খুতবা পাঠের সময়ে যেন মামুনের পরে মূসার নামও উল্লেখ করা হয়।

মামুন এতদিনে নিজ ক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হলেন। তাই তিনি এখন থেকে প্রকাশ্যেই আমীনের বিরোধিতা শুরু করলেন।

আমীন শাহযাদা আব্বাসকে পাঠালেন মামুনের কাছে বিশেষ দূত করে। উদ্দেশ্য ছিল মামুন যেন তার পরবর্তী খলীফা হিসেবে মূসার মনোনয়নের প্রতি সমর্থন জানান। মামুন সে প্রস্তাব সরাসরি অস্বীকার করলেন। এরপরে আমীন খোরাসানের কয়েকটি জেলা ছেড়ে দেবার জন্যে মামুনকে পাঠালেন। মামুন তার দূতের কাছে বলে দিলেন—এ ধরনের অভিপ্রায় থেকে আমীনের বিরত থাকা উচিত।

এসব কার্যক্রম ও ঘটনাচক্র মূলত আশু গৃহযুদ্ধের ভূমিকা ছিল মাত্র। তাই মামুন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সব এলাকায় এ ফরমান পাঠালেন যে, কোন বিখ্যাত ব্যবসায়ী কিংবা বিশেষ অনুমোদনে পত্রবাহী ব্যতীত কেউ যেন রাজ্যের ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। তাঁর সেনাপতিদের খবর পাঠালেন যে, সীমান্ত এলাকায় রক্ষা ব্যবস্থা যেন স্বাভাবিক অবস্থার চাইতে দৃঢ়তর করে তোলা হয়। তাহের বিন হুসায়েনকে পাঠানো হল যথাসম্ভব গিয়ে শত্রু-প্রবেশের সম্ভাব্য পথগুলো বন্ধ করে দেবার জন্যে।

আক্রান্ত মামুন

(১৯৫ হিঃ—৮১০ খৃঃ)

[illegible] এদিন সূত্র খুঁজে ফিরছিলেন। তাই মামুন পর পর যে দুর্ব্যবহার [illegible], তাতে আমীন উত্তেজিত হয়ে যুদ্ধের আয়োজন চালালেন। [illegible] যে চুক্তিপত্র লেখা হয়েছিল তিনি তা কা'বা ঘর থেকে [illegible] এনে টুকরো টুকরো করে ফেললেন এবং তাঁর পাঁচ বছরের ছেলে [illegible] '[illegible] বিল হক' উপাধি দিয়ে পরবর্তী খলীফারূপে মনোনয়ন করলেন। দেশের সর্বত্র কর্মকর্তাদের জানিয়ে দেয়া হল যে, এখন [illegible] আর মামুনের নাম থাকবে না, বরং তদস্থলে মূসার নাম [illegible] হবে।

[illegible] সৈন্যদলকে প্রস্তুতি নেবার জন্যে নির্দেশ দেয়া হল।

[illegible] সেনাপতি আলী বিন ঈসাকে দু'লাখ দীনার পুরস্কার দেয়া হল। [illegible] মহামূল্যবান পোশাক দেয়া হল সাধারণ সেনানায়কদের। [illegible] পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে যেদিন সেনাদল মামুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ [illegible] রওয়ানা হল, সেদিন শহরের যে সব প্রবীণ লোক সৈন্যদের [illegible] দেখার সৌভাগ্যলাভ করেছিলেন, তারা পর্যন্ত বিস্মিত হয়ে

[illegible] বিন ঈসা মামুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রওয়ানা হবার সময়ে রাজমাতা [illegible] বিদায় নিতে গেলেন। যোবায়েদা একখানা সোনার [illegible] তার হাতে দিয়ে বললেন—বাবা! মামুন যদি পরাজিতই হয় [illegible] তোমাদের শৃংখলাবদ্ধ করে আনতে হয়, তা হলে যেন এই [illegible] তাকে বাঁধা হয়। স্মরণ রেখ, আমীন যদিও আমার [illegible], তবুও আমার ওপরে মামুনেরও অধিকার রয়েছে। সে কার [illegible] তা তোমরা ভাল করেই জান। যদি সে গ্রেফতার [illegible] মর্যাদা সহকারে তাকে গ্রহণ করবে। যদি সে কোনরূপ [illegible] করে, সহ্য করবে তা। সাবধান! পথে যেন তার

কোনরূপ অসুবিধে না ঘটে। তার মর্যাদা যে কত বেশি তা তোমাদের অজানা নেই। মনে রেখো, তুমি কখনও তার সমকক্ষ নও।

যা হোক, আলী বিন ঈসা পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে 'রে' অভিমুখে এগিয়ে চলল। পথে যেসব ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে দেখা হল তারা সবাই বলল যে, 'রে' এলাকায় তাহের যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু আলী সংখ্যাধিক্যের অহংকারে এত মেতে চলল যে, সেসব কথা আদৌ যেন কানে তুলল না। সে ক্রমাগত এগিয়ে 'রে'র সীমান্তে পৌঁছল।

এদিকে তাহেরকে শহরবাসী পরামর্শ দিল যে, শহরে থেকেই যেন সে আলীর মুকাবিলা করে। কারণ, তার সৈন্যসংখ্যা কম। এত অল্প সৈন্য নিয়ে প্রকাশ্য ময়দানে নেমে যুদ্ধ করা লাভজনক হবে না।

তাহের ভাবল অন্যদিক। সে ভাবল—আলীকে যদি শহরেই ঢুকতে দেয়া হয়, তা হলে তাদের বিজয়ী ভেবে শহরবাসীও তাদের পক্ষ নিয়ে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে। তাই সে মাত্র চার হাজার সৈন্য নিয়েই প্রকাশ্য ময়দানে আলীর পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে অবতীর্ণ হল। আলীও তা দেখে সামনে এগোল। কাছাকাছি হয়ে উভয় দল সৈন্য সাজালো।

আলীর সৈন্যদল অত্যন্ত সুশৃংখলভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। সবার আগের সারিতে দাঁড়াল বর্মধারী দল। তার পরে প্রতি একশ' কদম ব্যবধানে এক একটা পতাকা এবং তার নীচে একশ' করে অশ্বারোহী। সব পতাকার পেছনে শাহী ব্যূহ। তার মাঝখানে ছিল স্বয়ং আলী বিন ঈসা। তার আশে-পাশে ছিল বড় বড় অভিজ্ঞ সেনানায়ক।

তাহেরের সৈন্যদল ছিল ক্ষুদ্র। তাই সে তাদের উদ্দেশে এক উদ্দীপনা-পূর্ণ বক্তৃতা দিল। তার ফলে তারা এতই অনুপ্রাণিত হল যে, শত্রুদলের সংখ্যাধিক্যের কথা যেন তারা বেমালুম ভুলেই গেল।

সবার আগে যে ব্যক্তি সারি থেকে বেরিয়ে এল যুদ্ধের জন্যে, তার নাম 'হাতেমতাই'। আলীর সৈন্যদলের সে ছিল এক বিখ্যাত যোদ্ধা। তাহের তার খ্যাতির কোনই পরোয়া না করে স্বয়ং তার সাথে দ্বৈত যুদ্ধে এগিয়ে গেল। নিজের বাহুবলের ওপরে তার ভরসা ছিল যথেষ্ট। ময়দানে এসে সে তীব্র উত্তেজনার সাথে দু'হাতে তরবারি চেপে এরূপ জোরে আঘাত হানল যে, বেচারা হাতেমতাই সে আঘাতেই দ্বিখণ্ডিত হয়ে পরপারের যাত্রী

[illegible]। সেই থেকে তাহের সবার মুখে নাম পেল, 'জুল য়্যামীনায়েন' বা দুটি ডান হাতের মালিক।

[illegible] ব্যাপক যুদ্ধ শুরু হল। আলীর সৈন্যদল তাহেরের ডান ও বাম পাশের সারির ওপরে এরূপ তীব্র আক্রমণ চালালো যে, তাহেরের সৈন্যদল পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হল। তবুও তাহের স্বয়ং যুদ্ধের ময়দানে পাহাড়ের মত অটল রইল। পুনরায় সে সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ করে নিয়ে আলীর পতাকাবাহীদের ওপরে আক্রমণ চালালো। তার পর পর আক্রমণে পতাকা-বাহী দলের সারিগুলো ওলটপালট হয়ে গেল। ফলে এরূপ একটা হৈ চৈ পড়ে গেল যে, আলীর সৈন্যদলের ভিতর নৈরাশ্যের কালোছায়া নেমে এল। তারাও সাথে সাথে পুরোপুরি ছত্রভংগ হয়ে পড়ল। আলী তা সামলে নেবার হাজার চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হল। এরূপ হৈ-হল্লোড়ের ভেতর হঠাৎ একটা তীর এসে আলীর পার্শ্বভেদ করে চলে গেল। হতভাগার প্রাণবায়ু অকস্মাৎ শূন্যাকাশে মিলিয়ে গেল। তাহের তখন সহজেই যুদ্ধ জয় করল।

তাহের এই যুদ্ধ জয়ের সংবাদ মামুনের কাছে সংক্ষেপে এভাবে লিখে জানাল ঃ আমীরুল মু'মিনীনের কাছে লিখছি। আলীর শির আমার সামনে পড়ে আছে। তার আংটি আমার অংগুলির শোভা বাড়িয়েছে। তার সৈন্যদল আমার করতলগত হয়েছে।

তাহেরের দূত রে থেকে মার্ভ পর্যন্ত দীর্ঘ আড়াইশ' ফরসং পথ মাত্র তিন দিনে অতিক্রম করে মামুনের দরবারে পৌঁছল। তার দু'দিন পরে আলীর শিরও সেখানে পাঠানো হল। গোটা খোরাসানে বিজয় উৎসব উদযাপিত হল।

ওদিকে আমীন তখন রাজধানীর শাহী পুকুরের তীরে বসে প্রিয় গোলাম কাওসারকে সাথে নিয়ে মাছ শিকারের তামাশা দেখছিলেন। হাউজে ছিল রং-বেরংয়ের মাছ। সোনার চেইন জুড়ে দেয়া হয়েছিল কোন কোন মাছের গায়ে। আর সে চেইন ছিল মণিমুক্তা খচিত। কথা ছিল, যার হাতে যে মাছ ধরা পড়বে, সে সেই মাছের সাথে জড়িত সম্পদও পেয়ে যাবে।

সুন্দরী দাসীদের সাথে নিয়ে এভাবে মাছ শিকারের বাতিক আমীনকে পুরোপুরি পেয়ে বসেছিল। সেদিনও তিনি মহানন্দে তাই করে চলছিলেন। ঠিক তেমনি সময়ে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই সৈন্যদলের পরাজয় ও আলীর নিহত হবার সংবাদ নিয়ে সেখানে বিশেষ দূত উপস্থিত হল। আমীন

তা শুনে হুংকার ছেড়ে বললেন—চুপ থাক ! কাওসার একে একে দু'টি মাছ ধরে ফেলল আর আমি সকাল থেকে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে এখন পর্যন্ত একটা মাছও ধরতে পারলাম না।

শিকার থেকে অবসর হয়ে আমীন ফজল বিন রব্বী'কে খবর দিলেন। তিনি এসে পরাজয়ের প্রতিকার ব্যবস্থা এই করলেন যে, বাগদাদে মামুনের যিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাঁকে গ্রেফতার করে তাঁর মাল-পত্তর বাজেয়াপ্ত করা ছাড়াও নগদ দশ লাখ টাকা আদায় করে ছাড়লেন।

আমীন আবার একদল সৈন্য প্রস্তুত করলেন মামুনকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্যে। এ দলের সংখ্যা এক লাখের মত ছিল। আবদুর রহমানকে এ দলের প্রধান সেনাপতি করা হল।

তাহের তখন হামদানের নিকটেই অবস্থান করছিল। তাই এই সৈন্যদল হামদানের সীমান্তে পৌঁছে তাঁবু ফেলল। আবদুর রহমান হামদানে তার সদর দফতর বসাল। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে সে অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়োজিত করল।

তাহের সসৈন্যে এসে হামদান আক্রমণ করল। মাসের পর মাস শহর অবরোধ চলল। অনন্যোপায় হয়ে আবদুর রহমান সন্ধি প্রার্থনা করল। সন্ধির শর্ত অনুসারে সে শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল। তার পর তাহের সসৈন্যে এগিয়ে গিয়ে কাজভীন আক্রমণ করল। কাজভীনের শাসনকর্তা ছিল কাসীর। তাহেরের আক্রমণের খবর শুনেই সে শহর ছেড়ে পালিয়েছিল। তাই অনায়াসেই তাহের কাজভীন জয় করে নিল।

হঠাৎ বিপদ দেখা দিল। আবদুর রহমান ফিরে এসে অতর্কিত হামলা চালালো তাহেরের বাহিনীর ওপরে। তারা একেবারেই অপ্রস্তুত ছিল। এমন কি হাতিয়ার-পোশাক নেবার ফুরসৎও পেল না তারা। শুধু পদাতিক বাহিনী প্রস্তুত ছিল। তারা দৃঢ়তার সাথে আবদুর রহমানের প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত করছিল। ইত্যবসরে তাহেরের অশ্বারোহী দলও প্রস্তুতি সেরে নিল।

ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হল। শেষ পর্যন্ত আবদুর রহমানের বাহিনী পরাজিত হল। কিন্তু বীর সেনাপতি আবদুর রহমান পশ্চাদপসরণ করল না। দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে মুষ্টিমেয় সাথী নিয়ে যুদ্ধ করে চললো। সাথীরা তাকে বুঝিয়ে বলল যে, এখন আর যুদ্ধ করে কোন লাভ নেই।

আবদুর রহমান তা শুনে গর্জে উঠে বলল—চুপ কর। আমি খলীফা আমীনের কাছে পরাজয়ের কলংক কালিমালিপ্ত মুখ দেখাতে পারব না। এই বলে সে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে প্রাণ উৎসর্গ করল।

এই বিজয়ের ফলে দূর দূরান্ত পর্যন্ত তাহেরের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হল। [illegible] প্রদেশের সব এলাকাই তার করতলগত হল।

এই পরাজয়ের খবর পেয়েও আমীন দমে গেলেন না। তিনি আবার [illegible] প্রস্তুত করে নতুনভাবে শক্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন। এই নতুন বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল অন্যূন চল্লিশ হাজার। আব্বাসীয় [illegible] সেরা দুই সেনানায়ক আহমদ বিন যায়েদ ও আবদুর রহমান [illegible] ওপরে এই বাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হল।

তাহের এই বীর সেনাপতি দু'জনকে ভাল করেই জানত। সে [illegible] বুঝতে পারল যে, এদের সাথে মুকাবিলা করা তার কাজ নয়। তাই সে তরবারির বদলে তদবীরের আশ্রয় নিল। গোপন চিঠি [illegible] লিখে দুই সেনাপতির ভেতরে বিভেদ সৃষ্টি করল। এমন কি দুই সেনাপতির ভেতরেই লড়াই শুরু হয়ে গেল।

এভাবে তাহেরের চালে পড়ে দুই সেনাপতি পরস্পর শক্তি পরীক্ষায় [illegible] যে শক্তি দিয়ে তাহেরকে পর্যুদস্ত করবে তা নিঃশেষ করে [illegible] বাগদাদে ফিরে গেল। তাহেরকে আর লড়াই করতে হল না।

[illegible] জয়ের পর জয় লাভের ফলে মামুনের আশা ও উৎসাহ বেড়ে [illegible]। তিনি আমীরুল মু'মিনীন উপাধি নিলেন। দরবারের সবাইকে [illegible] খেতাব দিয়ে সম্মান দেখালেন। হামদান থেকে তিব্বত ও পারস্য [illegible] থেকে জুর্জান পর্যন্ত বিস্তীর্ণ যে ভূখণ্ড খলীফা মামুনের করতলগত [illegible] ফজল বিন সহল তার গভর্ণর নিযুক্ত হলেন। তার ওপরে তাঁকে '[illegible]' বা দুই রাজ্যের অধিপতি খেতাব দিলেন। তাছাড়া [illegible] মাসিক বেতন নির্ধারিত করলেন ত্রিশ লাখ দেরহাম। এভাবে [illegible] বিন সহলকে রাজস্ব সচিব, আলী বিন হিসামকে সমর সচিব ও [illegible] শিক্ষা সচিব পদে নিযুক্ত করে পুরস্কৃত করলেন।

বাগদাদ অভিযান

স্বয়ং তাহের শোয়াশানে তাঁবু গেড়ে বসল। রুস্তমীকে পাঠালে আহওয়াযে। সে এলাকায় আমীনের নিযুক্ত শাসনকর্তার নাম ছিল মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ বিন হাতেম আল মাইলাবী। রুস্তমীর আগমন বার্তা পেয়েই সে আহওয়ায পৌঁছল! সেখানে পৌঁছেই সে দুর্গ তৈরী শুরু করল। কিন্তু পরদিনই সেখানে রুস্তমী ও কুরায়শী এসে পৌঁছে গেল। কুরায়শীকে তাহের পাঠিয়েছিল রুস্তমীর সহায়তার জন্যে আরেক দল সৈন্য দিয়ে। তাই দুর্গ তৈরী আর হল না! প্রকাশ্য ময়দানে উভয়দলের ভেতরে ভয়ানক লড়াই হল। মুহাম্মদের বাহিনী রণে ভংগ দিল। যে যেদিকে সুযোগ পেল পালাল।

বীরবর মুহাম্মদ পালাল না। সে দৃঢ়তার সাথে কতিপয় আত্মোৎসর্গী ভৃত্য নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে রইল। ভৃত্যদের উদ্দেশ্য করে সে বলল—পরাজয় অনিবার্য। যারা পালিয়ে গেছে তাদের ফিরিয়ে আনার আশা আর নেই। যারা দু'চারজন এখন ময়দানে রয়েছে তারাও যে পালাবে না তার নিশ্চয়তা নেই। আমি লড়াই করে প্রাণ দেব। তোমাদের অনুমতি দিলাম, যে যেদিকে সুযোগ পাও পালিয়ে যাও। আমি তোমাদের অহেতুক মৃত্যুর চাইতে বেঁচে থাকাই ভাল মনে করি।

ভৃত্যরা সবাই একবাক্যে বলে উঠল—আপনার মৃত্যুর পরে এই পৃথিবী ও পার্থিব জীবনের উপরে অভিসম্পাত হোক।

এর পরে মুহাম্মদ আল মাহলাবী ও তার ভৃত্যেরা ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল এবং পায়ে চলে একযোগে শত্রুদলের ওপরে ঝাপিয়ে পড়ল। মহাবীর মুহাম্মদের তরবারির আঘাতে তাহেরের বহু সৈন্য প্রাণ হারাল। কিন্তু অজস্র সৈন্য-সমুদ্রে কতক্ষণ আর সাঁতার কাটা যায়? অনেক শত্রুসৈন্য নিপাত করে অবশেষে মুহাম্মদও পরম বিশ্বস্ততার চরম নিদর্শন দেখিয়ে পরপারের যাত্রী হলো।

মুহাম্মদ বিন আরবের বিখ্যাত বীরগোত্র আলে মাহলাবের অন্যতম।

[illegible] মধ্যে এই গোত্রের অসীম বীরত্বপূর্ণ অমর কাহিনীগুলো [illegible] ছড়িয়ে রয়েছে। মুহাম্মদ নিজেও ছিল এই ঐতিহ্য-[illegible] অন্যতম বীর সন্তান। তাই তার মৃত্যুর খবর পেয়ে এমন [illegible] অধিনায়ক তাহেরও মর্মাহত হল।

এই জয়ের পরে আহওয়ায, য়েমামা, বাহরায়েন ও আম্মান তাহেরের [illegible] হল। দক্ষিণ এলাকা জয় শেষ করে এখন সে মধ্য এলাকার [illegible] এগিয়ে চলল। সে অঞ্চলের শাসনকর্তা তাহেরের অগ্রসরের খবর [illegible] পালিয়ে গেল। কুফা, বসরা ও সুসেমের শাসনকর্তারাও তাহেরের [illegible] স্বীকার করে পত্র দিল। ১৯৬ হিজরী পর্যন্ত তাহের যখন [illegible] জয়ের পর জয় চালিয়ে শুধু বাগদাদ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা [illegible] হস্তগত করল, তখন কেবল বার্মেকীর টনক নড়ল—ঘুম [illegible]। সে মাদায়েনে তাহেরকে বাধা দেবার প্রস্তুতি শুরু করল। [illegible] থেকেও সাহায্য আসতে লাগল। কিন্তু তাহেরের প্রভাব সবার [illegible] জমেছিল যে, বার্মেকীরা যখন তাকে বাধা দেবার জন্যে [illegible], তখন তার মুকাবিলায় সৈন্যদের শ্রেণীবদ্ধ করা মুশকিল হয়ে [illegible]। একদিক ঠিক করলে অন্যদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে [illegible] তাদের যেখানে ইচ্ছা চলে যাবার অনুমতি দিয়ে দিল।

[illegible] জয়ের খবর সবখানেই ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে মামুনের [illegible] দিন দিন বেড়ে চলছিল। হারামায়েন অর্থাৎ মক্কা-মদীনায়ও [illegible] খুতবা পাঠ শুরু হয়। মক্কা শরীফের শাসনকর্তা দাউদ [illegible] বিশিষ্ট নেতাদের সমবেত করে এক উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা দেয়। [illegible] বিরুদ্ধে অনেক কথা বলে সবার ভেতরে প্রবল উত্তেজনা [illegible]। সে বলে আমীন এরূপ জঘন্য ব্যক্তি যে, কা'বা ঘরে [illegible] চুক্তিপত্র ফিরিয়ে টুকরো টুকরো করে আগুনে নিক্ষেপ [illegible]। এ ব্যাপারে সে কা'বা ঘরের পবিত্রতা ও মর্যাদার প্রতিও বিন্দু [illegible] করেনি।

[illegible] শেষ করেই দাউদ মিম্বরে দাঁড়িয়ে তার মাথার টুপি খুলে [illegible] বলে—এভাবেই আমি আমীনকে ধুলার 'পরে নিক্ষেপ করছি। [illegible] সে সমগ্র আব্বাসীয়দের পক্ষ থেকে মামুনের খিলাফতের প্রতি [illegible] শপথ গ্রহণ করে।

[illegible] এ খবর পেয়ে দাউদকে পাঁচ হাজার দেরহাম পুরস্কার পাঠান

এবং মক্কার শাসনকর্তারূপে তাকে স্বীকৃতি দান করেন। কিছু দিনের ভেতরে যেমন ও অন্যান্য এলাকার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরাও তাহেরের আনুগত্য মেনে নেয়। ফলে, আমীনের রাজত্ব বাগদাদেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

এতদসত্ত্বেও আমীন হতাশ হলেন না। বিরাট এক সৈন্যদল গড়ে তুললেন। প্রায় চারশ' সেনানায়ক নিযুক্ত করলেন। আলী বিন মুহাম্মদের নেতৃত্বে সেই বিরাট বাহিনী তাহেরের সেনাপতি হারসামার বিরুদ্ধে পাঠা-লেন। ১৯৬ হিজরীর রমযান মাসে নহরওয়ানে উভয়দলের মুকাবিলা হল। আমীনের এ শেষ প্রচেষ্টাও ফলপ্রসূ হল না। তার সৈন্যদল পরাজিত ও পর্যুদস্ত হল। আলী জীবিত অবস্থায় ধরা পড়ল।

আমীনের সামনে এখন শুধু একটা পথই খোলা ছিল। ধন সম্পদের লালসায় ভুলিয়ে শত্রু-সৈন্যের ভেতরে ভাংগন সৃষ্টি করাই তার এখনকার একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়াল। আমীনের ধনভাণ্ডারে তখনও হারুন-অর-রশীদের জমা করা বহু ধনসম্পদ অবশিষ্ট ছিল। এই জরুরী অবস্থায় তা বেশ কাজে লাগল। সেই সম্পদের লালসায় পড়ে প্রায় পাঁচ হাজার সৈন্য তাহেরের দল ছেড়ে রাজধানীতে এসে উপস্থিত হল। আমীন চিঠিতে যে আশা দিয়েছিলেন তার চাইতেও বেশি পুরস্কৃত করলেন তাদের। গৌরবের প্রতীকস্বরূপ তাদের সবার দাড়ি মিশ্‌বা দ্বারা রংগীন করে দিলেন।

এইদল রাজধানী থেকে আরও সৈন্য সাথে নিয়ে তাহেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে অগ্রসর হল। সরসায় উভয় দলের মুকাবিলা হল। কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল প্রমাণ করে দিল যে, যারা তাহেরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এসেছে, তারা কিছুতেই আমীনের সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করতে পারে না। তাহের তাই অনায়াসেই চূড়ান্তভাবে জয়লাভ করলেন। অজস্র যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মালিক হলেন তিনি।

আমীন এবারে শেষ রফার জন্যে প্রস্তুত হলেন। বাগদাদের নাগরিকদের নিয়ে আরেকটি সৈন্যবাহিনী দাঁড় করালেন। সেনাপতিও করলেন তাদের থেকে। প্রত্যেক সেনাপতিকে প্রচুর বখশিশ দিলেন।

এর ফলে প্রবীণ ও অভিজ্ঞ সেনানায়করা খুবই অসন্তুষ্ট হল। ওদিকে তাহের এ খবর পেয়ে গোপনে তাদের সাথে পত্রালাপ চালালেন। শেষ পর্যন্ত তারা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। দরবারের সবাই আমীনের কাছে আবেদন জানালেন, তাদেরও যথাযোগ্য পুরস্কার দিয়ে অনুগত রাখা হোক।

কিন্তু, আমীন তাঁর নতুন সেনাবাহিনীর ওপরে এতখানি ভরসা স্থাপন করলেন যে, প্রবীণ ও অভিজ্ঞ সেনাদলের আদৌ পরোয়া করলেন না। তিনি [illegible] নতুন বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন বিদ্রোহী প্রবীণ সৈন্যদের গ্রেফতার [illegible] আনতে। ফলে, আমীনের নতুন ও পুরনো সেনাদলের ভেতরে যুদ্ধ [illegible] হল। এই সুযোগে তাহের অবাধে এগিয়ে এসে ১৯৬ হিজরীর জিলহজ্জ [illegible] আম্বারে পৌঁছে একটা বাগান দখল করে বসলেন। আমীনের [illegible] সেনানায়করা গিয়ে তাঁর কাছে হাজির হল এবং মোটা মোটা [illegible] নিয়ে ফিরে এল।

আমীনকে শহর ছেড়ে যাবার সিদ্ধান্ত থেকে ফিরিয়ে রাখ।

তাহেরের চাপে বাধ্য হয়ে তারা আমীনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। তারা অগত্যা গিয়ে আমীনের সকাশে উপস্থিত হয়ে আরজ করল —জাহাঁপনা ! যারা আপনাকে শহর ছেড়ে যাবার পরামর্শ দিয়েছে, তারা তা স্বার্থের বশীভূত হয়েই দিয়েছে। যেহেতু তারা তাহেরের বিরুদ্ধে সবচাইতে বেশি লড়াই করেছে, তাই তাদের আশংকা জন্মে গেছে যে, তাহের শহর জয় করে পয়লা তাদেরই খবর নেবে। তাই তারা মতলব এঁটেছে যে, হুযুরকে সিরিয়ার কথা বলে শাহী মহল থেকে বের করে নিয়েই গ্রেফতার করে তাহেরের হাতে সোপর্দ করবে। তা হলে হয়ত তাহের তাদের অপরাধ ভুলে যাবে। তার চেয়ে মংগলের পথ এটাই হবে যে, হুযুর এখন খিলা-ফতের আসন ত্যাগ করে তাহেরের হাতে আত্মসমর্পণ করুন। সে অবশ্যই আপনার যোগ্য মর্যাদা দেবে। ওদিকে মামুনও আপনার সাথে ভ্রাতৃসুলভ আচরণ করতে কিছুতেই ত্রুটি করবেন না।

অবস্থাচক্রে আমীন তাদের এরূপ প্রকাশ্য ধোকাও বুঝতে পারলেন না এবং এত অবমাননাকর প্রস্তাবেও সম্মত হলেন। শুধু এতটুকু অভিমত জানালেন যে, আত্মসমর্পণ তাহেরের হাতে না করে হারশামার হাতেই করা ভাল।

আমীনের বিশ্বস্ত ও আত্মোৎসর্গী সেনাপতি মুহাম্মদ বিন হাতেম ও মুহাম্মদ বিন ইব্রাহীম যখন এ খবর পেল, তক্ষুণি আমীনের কাছে ছুটে এসে আরজ করল—যদি আমাদের মতো শুভাকাঙ্খীদের পরামর্শ হুযুর উপেক্ষা করে স্বার্থপরদের পরামর্শই ভাল মনে করেন, তা হলে সরাসরি তাহেরের সাথেই যা করার করুন। সেটাই অপেক্ষাকৃত মংগলের হবে। বিষণ্ণবদনে আমীন জবাব দিলেন—আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি তার-পর থেকেই তাহেরের নাম শুনতেও আমি ভয় পাই। আমি দেখলাম ঃ লম্বা-চওড়া বিরাট এক আকাশজোড়া প্রাচীর। আমি শাহী পোশাক পরি-ধান করে তরবারি হাতে সেই দেয়ালের ওপরে দাঁড়িয়ে আছি। দেয়ালের গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে তাহের। সে তার ভিত্তি খুঁড়ছে। ধীরে ধীরে সেই বিশাল প্রাচীর উপড়ে পড়ল। আমিও তার সাথে ধূলায় লুটিয়ে পড়লাম। আমার শাহী তাজ মাথা থেকে ছিটকে পড়ে গেল।

কিছুক্ষণ থেমে নিয়ে আমীন আবার বললেন—সেই থেকে তাহেরকে মনে পড়তেই আমি চমকে উঠি। হারশামা এই বংশের নিমক খাওয়া

[illegible] পুরাতন সেবক। আমি তাকে আল্লাহ্‌র ছায়া হারুন-[illegible] সমান মনে করি।

[illegible] পর্যন্ত তাঁর এ মতে অটল রইলেন এবং হারশামার [illegible] প্রার্থনা করলেন। হারশামা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে [illegible] গ্রহণ করল। সে লিখল—আপনি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখুন যে, [illegible] কেউ আপনার একচুল ক্ষতিও করতে পারবে না। এমন কি [illegible] আপনার সম্পর্কে কোনরূপ খারাপ ধারণা রাখেন, তা হলে [illegible] আপনার জন্যে বুক পেতে দাঁড়াব। যতক্ষণ পর্যন্ত [illegible] নিঃশ্বাস বাকী থাকবে, ততক্ষণ আপনার পার্শ্ব ত্যাগ করব না।

[illegible] এ খবর জানতে পেল, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল। সে গর্জে [illegible] হতে পারে না। আজ পর্যন্ত আমীনকে পর্যুদস্ত [illegible] প্রাণপণে সবখানে লড়াই করে এসেছি। আমিনকে [illegible] জয়লাভের অধিকার কেবল আমার রয়েছে। তা [illegible] হাতে ছেড়ে দেয়া যায় না।

[illegible] মীমাংসার জন্যে বনু হাশিমের নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য সেনা-[illegible] বিরাট সম্মেলন বসল। সেখানে তাহের এবং হারশামাও [illegible] এই সিদ্ধান্ত হল যে, আমীন স্বয়ং হারশামার কাছে চলে [illegible], চাদর ও আংটি যা খিলাফতের সনদস্বরূপ রয়েছে, [illegible] তা পাঠিয়ে দেবেন।

[illegible] দেখা দেয় তখন নগ্ন হয়েই দেখা দেয়। আক্ষেপ ! [illegible] সিদ্ধান্তও হতভাগ্য আমীনকে বাঁচতে দিল না। [illegible] এক ব্যক্তি আমীনের বিশ্বস্ত অনুচর ছিল। সে তাহেরের [illegible] জন্যে উদগ্রীব হল। তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলল, [illegible] সাফ ধোঁকা দেয়া হয়েছে। সবাই মিলে ঠিক করেছে, [illegible] খিলাফতের চিহ্নগুলোও হারশামার কাছে পাঠিয়ে দেবে।

[illegible] এ কথা শুনে খুবই চটে গেল এবং একদল তীরন্দাজ সৈন্য [illegible] খোলদ ও কসরে যোবায়দার চারপাশে পাহারায় নিযুক্ত [illegible] আরও জানিয়ে দেয়া হল যে, আমীন যেন কিছুতেই [illegible] না পারেন।

[illegible] (৮১৩ খৃঃ) ২৫শে মুহররম দিনগত রাত্রি দশটার

সময়ে আমীন হারশামার কাছে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু হারশামা খবর পাঠাল যে, দজলার তীর ঘিরে তাহেরের সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে। তাই হুযুর যেন আজ রাতটা অপেক্ষা করেন। কালকে আমি সৈন্য-সামন্ত নিয়ে প্রস্তুত হয়ে হুযুরকে এগিয়ে আনব। যদি শত্রুদল বাধা দেয় তা হলে বুক পেতে লড়াই করব।

আমীন তখন এতই সন্ত্রস্ত ও অস্থির হয়ে পড়েছিলেন যে, রাজধানীতে এক মুহূর্ত থাকাও তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল। তিনি দূতকে বলে পাঠালেন—চিত্তে এত অস্থিরতা নিয়ে কি করে রাত কাটাব? আমাকে ডাকুক আর না ডাকুক, এক্ষুনি আমি হারশামার কাছে চলে আসছি।

আমীন তাঁর শেষ দরবার বসালেন। খিলাফতের পবিত্র দায়িত্ব থেকে বিদায় নেবার শেষ মুহূর্তে তিনি হোসনুল কস্‌রের বারান্দায় একটা কুরসী পেতে বসলেন। কতিপয় খাদেম বিষণ্ণ বদনে চারপাশে দাঁড়াল। তার উভয় ছেলেকে ডেকে আনা হল। তাদের বুকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন বাগদাদের রূপকথার নায়ক হারুন-অর-রশীদের আদরের দুলাল খলীফাতুল মু'মিনীন আমীন। তিনি প্রিয় সন্তানদের কপালে ও মুখমণ্ডলে শেষবারের মত চুম্বন এঁকে দিয়ে কণ্ঠে কথা জড়িয়ে খুব করে কাঁদলেন। ছোট্ট খুকুর মতই কাঁদলেন। অবশেষে অত্যন্ত বিষাদমাখা কণ্ঠে এই বলে তাদের বিদায় করলেন—যাও বৎসেরা! তোমাদের আল্লাহ্‌র হাতে সঁপে গেলাম।

খলীফাতুল মু'মিনীন আমীন যখন ঘোড়সওয়ার হয়ে কোথাও বেরোতেন, হাজার হাজার গোলাম চাকচিক্যপূর্ণ পোশাকে সজ্জিত হয়ে তাঁর চারপাশ উজ্জ্বল করে চলত। তাঁদের জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক ও নাঙ্গা তরবারির দ্যুতিতে দূর-দূরান্তর উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। আজ সেই খলীফা আমীন যখন দজলার পথে বেরোলেন তখন একটি মাত্র দাসী দীপ হাতে করে কস্‌রে খুল্‌দ থেকে খলীফাকে পথ দেখিয়ে নেবার জন্যে সাথে এল।

দজলার তীরে পৌঁছে তিনি দেখলেন যে, হারশামা লোকজন দিয়ে তাঁকে এগিয়ে নেবার জন্যে সেখানে উপস্থিত রয়েছে। সবাই নৌকায় বসে অপেক্ষা করছিল। খলীফা আমীন সেখানে পৌঁছামাত্র সবাই উঠে দাঁড়াল তাঁর প্রতি সম্মান দেখাবার জন্যে। হারশামা নিজে অসুস্থ ছিল। তাই খলীফাকে সম্মান দেখানোর রীতি সে রাখতে পারল না বলে হাঁটুর ওপরে ভর করে খলীফার ক্ষমা প্রার্থনা করল।

আমীন যখন নৌকায় উঠলেন, হারশামা তাঁকে নিজের কোলে সযত্নে জানাল। তারপর তাঁর হাতে ও পায়ে চুম্বন দিল। পরিশেষে সম্মানে আবার আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলে চলল—আমার প্রভু! আমার অধিপতি! আমার নেতা!

হারশামার নির্দেশ পেয়ে সংগীরা নৌকা ছেড়ে দিল। সামান্য একটু রওনা হওয়া মাত্র তাহেরের লোকজন চারদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলল। তারপর এরূপ অজস্র পাথর ছুঁড়ে চললো যে, দেখতে না দেখতে নৌকা ডুবিয়ে গেল এবং তার সব তক্তাগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হল।

হারশামার মাঝি-মাল্লারা তাকে বের করে নিয়ে এল। কিন্তু হতভাগ্য আমীনের হাত ধরে তুলবার কেউ ছিল না। তিনি অগত্যা নিজেই বাঁচার জন্যে লিপ্ত হলেন। দেহের দামী জামা-কাপড় সব ছিঁড়ে ফেললেন। তারপর প্রাণপণ সাঁতরিয়ে কোনমতে গিয়ে তীর পেলেন।

আহমদ বিন সালামের বর্ণনা এরূপ ঃ

আমিও খলীফা আমীনের সাথে কিশ্‌তীতে ছিলাম। কিছু লোক এসে আমাকে তাহেরের এক সেনানায়কের কাছে ধরে নিয়ে গেল। যখন সে জানতে পারল যে, আমিও আমীনের সাথে ছিলাম তখন আমার শিরোচ্ছেদের নির্দেশ দিল। আমি তখন দশ হাজার দিরহাম দেবার অঙ্গীকারে নিজের প্রাণ বাঁচাবার ব্যবস্থা করলাম। তা আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমাকে আটকে রাখার নির্দেশ দেয়া হল।

যখন সন্ধ্যা নেমে এল, কয়েকজন অনারব অশ্বারোহী খলীফা আমীনকে বন্দী করে নিয়ে এল। তখন খলীফার পরিধানে একটা পাজামা ছিল, গায়ে একখানা চাদর ও মাথায় একটা পাগড়ী। বাকী গোটা দেহই ছিল খালি। পাগড়ী দিয়ে তিনি মুখ ঢেকে রাখলেন। আমি যে কোঠায় বন্দী ছিলাম, খলীফাকেও সেই কোঠায় আবদ্ধ করে রেখে গেল। প্রহরীদের তারা খুব করে সতর্ক করে গেল তাঁকে কড়া পাহারায় রাখার জন্যে।

লোকজন চলে গেলো। তখন কিছু যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন এবং মুখের চাদর সরিয়ে নিলেন। আমি তক্ষুণি তাঁকে চিনতে পেরে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে ভেঙে পড়লাম। খলীফা আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন।

আমি ভরা গলায় জবাব দিলাম—হুযুরের নিমক-খোর গোলাম, আমার নাম আহমদ বিন সালাম।

খলীফা বললেন—হাঁ, আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। ভাই! গোলাম কি? এখন তো তুমি আমার ভাই—আমার বাহুবল। আমাকে একটু তোমার বুকে লাগাও। আমার বড্ড ভয় লাগছে!

আমি তাঁকে বুকে জড়িয়ে নিতেই দেখলাম তাঁর অন্তঃকরণ ধড়ফড় করছে। তখন তিনি ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলেন—মামুনের কি কোন খবর বলতে পার?

আমি জবাব দিলাম—তিনি বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন।

তিনি তখন বললেন—পত্র লেখকদের ওপরে আল্লাহ্‌র অভিশাপ! কম-বখ্‌তেরা খবর দিয়েছে যে, ভাই আমার বেঁচে নেই।

আমি তদুত্তরে বললাম—আপনার উযীরদের ওপরে আল্লাহ্‌র অভিশাপ নেমে আসুক।

তা শুনে তিনি মোলায়েম কণ্ঠে বললেন—ওদের আর অভিশাপ দিও না। ওদের কি দোষ ভাই?

একটু থেমেই আমার বললেন—আহমদ! আমাকে কি ওরা হত্যা করে ফেলবে, না তাদের ওয়াদা পূর্ণ করবে?

আমি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললাম—না, তারা অবশ্যই তাদের ওয়াদা রক্ষা করবে।

কনকনে ঠাণ্ডা পড়ছিল। খলীফা ভেজা কাপড়ে ছিলেন। তাই শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিলেন তিনি। আমি আমার শুকনো শাল খুলে দিলাম তাঁর শীত নিবারণের জন্যে। তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে তা তুলে নিয়ে এসে বললেন—ভাই! এরূপ দুঃসময়ে এও তো আল্লাহ্‌র বিরাট অনুগ্রহ।

অর্ধরাত পেরিয়েছে তখন। হঠাৎ কয়েকজন অনারব সিপাই খোলা তরবারি নিয়ে এসে উপস্থিত হল দ্বারদেশে। আমীন তা দেখেই দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং অত্যন্ত অস্থিরতার সাথে কাঁপা গলায় 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন' পড়তে লাগলেন। সাথে সাথে বলে চলছিলেন—"হায় আমার প্রাণ এভাবে অহেতুক, অমূল্যে যাচ্ছে। কেউ এ পৃথিবীর বুকে নেই যে, এর জন্য ফরিয়াদী হতে পারে?"

আমীন যদিও আরামপ্রিয় ও সুকোমল দেহের অধিকারী ছিলেন, তবুও তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী বীর। তাই এরূপ নিরস্ত্র ও অসহায় পেয়েও

[illegible] এগোতে হত্যাকারীরা সাহস পাচ্ছিল না। তাদের একজন [illegible] ইশারা করছিল এগোবার জন্যে। কিন্তু কেউই এগোচ্ছিল না।

[illegible] নিরস্ত্র আমীন একখণ্ড কাঠ হাতে তুলে নিয়ে বললেন—[illegible] তোমাদের নবীর পিতৃব্য ভ্রাতা। আমি তোমাদের প্রিয় খলীফা হারুন-[illegible] সন্তান। আমি তোমাদের বর্তমান খলীফা মামুনের ভাই। [illegible] তোমাদের বৈধ হতে পারে না।

[illegible] দুর্ভাগ্য আমীনের। কোন দোহাই তাঁর কাজে আসল না। এক-[illegible] এগিয়ে এসে আমীনের মস্তিষ্ক লক্ষ্য করে প্রচণ্ড বেগে তরবারির [illegible]।

[illegible] সিপাইর এতখানি গোস্তাখী ও সাহস দেখে আমীনের বুঝতে [illegible] না যে, তাঁর করুণ ফরিয়াদ ঘাতকদের মনে বিন্দুমাত্র দয়ার [illegible]। তাই তিনি মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হলেন। আর তা এরূপ [illegible] একজন আব্বাসীয় রাজপুত্রের পক্ষেই শোভনীয় হতে পারে। তাঁর [illegible] এখন যেন ক্রোধোন্মত্ত শার্দুলের রূপ পেল। সুপ্তবীরত্ব যেন [illegible] দীপ্তোজ্জ্বল হয়ে ধরা দিল। তিনি নিরস্ত্র—একা তিনি। তাই [illegible] ওদের হাত থেকে তরবারি কেড়ে এনে হাশিমী গোত্রের [illegible] কিছুটা পরিচয় দেবেন।

[illegible] তাঁর এই সংহার মূর্তি দেখে ঘাবড়ে গিয়ে একযোগে সবাই [illegible] ঝাপিয়ে পড়ল। একজন পেছন দিক থেকে ছুটে এসে হঠাৎ [illegible] তরবারির আঘাত করল। সংগে সংগে হাশিমী বংশের [illegible] আমীন ধরাশায়ী হলেন। অমনি সবাই তাঁর ওপরে ঝাঁপিয়ে [illegible] থেকে তাঁকে পশুর মত যবেহ করে ফেলল। (ইন্না...... [illegible]।)

[illegible] কাছে যখন আমীনের খণ্ডিত শির উপস্থিত করা হল, সে [illegible] একটা উচ্চ স্তম্ভের সাথে লটকে রাখার নির্দেশ দিল। গোটা [illegible] জনতা সেই করুণ ও পাশবিক দৃশ্য দেখার জন্যে দল বেঁধে [illegible]। [illegible] তাদের সামনে এই বলে মনের ঝাল মিটিয়ে নিল—এ হচ্ছে [illegible] খণ্ডিত শির।

[illegible] মামুনের কাছে নিম্নরূপ পত্র লিখে জয়বার্তা পাঠান :

[illegible] মু'মিনীনের খিদমতে দীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রের

নজরানা পাঠালাম।

বলা বাহুল্য, দীনের নজরানা বলতে সে খিলাফতের চাদর ও অংগুরীয় এবং দুনিয়ার নজরানা বলতে আমীনের খণ্ড শির বুঝিয়েছে।

যু'রিয়াসাতাইন নামক জনৈক দূত আমীনের শির একটা কাঠের পাত্রে রেখে মামুনের সামনে এনে রাখল। এই অপ্রত্যাশিত জয়ে মামুন এতই আনন্দোন্মাদ ছিলেন যে, স্বীয় ভ্রাতার রক্তাক্ত খণ্ডিত শির দেখেও তিনি উল্লাস প্রকাশে কুণ্ঠাবোধ করলেন না। এমন কি আনন্দাতিশয্যে তিনি শোকরিয়া আদায়ের জন্যে সিজদায় পড়ে গেলেন। তারপর সেই দূতকে দশলাখ দিরহাম পুরস্কার দিয়ে ভ্রাতৃহত্যায় পৈশাচিক আনন্দ লাভের চরম পরাকাষ্ঠা দেখালেন। কিন্তু মামুনের জীবনে এর চাইতে কলংকময় অধ্যায় একটিও নেই।

এ উপলক্ষে মামুন এক বিরাট দরবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। দরবারের সব সভাসদ ও সেনানায়করা মুবারকবাদ জানাতে এসে দরবারে হাজির হল;[১] তাদের বিশেষ দূত যু'রিয়াসাতাইন খোলা দরবারে বিজয়-বার্তা পাঠ করে শোনালো। অমনি চারদিক থেকে ধন্য ধন্য করে মহা হৈ-হল্লোড় শুরু হয়ে গেল।

অবশ্য আমীনের আবৃত মাথাটি যখন মুক্ত করে দেখানো হল তখন মামুনের প্রাণে সুপ্ত ভ্রাতৃত্ববোধ জেগে উঠল। ধীরে ধীরে সম্বিৎ ফিরল তাঁর। তীব্র অনুশোচনায় মন ভরে গেল। তাহেরের সব কৃতিত্ব তাঁর কাছে মূল্যহীন হয়ে দেখা দিল।

আমীনের আম্মা যোবায়দা খাতুন শাহী প্রাসাদে চুপচাপ বসেছিল। এমন সময়ে এক বিশেষ ভৃত্য গিয়ে তাঁকে জানাল— আম্মা! বসে আর কি ভাবছেন। আমীরুল মু'মিনীন আমীনকে হত্যা করা হয়েছে।

ধীর-স্থির কণ্ঠে যোবায়দা খাতুন জবাব দিলেন—আমার কি করার রয়েছে, বাবা!

১. মামুন-আর-রশীদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন খিলাফত এই দিন থেকেই শুরু হয়। মামুন-আর-রশীদের কাছাকাছি সময়ের ইতিহাসকার ইবনে ওয়াজেহ কাতেব আব্বাসী তাঁর রচিত ইতিহাসে এই দিন থেকেই মামুনের খিলাফতকাল হিসাব করেছেন এবং জ্যোতির্বিদদের মত তাঁর সিংহাসনারোহণের কোষ্ঠী মিলায়ে দেখিয়েছেন। আমি জ্যোতির্বিদ নই। সে বিদ্যায় আজকাল সেরূপ আস্থাও নেই। তাই সে পথে আমি পা বাড়ালাম না।

ভৃত্য তাঁকে পরামর্শ দিলেন—হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) যেরূপ হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদতের প্রতিকার দাবী করে দাঁড়িয়েছিলেন, আপনিও আমীরুল মু'মিনীনের জন্যে তাই করুন।

তার পরামর্শ অনুসারে রাজমাতা যোবায়দা মামুনের কাছে কবিতায় ফরিয়াদ লিখে পাঠালেন।[২]

সেই পংক্তি ক'টি এখানে তুলে দেওয়া হল :

لوارث علم الأولين وفهمهم
وللملك المأمون من أم جعفر
كتبت وعيني تستهل دموعها
إليك ابن عمي من جفوني ومحجري
وقد مسني ذل وضر كآبة
وأرق عيني يا ابن عمي تفكري
أتى طاهر لا طهر الله طاهرا
فما طاهر فيما أتى بمطهر
فأخرجني مكشوفة الوجه حاسرا
وأنهب وأخرب الدوري
يعز على هارون ما قد لقيته
وما مر بي من ناقص الخلق أعور
فإن كان ما أبدى بأمر أمرته
صبرت لأمر من مقدر

* * *

জাফর জননী লিখছে এ লিপি
খলীফা মামুন ঠাঁই
শিক্ষা ও জ্ঞানে সাত পুরুষেও
তুলনা যাহার নাই।

২. ইবনুল আসীর—এ চরণগুলো খোয়ায়মা ইবনুল হাসেম থেকে এবং আকদুল ফরীদ প্রণেতা আবুল আতাহিয়া থেকে পেয়েছেন বলে লিখেছেন।

হে বৎস! আমি লিখছি যবে এ
লিপিকা তোমায় স্মরে
বুক ফেটে মোর বেদনা উথলে
চোখ ফেটে খুন ঝরে।
অশেষ যাতনা, লাঞ্ছনা ভুগে
দিনরাত পেরেশান
দুর্ভাবনায় প্রতি পল কাটে
নিঁদ হল অবসান।
কি যে হল আজ তাহের পাপীর
না হোক সে পাক কভু
ডুবলো যে পাপে হাজার পুণ্য
করে ক্ষমা নেই তবু
বেপর্দা করে নগ্ন শিরে সে
মোরে করে নিল বা'র
মালামাল সব লুটে নিল মোর
ঘরবাড়ি ছারখার।
তার মত ঐক নগণ্য পাপী
ঘটালো যা মোর সনে
খলীফা হারুন বেঁচে রইলে যে
ক্ষমিত না কক্ষণে।
যা কিছু তাহের ঘটাল যদি তা
তোমার হুকুম হয়
ধৈর্য ধরিনু করুন যা ভাল
বিচারক দয়াময়।

মামুন এ চরণ ক'টি পড়ার সাথে সাথে কেঁদে ফেললেন এবং উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন—আল্লাহ্র কসম! আমি নিজ হাতে নিজের ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করব।

আমীন-হত্যার পর্ব শেষ করে তাহের বাগদাদে নিরাপত্তার ফরমান জারি করল। শাহী মসজিদে স্বয়ং জু'মার নামায পড়ালো এবং খুতবা পাঠ করতে গিয়ে মামুনের ভূয়সী প্রশংসার পরে আমীনের অশেষ কুৎসা বয়ান করল।

শনিবার দিন সাধারণভাবে বাগদাদের জনসাধারণ মামুনের প্রতি [illegible]তার শপথ নিল।

[illegible]শে মুহররম আমীন নিহত হন। তখন তাঁর বয়স ছিল আটাশ [illegible]। তিনি চার বছর সাত মাস আঠার দিন খিলাফতের আসন [illegible] করেছিলেন। মধ্যম গড়ন, দেহ-সৌষ্ঠবে অনন্য শক্তিধর ও অনিন্দ্য-[illegible] পুরুষ খলীফা আমীন একাধারে সুসাহিত্যিক ও পণ্ডিত হিসেবেও [illegible] খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

বাল্যকাল থেকেই তিনি কবিতা লেখার দিকে ঝুঁকেছিলেন। যোবায়দা [illegible] রাজকবি আবু নোয়াসকে নিযুক্ত করেছিলেন তার কবিতা দেখাশোনার [illegible]। আমীন একবার যোবায়দা খাতুনের সামনে আবু নোয়াসকে তার [illegible] লিখিত কবিতা পাঠ করে শোনাচ্ছিলেন সংশোধনের জন্যে। কিন্তু আবু [illegible] তা সমালোচনা প্রসংগে যখন অলংকার শাস্ত্র সম্পর্কিত দু'একটা [illegible] উল্লেখ করলেন, তখন আমীন খুব ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে সেই অপ-[illegible] জন্যে কয়েদখানায় আবদ্ধ করলেন। খলীফা হারুন এ খবর পেয়ে [illegible] অসন্তুষ্ট হলেন আমীনের ওপরে এবং তৎক্ষণাৎ আবু নোয়াসকে [illegible] দিলেন। তারপর একদিন হারুন আমীনকে বললেন—তোমার [illegible] ভাবধারার কিছু কবিতা আবু নোয়াসকে শোনাও। আমীন যখন [illegible] দু'তিন পংক্তি কবিতা পাঠ করলেন, অমনি আবু নোয়াস উঠে [illegible]। হারুন জিজ্ঞেস করলেন—দাঁড়ালে কেন? কোথায় যাচ্ছ? আবু [illegible] জবাব দিলেন—আবার কয়েদখানায়।

[illegible]গুণে মানুষ ছিলেন আমীন। একদিকে যেমন তাঁর দোষ ছিল, [illegible] অপরদিকে গুণও ছিল তাঁর অনেক। তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী [illegible]। গুণীর যথাযোগ্য মর্যাদা দান তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য [illegible] স্বয়ং মনীষী ও সুসাহিত্যিক ছিলেন বলে তাঁর দরবারে পণ্ডিত ও [illegible]রা যথাযোগ্য পুরস্কার লাভ করে ধন্য হতেন।

[illegible]সাধারণ তাঁর মৃত্যুতে যতখানি আঘাত পেয়েছে তার বহুগুণ বেশী [illegible] জ্ঞানী ও গুণীগণ। তাঁরা অহরহ দরবারে থেকে তাঁর অসাধারণ [illegible] অতুলনীয় মহানুভবতার পূর্ণ পরিচয় পেয়েছিলেন। বস্তুত, যাঁরা [illegible] চিত্তাকর্ষী গুণাবলী ও ব্যবহারের সাথে পরিচিত হবার কিছুমাত্র [illegible] পেয়েছিলেন, আমীনের নিহত হবার সংবাদ পেয়ে তাঁরা যেন সমগ্র

দুনিয়া অন্ধকার দেখেছিলেন। সেকালের বাগদাদের কবিরা মামুনের আওতাধীনে এসেও আমীনকে নিয়ে যে শোকগাথা রচনা করেছিলেন, তা পাঠ করে বা শ্রবণ করে এমন কোন পাষাণ পৃথিবীতে থাকতে পারে না, যে তার অশ্রু সম্বরণ করতে পারে।

প্রসংগত আবু ঈসার ক'টা লাইন উদ্ধৃত করছি। এতখানি হৃদয় বিদারক সে বর্ণনা আর এতই স্বতঃস্ফূর্ত বেদনার বিকাশ তা' যে কারো অন্তঃকরণে আঘাত হেনে খুন ঝরাবে সন্দেহ নেই।

لست أدري كيف أبكيك وكيف أقول
لم تطب نفسي أسميك قتيلا يا قتيل
سألت الندى والجود ما لي أراكما
تبدلتما عزا بذل مؤبد
وما لي أرى ركن المكارم واهيا
فقالا أصبنا بالأمين محمد
فقلت فهلا متما بعد فقده
وقد كنتما عبديه في كل مشهد
فقالا أقمنا كي نعزى بفقده
مسافة يوم ثم نتلوه في غد

* * *

বুঝিনে কি করে কি বলে আজিকে
বহাইব আঁখি লোর
ওগো মৃত তব মৃত বলিবারে
মন যে মানে না মোর।
ও কারা বিনয়ে চাহি জানিবারে
একি তোমাদের দশা
মান ভুলে নিলে চির অপমানে
কেন হেন দুর্দশা ?

কেন হেরি আজ কেঁপে ধসে যায়
মানীদের ইমারত ?
তারা বলে দিল এর মূলে হল
আমীনের শাহাদত
সখেদে বলিনু তবে বেঁচে কেন
আজিও ধরার পরে ?
বলিল, রহিব কালকেই, বেঁচে
বিশ্বকে জানাবারে।

খিলাফতের মসনদে মামুন

আমীন নিহত হবার পরে ১৯৮ হিঃ (৮১৩ খৃঃ) ২৬শে মুহররম শনি
বাগদাদবাসী সাধারণভাবে মামুনের খিলাফত মেনে নিল। মামুনের স্বাধী
খিলাফত এই দিন থেকেই শুরু হল। অবশ্য মামুন নামমাত্র খলীফা হলে
ফজল বিন সহলই খিলাফতের সর্বময় কর্তা ছিলেন। তাই শাসন-শৃংখ
ব্যাপারে প্রথম দিকে সঠিকভাবে কিছুই হতে পারল না। ফজল চাইল
খিলাফত যাতে তারি মুঠির ভেতরে চলে আসে। ফজল তার অধি
কোরুল জাবাল, ফারেস, আহওয়ায, বসরা, কুফা, ইয়ামন, বাগদাদ প্র
রাজ্যের শাসনভার আপন ভাই হাসান বিন সহলের হাতে সোপর্দ ক
পুরস্কৃত করল এবং তাহেরকে নিয়োজিত করল নসর বিন সাইয়া
বিরুদ্ধে যে আমীনের পক্ষ হয়ে সিরিয়ায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল।

১৯৯ হিজরীতে হাসান বিন সহল বাগদাদে এল এবং তার আওতা
সব প্রদেশে নতুন শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠাল। বাগদাদের দর
আরবীয়রা অনারব প্রাধান্যকে প্রথম দিক থেকেই ভয়ের চোখে দেখে আ
ছিল। হারুন-অর-রশীদের সময় থেকেই তাদের এ ভয় দৃঢ়তর হয়ে
যে, আবার হয়ত খিলাফত অনারবদের প্রভাবাধীনে চলে যাবে। মামু
যুগে সে আশংকা যেন বাস্তবায়িত হয়ে উঠল। কারণ, ফজল ও হাসান
ভাই ছিল পুরোপুরি অনারব। ফলে, বনূ হাশিম ও অন্যান্য আরব গো
দারকরা মামুনের ওপরে দিন দিন অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল। জনসাধার
ভেতরে এ কথাও ছড়িয়ে পড়ল যে, ফজল মামুনের কাছে কোন আ
সন্তানকে এমন কি শাহী খান্দানেরও কাউকে যেতে দেয় না।

মামুন স্বয়ং ছিলেন যবনিকার অন্তরালে। খিলাফতের কাজ-কার
সবকিছুই ফজলের দায়িত্ব ছিল। যেহেতু মাতৃকুল ছিল মামুনের অনা
তাই সবার সন্দেহ জাগল যে, ধীরে ধীরে খিলাফতের ওপরে অনারব প্র
প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। ফল দাঁড়াল এই যে, দিকে দিকে মামুনের বির
বিদ্রোহের আগুন ধুমায়িত হয়ে উঠল।

ইবনে তাবাতেবার আবির্ভাব

যখন এ ভাবের বিশৃংখলা দেখা দিল, স্বভাবতই তখন সাদাত ও
খিলাফতের সুপ্তস্বপ্ন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তাদের ভেতরে
খিলাফতের ঝাণ্ডা উড়ালেন তিনি হচ্ছেন আবূ আবদুল্লাহ্
। ইবনে তাবাতেবা বলেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। যদিও হযরত
(রা.) বংশধর হিসেবে জনসাধারণের ওপরে ধর্মীয় নেতৃত্ব দানের
যোগ্যতা আগে থেকেই ছিল, কিন্তু খিলাফতের জন্যে রাষ্ট্রীয়
সম্পর্কিত যোগ্যতারও প্রয়োজন রয়েছে। আবুস্‌সোরায়া
যোগ দেয়ায় সে অভাবও পূর্ণ হল।

গোড়ার দিকে সে ছিল একজন নিম্ন-শ্রেণীর লোক মাত্র।
খাটিয়ে কোনমতে জীবিকা চালাত। কিন্তু স্বীয় বাহুবলে ধীরে
পশার লাভ করলো। আমীনের ইন্তেকালের পরে কিছুদিন সে
চালালো বেশ জোরেশোরেই। আইনুত্তমার দাকুকা ও আম্বারে
সেসব এলাকার শাসনকর্তাদের হারিয়ে দিয়ে অর্থভাণ্ডার
এল। রোকা' নামক স্থানে পৌঁছে সে ইবনে তাবাতেবার সাক্ষাৎ
ইবনে তাবাতেবা তখন সেখানে নিজেকে খলীফা ঘোষণা করে
। আবুস্‌সুরায়া তাঁর হাতে বাইয়াত হল এবং তাঁকে সে বলল—
পথে কূফার দিকে অগ্রসর হোন। আমি স্থল পথে কূফায়

পৌঁছে সে পয়লা কসরুল আব্বাস ধ্বংস করল। এটা ছিল
মহল। কূফার গভর্নর সেখানে বাস করতেন। মালপত্তর,
খানাগার ও দফতর এখানেই ছিল। তাই সেটা সে লুট করে
সঞ্চিত প্রচুর ধন-সম্পদ হস্তগত করল। গোটা শহর দখল
সে অনায়াসে। আশপাশ থেকে দলে দলে লোক এসে ইবনে
হাতে বাইয়াত হল।

বিন সহল যুহায়ির ইবনুল মুসাইয়েবের অধীনে দশ হাজার

সৈন্য দিয়ে ইবনে তাবাতেবার গতিরোধ করার জন্যে পাঠাল। কু
শাহী নামক স্থানে উভয় দলে মুকাবিলা হল। মুহায়ির পরাজিত হ
আবুস্ সুরায়া তাদের সবকিছু লুটে নিল এবং তাদের পাইকারীভাবে
করল।

ইবনে তাবাতেবা ধর্মভীরু বলে এসব নির্দয়তা ও লুটতরাজ প
করতেন না। তিনি আবুস্ সুরায়াকে এ পথ থেকে বিরত থাকার জন্য নি
দিলেন। সুরায়া দেখল মহাবিপদ। এ দরবেশ বেঁচে থাকতে
স্বাধীনভাবে কাজ করার উপায় নেই। তাই গোপনে বিষ প্রয়োগে তাঁ
শহীদ করে বনূ হাশিমের এক নাবালক শিশুকে নামমাত্র খলীফা করলে
বনূ হাশিমের শিশু বলে জনসাধারণ তাকে ইবনে তাবাতেবার মতই মর্যা
চোখে দেখতে লাগল। তার নাম হল মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ
বিন আলী ইবনুল হুসায়েন বিন আবি তালিব।

হাসান বিন সহল এবারে তাকে দমন করার জন্যে আবদে দাস
পাঠাল চার হাজার অশ্বারোহী দিয়ে। ১৭ই রজব উভয় দলের
ভীষণ যুদ্ধ হল। দুর্ভাগ্যক্রমে শাহী ফৌজ পরাজিত ও পর্যুদস্ত
আবদে দাস স্বয়ং নিহত হল। তার সৈন্যদলের প্রায়ই যুদ্ধক্ষেত্রে শা
হল। অবশিষ্ট যারা বেঁচেছিল তারা বন্দী হল।

এরপরে আবুস্ সুরায়া কুফায় রাজধানী করে সেখানে নিজের
মুদ্রা প্রচলন ও খুতবা পাঠের ব্যবস্থা করল। সেখানে সে বসরা, ওয়া
আহ্ওয়ায, ইয়ামন, ফারেস, মাদায়েন প্রভৃতি এলাকায় সৈন্যদল পাঠা
তারা প্রায় সর্বত্রই সাফল্য লাভ করল। এ সব দলের সেনানায়
ছিল ফাতেমী বা জা'ফরী বংশসম্ভূত। যেহেতু বংশের ঐতিহ্যের
তাদের ব্যক্তিগত বিরত্ব-খ্যাতিও ছিল, তাই সহজেই তারা সবখানে
হতে পেরেছিল।

হাসান বিন সহল এবারে ভয়ানক অসুবিধার সম্মুখীন হয়।
যত খ্যাতিসম্পন্ন সেনানায়ক ছিল, তাদের প্রায় সবাই আবুস্ সুরা
সাথে যুদ্ধ করে পরাজিত ও নিহত হয়। এখন বাকী থাকে শুধু তা
জুল য়্যামিনাইন ও হারশামা ইবনে আ'য়ুন। আবুস্ সুরায়াকে দ
করার জন্যে কেবলমাত্র এ দু'জন সেনানায়কের ওপরে কিছুটা
করা যেত। কিন্তু তারা তাহের নসরের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে
আটকা পড়েছিল। হারশামা স্বয়ং হাসানের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে খোরা

না হয়ে যায়। তাই এখন হাসানের পক্ষে হারশামার সাহায্য
না অসম্ভব হয়ে পড়ে। তা ছাড়া হারশামা হাসানের প্রার্থনা মঞ্জুর
বলেও আশা করা যেত না। তথাপি হাসান সব দ্বিধা-সংকোচ
এই বিপদে হারশামার শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়।

হারশামা হাসানের আবেদনে সাড়া দেয়। সে খোরাসান থেকে
বর্তন করে কুফা রওয়ানা হয়ে যায়। কসর বিন হুবায়রার
কাছি আবুস্ সুরায়ার দলের সাথে হারশামার মুকাবিলা হয়।
যুদ্ধের পরে পরাজিত হয়ে আবুস্ সুরায়া পালিয়ে গেল কুফায়।
সাথে যত সাদাত ও উলুভী ছিল, হারশামার হাতে পরাজয় বরণের
শোধ নেবার জন্যে কুফায় যত আব্বাসীয় ও তাদের সমর্থক ছিল
বাড়ি-ঘর আগুন লাগিয়ে ছারখার করে ফেলল। তাদের ধন-সম্পদ
নিল এবং মনের ঝাল মিটিয়ে অবাধ ধ্বংসলীলা চালালো তাদের
।

হারশামা দীর্ঘদিন ধরে কুফা-অবরোধ করে রাখলো। অবশেষে ২০০
হিজরীর ১৬ই মুহররম আবুস্ সুরায়া কুফা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কুফা
থেকে বেরিয়ে সে সেবাসের নিকটবর্তী খোরেস্তান নামক স্থানে গিয়ে ছাউনি
ফেলল। সেখানকার শাসনকর্তা হাসান বিন আলী মামুনী এ সংবাদ পেয়ে
খোরেস্তান চলে এল। তার ইচ্ছে ছিল ব্যাপারটা বিনা রক্তপাতে চুকে
যাক। তাই সে আবুস্ সুরায়াকে লিখল—আমার এলাকা ছেড়ে তুমি
ভাল মনে কর চলে যাও।

আবুস্ সুরায়া সেই পত্রটাকে মামুনীর দুর্বলতার পরিচায়ক ভেবে খবর
পাঠাল যে, যেই অধিকার আমাকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছে তার খবর
কেবল তরবারিই নিতে পারে।

অগত্যা মামুনী তাকে আক্রমণ করল এবং আবুস্ সুরায়ার পরাজিত
হল। তার প্রায় সব সৈন্য মারা গেল। সে নিজেও আহত হলো। কিন্তু
জালুলা নামক স্থানে ধরা পড়ে নিহত হল। এভাবে সুরায়ার উৎপাত
শেষ হল।

কিন্তু সুরায়া কর্তৃক বিভিন্ন বিজিত শহরে নিযুক্ত শাসনকর্তারা
স্বাধীনভাবেই কাজ করে যাচ্ছিল। তাই তার মৃত্যু তাদের ওপরে আদৌ
কোন প্রভাব বিস্তার করেনি। তারা অধিকাংশই ছিল ফাতেমী ও উলুভী।

তারা বরং সুরায়ার পরিণতি দেখে তাদের দুদিনের শাসনকালের তেত
সব কাম তামাম করার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেল। মাত্র কয়েকদি
শাসন ক্ষমতা নিয়ে তারা স্ব-স্ব এলাকায় এরূপ চরম অত্যাচারের নজী
প্রতিষ্ঠিত করল যা পুরোপুরি বর্ণনা করতে গেলে বিরাট এক ইতিহাস লি
ফেলতে হয়।

হযরত মূসা কাজিমের পুত্র যায়েদ বসরায় কিয়ামত সৃষ্টি করে চল
অসংখ্য পরিবার ধ্বংস করল। আব্বাসীয়দের অজস্র ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিল
হুসায়েন ইবনুল হাসান পবিত্র মক্কার ওয়াক্ফ রাজস্বও লুটে নিল
আরবের স্বল্পকালীন শাসনকর্তা মুহাম্মদ বিন জাফরূন সাদিকের সম
উলুভী ও ফাতেমীদের জোর এতখানি বেড়ে গেল যে তাদের হাতে নাগরিক
দের মান-মর্যাদা সর্বতোভাবে লোপ পেল।

ইব্রাহীম বিন মূসা ছিল ইয়ামনের কর্মকর্তা। রক্তপিপাসু ধ্বংসাত্ম
অভিযানে সে এতখানি খ্যাতি অর্জন করেছিল যে, তাকে সবাই কসাই আখ
দিয়েছিল। মামুনের ইচ্ছা ছিল সন্ধি ও বন্ধুত্বমূলক ব্যবহার দ্বারা তাদে
অনুগত রাখবেন। কিন্তু তা আর কবে কোথায় হয়েছে। তারা লড়াই করা
জন্যে এগিয়ে গেল এবং পরাজিত হয়ে তবে ক্ষান্ত হল। মামুন অবশ্য তাদে
বংশ মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে মুক্তি দিলেন।

আব্বাসীয়দের ওপরে এ অভিযোগ চাপানো হয় যে, তারা সাদাত বং
নির্বংশ করে ফেলেছে। যারা হুজরায় বসে চোখ মুছে সমালোচনার জন
কলম চালিয়ে থাকেন তাদের কথা আলাদা। কিন্তু যারা রাজনৈতি
পরিস্থিতি ও তার প্রয়োজন সামনে রেখে ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে চেষ্
করবেন তারা অবশ্যই অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন। যখনই উলুভী
সাদাত বংশ কোন প্রকারে কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করেছে, তখনই দেশে
কিয়ামত দেখা দিয়েছে। আব্বাসীয়রা তাদের থেকে আদৌ নিশ্চিত হতে
পারছিল না। তাই তাদের সাথে যা করা হয়েছে নেহাৎ রাজনৈতি
প্রয়োজনেই করা হয়েছে।

হারশামার পতন ও বাগদাদ বিদ্রোহ

সাদাত ও উলুভীদের বিদ্রোহ তো দমন হল, কিন্তু সমগ্র দেশে যে ব্যাপক
ন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছিল, তা দিন দিন দিন বেড়েই চলল। আরবীদের
তে এদ্দিন ছিল খিলাফতের চাবিকাঠি। খোরাসান রাজধানী হওয়ায়
দের ক্ষমতা ও প্রাধান্য ছিল না বলে স্বভাবতই তারা এ রাজধানী পরি-
নে খুশি হতে পারে নি। তার ওপরে আবার উযীরে আযম ও গভর্নরের
তম পদ দুটো ফজল ও হাসান দখল করে বসল। তারা ছিল ইরানের
সী গোত্রসম্ভূত। আরবরা এখন সুস্পষ্ট দেখতে পেল যে, ইসলামী
লাফত আরবের বাগডোর ইরানীদের হাতে চলে গেল।

মামুন তখনও ছিলেন নামমাত্র খলীফা। খিলাফতের ভাল-মন্দ সব-
র হর্তা-কর্তা সেজে বসেছিল ফজল বিন সহল। সেই বুদ্ধি জুগিয়ে
মুনকে বাগদাদের পরিবর্তে খোরাসানে রাজধানী স্থানন্তরের জন্যে বাধ্য
রেছিল। কারণ, তার জানা ছিল যে, আরব অধ্যুষিত বাগদাদে কোন
রব গিয়ে প্রভুত্ব করতে পারবে না। ফজলের এসব কারসাজির ফলে
ব্যাপী যে এক তীব্র অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল তা সে ঘুর্ণাক্ষরেও
মুনকে জানতে দেয়নি। মামুনের কর্ণকুহরে কেবল ফজলের গুণগাথাই
ছিত, অন্য কারো নয়।

সেনানায়কদের ভেতরে হারশামা ছিল অন্যতম বিখ্যাত ও শীর্ষস্থানীয়
পতি। সেই উলুভী ও সাদাত বংশের বিদ্রোহ নির্মূল করেছিল। আব্বা-
খিলাফতের জন্য তার আরও অনেক দান রয়েছে যার ফলে সে আশা
ছিল মামুনের কাছে পৌঁছে ফজলের প্রভাব নষ্ট করে দিতে পারবে।
আবুস্‌সুরায়াকে শায়েস্তা করেই সে খোরাসান রওয়ানা হল।

সুচতুর ফজল এ খবর পেয়ে পর পর কয়েকখানা ফরমান পাঠাল হার-
র কাছে খলীফার পক্ষ থেকে। তাতে লেখা হল—এখানে তোমার
প্রয়োজন নেই। শাম ও হেজাজে শৃংখলা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা
য়েছে। সেদিকে যাত্রা কর।

হারশামা আব্বাসীয়দের যথেষ্ঠ সেবা করছিল বলে মনে তার বেশ গর্ববোধ ছিল। তাই মামুনের পক্ষ থেকে এ ফরমান পেয়েও সে খোরাসান চলল। ফজল তখন মামুনকে বুঝালো—দেখলেন তো হুযুর! হারশামা এমন কি খলীফার ফরমান পর্যন্ত তোয়াক্কা করল না। হুযুর স্বয়ং ভেবে দেখুন এর প্রভাব দেশের উপরে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।

হারশামা ২০০ হিজরী জিলক্বদ মাসে মার্ভ পৌঁছল। ফজল হয়ত তার পৌঁছার খবর মামুনকে দেবে না ভেবে হারশামা নাকারা বাজিয়ে তার আগমনবার্তা ঘোষণা করল। মামুম দরবারের সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন —গণ্ডগোল কিসের? সবাই বলল—হারশামা খুব ঠাঁটের সাথে দরবারে আসছে।

পরক্ষণেই হারশামা যখন দরবারে পৌঁছল, মামুন চরম অপমান করে তাকে বের করে দিলেন। সাথে সাথে তাকে কয়েদ করার নির্দেশ দিলেন। কিছুদিন কয়েদখানায় থাকার পরে ফজল গোপনে তাকে হত্যা করল। মামুনকে জানাল তার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে।

হারশামার নিহত হবার সংবাদ বাগদাদে পৌঁছামাত্র গোটা শহরে প্রবল চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার প্লাবন সৃষ্টি হল। হররিয়া মহল্লা আগেই বিদ্রোহী হয়েছিল এবং সেখানকার মামুনের নিয়োজিত কর্মকর্তাদের বিতাড়িত করেছিল। এই নতুন দুঃসংবাদ এসে গোটা শহরে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিল। মুহাম্মদ বিন আবি খালিদ হারশামার স্থলাভিষিক্ত হল এবং সমগ্র বাগদাদের অধিবাসী মিলে তার আনুগত্য মেনে নিল।

বাগদাদে মামুনের নিযুক্ত গভর্নর হাসান তখন ছিল ওয়াসেতে। মুহাম্মদ তাকে বিতাড়িত করার জন্যে ২০১ হিজরীতে বাগদাদ থেকে রওয়ানা হল। পথে পর পর কয়েকটি যুদ্ধে সে হাসানের প্রেরিত সৈন্যদের পরাজিত করে ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলল। বীরুল আকুল পৌঁছে সে হাসানের নিযুক্ত শাসনকর্তা যোবায়ের ইবনুল মুসাইয়েবকে গ্রেফতার করে শৃংখলে আবদ্ধ অবস্থায় বাগদাদ পাঠিয়ে দিল। তাঁর পুত্র একদল সৈন্য নিয়ে নায়েল এলাকা জয় করল। এভাবে পিতা-পুত্র জয়ের পর জয়লাভ করে ওয়াসেতের দিকে ছুটে চলল।

হাসান তাদের বাধা দেবার জন্যে বিরাট একদল শাহী ফৌজ পাঠান। ২০১ হিজরীর ২৩শে রবিউল আউয়াল উভয় দলের মুকাবিলা হল। ীষণ যুদ্ধের পরে মুহাম্মদ পরাজিত হল। তবুও সে বীর-বিক্রমে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত লড়াই চালাল, কিন্তু মারাত্মকভাবে আহত হয়ে ময়দান াগ করে বাগদাদ ফিরে যেতে বাধ্য হল।

হাসান তার পেছনে তাড়া করে চলল। মুহাম্মদ অবশেষে বাগদাদ পৌঁছে মারা গেল। মুহাম্মদের পুত্র ঈসা পিতার স্থলাভিষিক্ত হল। সে াগদাদের জনসাধারণকে জানিয়ে দিল যে, পিতা বেঁচে না থাকলেও আমি ার অসম্পূর্ণ দায়িত্ব পূর্ণ করার জন্যে রয়েছি। বাগদাদকে আমি হাসা-নের দাসত্ব থেকে মুক্ত করবই। বাগদাদের সমগ্র জনতা সানন্দে তাকে ্যতা মেনে নিল। কিন্তু হাসানের বিরাট শাহী ফৌজের হাতে ঈসা ও তার াই আবু যাখিল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল।

অবশ্য, মজুসীজাদার প্রভুত্ব বরদাশত করা হবে না বলে যে প্রবল ধ্বনি কবার উথিত হয়েছিল তা আর কিছুতেই চাপা পড়ল না।

হযরত আলী রেজা

(২০২ হিঃ—৮১৬ খৃঃ)

এদিকে এত কিছু হাংগামা চলছিল, কিন্তু মামুন এরূপ নাক ডেকে ঘুমুচ্ছিলেন যে, তাঁর কানে এর বিন্দু বিসর্গও ঢুকবার অবকাশ পায়নি। যু'রিয়াসাতাইন গোটা দরবারের ওপরে এরূপ প্রতিপত্তি জমিয়েছিল যে, তার বিরুদ্ধে কোন কথাই মামুনের কাছে পৌঁছতে পারত না। এখন সে আরেক নতুন ব্যবস্থা অবলম্বন করল। তার ফলে আব্বাসীয় বংশ ধ্বংসের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল।

মামুন স্বভাবত রসূলের বংশধরদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তার পরিচয় আমরা এতেই পাই যে, তাঁর যুগে যত বিদ্রোহ ঘটেছে, তার নেতৃত্ব রসূল (স.)-এর বংশধররা দেয়া সত্বেও তিনি সর্বদা তাদের সাথে উদার ব্যবহার করেছেন। তাদের তিনি পুরোপুরি কাবুতে পেয়েও শ্রদ্ধা দেখাতে ত্রুটি করেন নি।

সে যুগে রসূল বংশের অষ্টম ইমাম আলী রেজা বর্তমান ছিলেন। মামুন তাঁকে আল্লাহর ওলী বলেই জানতেন ও শ্রদ্ধা করতেন। পরহেজগারী ও সাধনা ছাড়াও মনীষা ও মর্যাদায়ও তিনি ইসলাম জগতের তৎকালীন অদ্বিতীয় ছিলেন। মামুনের ইচ্ছে হল তাঁকে খিলাফতের উত্তরাধিকার মনোনীত করবেন।

তাঁর এ ধারনা সৃষ্টি হয়েছে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই। তিনি একবার ২০০ হিজরীতে আব্বাসীয় বংশের সবাইকে খলীফার মেহমান হিসেবে দাওয়াত দিলেন। সমৃদ্ধ ও সুখী জীবনের প্রভাব দেখুন যে, মাত্র নবম অধঃস্তন পুরুষে এসেই হযরত আব্বাসের বংশধররা সংখ্যায় তেত্রিশ হাজারে গিয়ে পৌঁছল। তারা দুনিয়ার বহু এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

মামুন তাদের অত্যন্ত আদর-যত্ন করে নিজের মেহমানদারীতে খলীফার খাস বাড়ীতে স্থান দিলেন। এক বছর দশদিন চলল এই আতিথেয়তা।

এ সুযোগে নিজ বংশের প্রতিটি মানুষকে তন্ন তন্ন করে যাচাই করলেন। তারপর তিনি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, খিলাফতের দায়িত্ব মাথায় নিতে পারে এমন একটি লোকও বর্তমানে আব্বাসীয় বংশে নেই।

এর পরে ২০১ হিজরীতে তিনি ব্যাপক ভিত্তিতে এক দরবার অনুষ্ঠান করলেন। সব রাজ্যের শাসনকর্তা ও দরবারের সবাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সবাইকে সম্বোধন করে তিনি বললেন—আজ পৃথিবীর বুকে আব্বাসীয় বংশের যারা বেঁচে রয়েছে, তাদের যোগ্যতা আমি পুরোপুরি যাচাই করেছি। তাদের ভেতরে এবং নবী বংশের ভেতরে খিলাফত চালাবার মতো ব্যক্তি এক মাত্র হযরত আলী রেজা ছাড়া আর কাউকে আমি দেখি না।

এ কথা বলেই তিনি দরবারের সবার কাছ থেকেই আলী রেজার ভাবী খিলাফতের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিলেন। শুধু তাই নয়, দরবারের জন্য নির্ধারিত কালো পোশাকের বদলে সেদিন থেকে সবুজ পোশাক ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হল। সবুজ পোশাক ছিল আলী রেজার সাদাত জির্কার বিশেষ পোশাক। সমগ্র ইসলাম জাহানে এ শাহী ফরমান জারি করা হল যে, খলীফা মামুনের পরে হযরত আলী রেজা খিলাফতের আসন অলংকৃত করবেন। তখন তার উপাধি হবে আর রেজা মিন আলে মুহাম্মদ।

হাসান বিন সহলের নামেও এ ফরমান গেল। তাকে বলা হল সর্বসাধারণের থেকে হযরত আলী রেজার আনুগত্যের শপথ নেবার জন্যে এবং সব ফৌজ ও বনু হাশিমদের জন্যে সবুজ পোশাকের ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্যে।

এই অস্বাভাবিক ফরমান বাগদাদে পৌঁছামাত্র সেখানে যেন ছোটখাট এক কিয়ামত সৃষ্টি হল। সমগ্র বাগদাদে মামুনের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিল। কিছু লোক যদিও বাহ্যত খলীফার ফরমান অনুসারে কাজ করল; কিন্তু সবার মুখে একই কথা ছিল যে, আব্বাসীয়দের বাইরে খিলাফত যেতে পারে না কিছুতেই।

ইব্রাহীম বিন আল মাহদী

(২০২ হিঃ—৮১৭ খৃঃ)

হযরত আলী রেজার খিলাফতের উত্তরাধিকার লাভের খবর যখন বাগদাদ পৌঁছল, সেই থেকেই সেখানকার আব্বাসীয়রা মিলে নতুন খলীফা নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু করল। তারপর ২০১ হিঃ ২৫শে যিলহজ্ব শনিবার আব্বাসীয় বংশের নেতৃবৃন্দ এক গোপন অধিবেশনে মামুন আল-রশীদের চাচা ইব্রাহীম বিন আল মাহদীর আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করল। তারা সেখানে দু'জন লোকও মনোনীত করল ঘোষণা দানের জন্য। জু'মার দিন নামায শুরু হবার প্রাক্কালে তাদের একজন দাঁড়িয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে ঘোষণা করবে যে, আমরা মামুনের পরবর্তী খলীফা হিসেবে ইব্রাহীম বিন আল মাহদীকে চাই। অপর ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বারবার এ কথাই বলতে থাকবে যে, মামুনকে পদচ্যুত করা হয়েছে। এখন খলীফা হয়েছেন ইব্রাহীম বিন আল মাহদী এবং খিলাফতের উত্তরাধিকার লাভ করেছেন ইসহাক বিন আল হাদী।

সম্ভবত, এই পদ্ধতিতে আব্বাসীয়রা জনসাধারণের মতামত যাচাই করতে চেয়েছিল। এর ফল তাদের আশানুরূপ হল না। কারণ, যদিও জনসাধারন মামুনের বিরোধী ছিল, তথাপি ইব্রাহীমের প্রতিও তাদের সহানুভূতি ছিল না। তাই দেখা গেল যে, সেই নির্ধারিত লোক দুটো যখন তাদের শেখানো বুলি আওড়িয়ে বসে গেল, জনসাধারণ তার প্রতি আদৌ সমর্থন জানালো না। পরন্তু, এর ফলে জামে মসজিদে এরূপ তুমুল হট্টগোলের সৃষ্টি হল যে, মুসল্লিরা নামায না পড়েই মসজিদ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হল। এতদসত্ত্বেও সনদী ও সালেহ নামক দু'জন প্রভাবশালী নেতার আপ্রাণ প্রচেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত ইব্রাহীম বিন আল মাহদী খলীফা হবার সৌভাগ্য লাভ করলেন এবং ২০২ হিজরী ১লা মুহররম তারিখে বাগদাদের জনসাধারণ সাধারণভাবে তাঁর খিলাফত মেনে নিল।

ইব্রাহীম খেলাফতের আসনে বসতে গিয়ে 'মুবারক' উপাধি ধারণ

[illegible]। তখন কসর বিন হোবায়রায় হাসান বিন সহলের পক্ষ থেকে [illegible]ত ইবনুল হামীদ শাসনকার্য চালাচ্ছিল। কিন্তু তার সাথে যত [illegible]নায়ক ছিল তারা ইব্রাহীমের সাথে যোগ দিল। একদিকে তারা হাসান [illegible] সহলকে জানান যে, হামীদ আপনার বিরুদ্ধে ইব্রাহীমের সাথে যোগা-[illegible] চালাচ্ছে। অপরদিকে ইব্রাহীমকে বুঝালো যে, হযুরের সহায়তা পেলে [illegible] কসর বিন হোবায়রা জয় করে দিতে পারি।

হাসান অবশ্য তাদের সে খবর তেমন বিশ্বাস করেনি। তবুও মূল [illegible] জানার জন্যে হামীদকে ডেকে পাঠান। ইব্রাহীম সেই সুযোগে ঈসা [illegible] মুহাম্মদকে সসৈন্য সেখানে পাঠালেন। ঈসা ১০ই রবিউস্সানী কসর [illegible] হোবায়রা দখল করল এবং হোমায়েদের অর্থভাণ্ডার ও যা কিছু সম্পদ [illegible] লুটে নিল।

হোমায়েদ এ খবর পেয়েই কুফায় ফিরে এল। এখানে হযরত আলী [illegible] ভাই আব্বাস থাকতেন। হোমায়েদ তাকে ডেকে নিয়ে বলল [illegible]পনি আপনার ভাইয়ের পক্ষ থেকে সমগ্র কুফার শাসনভার [illegible] করুন। তা হলে কুফার সবাই আপনার প্রতি সমর্থন জানাবে। [illegible] আপনার জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করতেই প্রস্তুত রয়েছি।

এ কথা বলার সাথে সাথে হামীদ তাঁকে একলাখ দিরহাম নজরও [illegible]। তারপর সে হাসানের নিকট চলে গেল।

এই ব্যবস্থার ফলে কুফার অধিকাংশ লোকই হাসানের পক্ষ সমর্থন [illegible]। কিন্তু যাদের ভেতরে শিয়া মতের প্রভাব খুব বেশি ছিল, তারা [illegible]কে বলল—হযরত আলী রেজাকে এখন থেকেই খলীফা ঘোষণা [illegible] তাঁর আনুগত্যের শপথ নেয়া হোক। তাহলে আমরা জান-প্রাণ [illegible] তোমার সাথে থাকব। কিন্তু মামুন মাঝখানে খিলাফত চালাবে [illegible] হযরত আলী রেজার ভাবী খিলাফতের লোভে আমরা সংগ্রাম [illegible], সে আশা বৃথা।

[illegible]দের এ আব্দার হাসান মেনে নিতে রাজী হল না। তারা তাই [illegible]নের ওপরে চটে গিয়ে ফিরে এসে চুপচাপ ঘরে বসে গেল।

ইব্রাহীম তাঁর নতুন শত্রু আব্বাসকে শায়েস্তা করার জন্যে সাঈদ [illegible] আবুল বতকে নিযুক্ত করলেন। এরাই হামীদের পক্ষ ছেড়ে এসে [illegible]হীমের পক্ষ নিয়ে কসর বিন হোবায়রা দখল করে দিয়েছিল। এ দুই

সেনানায়ক যখন কোরিয়ুশাহী পৌঁছল, আব্বাস তখন তাঁর ভাই আলী বিন মুহাম্মদকে পাঠালেন তাদের বাধা দেবার জন্যে।

উভয় দল ২০২ হিজরীর ২রা জমাদিউল আউয়াল রণাংগনে এল। আলী বিন মুহাম্মদ যুদ্ধে পরাজিত হল।

এবারে সাঈদ ও আবুল বত কূফা আক্রমণ করল। তিনি কূফায় যে সব আব্বাসীয় ছিল তাদের সাথে যোগ দিল। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হল। আব্বাসীয়রা ইব্রাহীমের জয়ধ্বনি দিয়ে রণাংগন তোলপাড় করে তুললো। কিন্তু পয়লা দিন জয় পরাজয় অনিশ্চিত রইল।

এদিকে কূফাবাসী দেখল যে, উভয় দলই যার যার অধিকৃত এলাকায় আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, তাই তাদের নেতারা গিয়ে দ্বিতীয় দিন সাঈদের কাছে এই শর্তে সন্ধি প্রার্থনা করল যে, আব্বাস তার দলবলসহ কূফা ছেড়ে চলে যাবে।

উভয় দলই এ প্রস্তাব মেনে নিল। কূফা জয় করে সাঈদ হীরাত চলে গেল। কূফা ও তার সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোয় ইব্রাহীমের খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু মাত্র এ দু'টা জয়ই খিলাফত সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান এনে দিতে পারল না ঃ কারণ, তখনও ওয়াসেতে হাসান বিন সহল বিরাট এক বাহিনী নিয়ে অবস্থান করছিল।

ইব্রাহীম সেই বিরাট বাহিনী বিপর্যস্ত করার জন্যে ঈশাকে নিযুক্ত করলেন। ইবনে আয়েশা হাশেমী ও নঈম বিন খাযেমকেও ঈসার সহকারী করে দেয়া হল। পথে সাঈদ ও আবুল বতও তাদের সাথী হল। মোট কথা, অসংখ্য সৈন্য মিলিত হয়ে ওয়াসেতের কাছাকাছি সুবাদা নামক স্থানে গিয়ে ছাউনি ফেলল।

হাসান বিন সহল দুর্গে আশ্রয় নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। নির্দেশ জারি করল, দুর্গ থেকে যেন কেউ কোনক্রমেই বের না হয়। ঈসা যুদ্ধের জন্য কয়েকবার ময়দানে নেমেও হাসানের কোন সাড়া পেল না। হাসান যখন ঈসার শক্তির পুরোপুরি পরিমাণ বুঝতে পারল অমনি অকস্মাৎ ঈসাকে আক্রমণ করে বসল। ভীষণ যুদ্ধে আলী পরাজিত হয়ে পলায়ন করল।

যু'রিয়াসাতাইনের পতন

(২০২ হিঃ—৮১৭ খৃঃ)

খিলাফতের তখ্‌তে বসার পর থেকে রক্তপাতহীন দিন একটিও ... তবুও তিনি মোটেও জানতেন না দেশের এই ব্যাপক বিদ্রোহ ও ... কথা। এ বিদ্রোহের সূত্রপাত হল হাসান বিন সহলকে ... পদে নিযুক্ত করাকে কেন্দ্র করেই। এখন বিদ্রোহ দেখা দিল ... হযরত আলী রেজাকে খিলাফতের ভাবী উত্তরাধিকার ঘোষণা ...।

...দের কেউই যখন মামুনের কানে এ ব্যাপারটা তুলে ধরল না, ... বাধ্য হয়ে স্বয়ং আলী রেজাই সে কর্তব্য সমাধা করলেন। তিনি ... সুস্পষ্টভাবে জানালেন—আমীন নিহত হবার পর থেকে আর ... জন্যেও বাগদাদে শান্তি ফিরে আসে নি। সেখানে দিন-রাত ... রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে। বাগদাদবাসী ইব্রাহীমকে খলীফা নির্বাচিত ...।

... যেন আকাশ থেকে পড়লেন। এসব ঘটনা তাঁর স্বপ্নেরও ... ছিল। তাই সহসা বিশ্বাস করতে পারলেন না। পক্ষান্তরে, ...সাতাইন সে ব্যাপারটিকে যেভাবে তাঁর কাছে তুলে ধরেছে, হযরত ... রেজাকে তিনি তাই বুঝাতে গেলেন। বললেন. না, না—ইব্রাহীম ... খলীফা নয়। বাগদাদে শৃংখলা রক্ষার জন্যে তাকে সেখানে আমার ... হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

... আলী রেজা তখন বলে দিলেন—যু'রিয়াসাতাইন দেশের ... অবস্থা সবই আপনার কাছে চাপা দিয়ে অন্যরূপে পেশ করেছে। ... তাই তার শেখানো কথাই বলছেন। যে ইব্রাহীমকে আপনি ... মনে করে বসে আছেন; সে তো এখন আপনার গভর্নর হাসান ... সাথে লড়াই করে চলছে। যেহেতু আব্বাসীয় বংশের প্রায়

সবাই যু'রিয়াসাতাইনের প্রধানমন্ত্রী এবং আমার খিলাফতের উত্তরাধি
লাভের ঘোর বিরোধী, তাই তারা একযোগে ইব্রাহীমের নেতৃত্বে বি
ঘোষণা করছে।

মামুন : দরবারে এমন আর কেউ রয়েছে কি যে, এই খবর রাখে?

হযরত আলী রেজা : হাঁ। ইয়াহিয়া বিন মা'আয, আবদুল আ
বিন ইমরান প্রমুখ সেনাপতিরাও এ খবর রাখেন।

মামুন তাদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন : হযরত আলী রেজা যা
বললেন, সে সম্পর্কে তোমরা কি জান?

যু'রিয়াসাতাইনের ভয়ে তাদের কেউ কোন কথা ব্যক্ত করতে সা
হল না। তা বুঝাতে পেরে মামুন স্বয়ং তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব
নির্ভয়ে তাদের সব খুলে বলতে নির্দেশ দিলেন। এমনকি তিনি লি
প্রতিশ্রুতি দিলেন তাদের জিম্মাদারী গ্রহণ করবেন বলে। তাতে
ছিল যে, যু'রিয়াসাতাইনের ব্যাপারে তাদের কোনরূপ আশংকার কা
নেই। যদি কখনো কিছু হয় সে জন্যে খলীফা স্বয়ং দায়ী থাকবেন।

এত কিছু নির্ভরতা লাভ করে তারপর তারা দেশের বর্তমান
সংকটপূর্ণ অবস্থা সবিস্তারে বর্ণনা করল। তারা আরও জানাল
হারশামাও এসব কথা হুযুরের গোচরীভূত করার জন্যে রাজধানীতে এ
ছিল। কিন্তু যু'রিয়াসাতাইন সেরূপ একজন আত্মোৎসর্গী বীর সে
পতিকে হুযুরের দৃষ্টিতে শত্রুরূপে তুলে ধরে সে হতভাগার সব আ
ধূলিসাৎ করে দিল। মামুনকে শেষ পর্যন্ত তারা এও জানালো যে,
যথাসত্বর যু'রিয়াসাতাইন সম্পর্কে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা
হয়, তা হলে খিলাফতের ভিত্তি ধ্বসে পড়ার আর তেমন বিলম্ব নে
পরিশেষে তারা মামুনকে এ পরামর্শ দিল—হুযুর স্বয়ং যদি বাগদা
তশরীফ রাখেন তা হলেই সমস্যা অনেকটা চুকে যাবে।

মামুন তাই বাগদাদ যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। যু'রিয়াসাতা
খলীফার এক আকস্মিক সিদ্ধান্তের খবর পেয়ে বুঝতে পারল মামু
কাছে এতদিনে কেউ অবশ্যই সব গোমর ফাঁক করে দিয়েছে। কো
কোন্ ব্যক্তি এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রয়েছে, গোপনে তাদের নাম জে
নিয়ে সে বিভিন্নরূপ শাস্তির ব্যবস্থা করল। কাউকে কয়েদখানায় পাঠা
কাউকে কোড়া মেরে শায়েস্তা করল, আবার কারো দাড়ি ছিঁড়ে ফেল

হযরত আলী রেজাকে কিছু করতে পারল না। কারণ, তিনি
তার ধরা-ছোঁয়ার উর্ধ্বে।

আলী রেজা যু'রিয়াসাতাইনের এসব কার্যকলাপের খবর পেয়ে
কাছে তার প্রতিকার চাইলেন। মামুন নম্রভাবে জবাব দিলেন—
উদাসীন নই সেসব থেকে। কৌশলে কাজ উদ্ধার করাটাই ভাল

মামুন যখন সারখাস পৌঁছলেন তখন গালেব মাসউদীর নেতৃত্বে
আততায়ী হাম্মামখানায় হঠাৎ হামলা করে যু'রিয়াসাতাইনের
শেষ করল। সেদিন ছিল ২০২ হিজরীর ২রা শাবান, বৃহস্পতিবার।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, যু'রিয়াসাতাইনের আততায়ীরা সবাই
দূর দূর এলাকার লোক। কেউ রোমের, কেউ দায়লামের এবং কেউ
অধিবাসী। তাদের এভাবে একত্রিত হওয়া অস্বাভাবিক
ঘটে।

মামুন তক্ষুণি সর্বত্র ঢোল-শোহরত করে জানিয়ে দিলেন—যে হত্যা-
ধরে দেবে তিনি তাদের দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা (আশরাফী)
দিবেন।

আব্বাস বিন আল হায়সাম এ পুরস্কার অর্জন করল। আততায়ীদের
নিয়ে সে মামুনের দরবারে হাজির করল।

মামুন জিজ্ঞেস করলেন—কার ইংগিতে তোমরা এ কাজ করেছ?
সমস্বরে জবাব দিল—খলীফা মামুনের।

নির্ভীক ও খোলা জবাবে ক্রুদ্ধ হয়ে অথবা তাদের অপরাধের যথা-
শাস্তি হিসেবে মামুন তক্ষুনি তাদের হত্যার নির্দেশ দিলেন।

এরপরে সেনাপতি মূসা বিন ইমরান, মূসা প্রমুখ যাদের এ হত্যার
সংশ্লিষ্ট বলে সন্দেহ হয়েছে, তাদের সবাইকে ডেকে জিজ্ঞেস
—এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তোমরা কে কি জান, বল।

তারা সবাই কানে হাত রেখে বলল—তওবা! এ ব্যাপারে আমরা
জানি না।

মামুন তবুও সন্দেহের বশীভূত হয়ে তাদের হত্যা করালেন। যদিও
পরম্পরা সাক্ষ্য দেয় যে, যু'রিয়াসাতাইনের হত্যাকাণ্ডের পেছনে

মামুনের অদৃশ্য হাত রয়েছে, তথাপী পরবর্তী কাজগুলো তার সম্প
সেরূপ নিশ্চিত ধারণাকেও মুনিয়ে ফেলেছে। তিনি হত্যাকারীদের ছিন্ন
শির হাসান বিন সহলের কাছে দিলেন এবং তার সাথে একখানা শোক
পাঠালেন। তাতে তিনি যু'রিয়াসাতাইনের অকাল মৃত্যুতে অনেক দুঃখ
সমবেদনা জাহির করেছেন। তাতে তিনি ভাইয়ের স্থলে উযীরে আযমে
পদ গ্রহণের জন্যে সহল বিন হাসানকে অনুরোধ জানালেন।

এভাবে যু'রিয়াসাতাইনের মাতার কাছেও তিনি গভীর দুঃখ ও স
বেদনা জানিয়ে পত্র লিখলেন। তাকে তিনি এই বলে সান্ত্বনা দিলে
—আপনি ধৈর্য্য ধরুন। যু'রিয়াসাতাইনের স্থলে আপনার এ অনুগত পু
খিদমতের জন্যে রয়েছে।

এই ভাবাবেগপূর্ণ বাক্যটি তাকে আরও অধীর করে তুলল এবং
কেঁদে কেঁদে বলল—এরূপ সন্তানের জন্যেও কাঁদব না যে তোমার মত
লোককেও আমার সন্তানে পরিণত করে গেল?

যু'রিয়াসাতাইনের নিহত হবার কয়েকদিন পরেই তার পিতা সহল মা
গেল। সেই সময়ই মামুন হাসান বিন সহলের মেয়েকে বিয়ে করলেন
যদিও এতকিছু করার পরেও যু'রিয়াসাতাইনের হত্যার দায়ে থেকে মামু
পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত হতে পারলেন না, তবুও জনসাধারণের দৃষ্টিতে
ব্যাপারটা অনেকখানিই ঘোলাটে হল। অন্তত এ ধারণা সৃষ্টি হতে আ
বাধা রইল না যে, সেরূপ কিছু ঘটে থাকলেও নিতান্ত দায়ে পড়ে মামুন ত
করে থাকবেন। মূলত তিনি যু'রিয়াসাতাইনের দান জীবনে ভুলতে
পারেন নি। তাই তার বংশের সবার সাথে তিনি পূর্বানুরূপ হৃদ্যতা রেখে
চললেন।

যু'রিয়াসাতাইনের মৃত্যুতে তার পরিবারবর্গ নিদারুণ আঘাত পেল
তার ভাই হাসান এ দুর্ঘটনার পর একদিনও কান্নাকাটি থেকে নিজকে
রেহাই দিতে পারে নি। এমনকি এই ভ্রাতৃশোকে সে শেষপর্যন্ত পাগল হয়ে
গেল। ২০৩ হিজরীতে তার উন্মাদনা এমন স্তরে পৌঁছল যে, তার হাত পা
শিকলে বেঁধে রাখতে হল।

মামুন এর পরে আহমদ বিন আবি খালিদকে উযীরে আযম নিযুক্ত
করেন। স্মরণ রাখা উচিত যে, মামুনের স্বাধীন খিলাফত ফজল বিন
সহলের নিহত হবার পর থেকে শুরু হয়।

হযরত আলী রেজার মৃত্যু

(২০৩ হিঃ—৮১৮ খৃঃ)

বাগদাদের পথে মামুনের এ সফরে হযরত আলী রেজাও সংগে ছিলেন।
শহরে পৌঁছেই অকস্মাৎ আলী রেজা ইন্তেকাল করলেন। বলা
যে, আঙ্গুরের ভেতরে বিষ মিশিয়ে তার সাহায্যে তাঁকে মারা হয়েছে।
খলীফা হারুন-অর-রশীদের কবর ছিল এখানেই। মামুন সেই কারণেই
অবস্থান করছিলেন। হযরত আলী রেজা ইন্তেকাল করায় মামুন
দিলেন যে, হারুন-অর-রশীদের কবর খুঁড়ে এতেই হযরত আলী
কে গোর দেয়া হোক। এ নির্দেশের উদ্দেশ্য হল এই যে, হযরত আলী
পবিত্র আত্মার বরকতে হারুন-অর-রশীদের আত্মাও ধন্য হবে।

হযরত আলী রেজার ইন্তেকালে মামুন খুবই মর্মাহত হলেন। তিনি
জানাযায় নগ্নশিরে যোগদান করলেন এবং কেঁদে বললেন—ওগো
হাসান! তোমাকে হারিয়ে আমি এখন কার কাছে আশ্রয় নেব?
তিনি তিনদিন পর্যন্ত কবরস্থানে অবস্থান করে দিনভর শুধু এক-
রুটি তাও নিমক মিশিয়ে খেয়ে কাটালেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র
রসূল পরিবারের পরম ভক্ত ও আব্বাসীয়দের পরম শত্রু কল্লাবিল
এক কবি মর্মস্পর্শী একটা কবিতা লিখেন। উদাহরণস্বরূপ তার
লাইন তুলে দিচ্ছি:

ما ينفع الرجس من قرب الزكى ولا
ولا على الزكى تقرب الرجس من ضرر

মায়ানফা'উর রিজসা মিন কুরবিয্ যাকিবিওয়ালা ওয়ালা
'আলায্ যাকিয়্যি তাকাররুবুর রিজসা মিন যররি

ইবনে ওয়াযেহ আব্বাসী এ ঘটনা হযরত আলী রেজার দাফন-কাফনে
অংশগ্রহণকারী একজন থেকে শুনেছেন। আমি আব্বাসীর রচিত ইতিহাস থেকে
উদ্ধৃত করলাম।

পুণ্যের পরশে পাপ ধন্য নাহি হয়
না-পাক নৈকট্যে পাকে নাহি ক্ষতি ভয়।

ইতিহাসে এ একটা জটিল প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, হযরত রেজাকে কার ইংগিতে বিষ পান করানো হল। কিন্তু একটা বিশে এ প্রশ্নটার সাথে ধর্মীয় রং জুড়ে দিয়েছে।

শিয়া সম্প্রদায়ের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল এই যে, স্বয়ং মামুনই হ আলী রেজাকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করার জন্যে ইংগিত দিয়েছেন। দু বিষয়, শিয়াদের রচিত কোন ইতিহাস আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। এ ব্যাপারে উভয় দিক বিবেচনা করে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলাম না। পৃথিবীতে বর্তমানে যেসব বড় বড় নির্ভরযোগ্য ইসলা ইতিহাস পাওয়া যায়, তা সবই সুন্নীদের রচিত। তাই তাতে দৃষ্টিকোণ থেকে এ প্রশ্নটিকে বিচার করা হয়নি, তা না বললেও চলে।

এরূপ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নিছক ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেই আ এ ব্যাপারে যাচাই করতে হচ্ছে। এ পর্যন্ত আমি যেসব ইতিহাস অ করেছি, কোন ঐতিহাসিকই এ ব্যাপারে মামুনকে দায়ী করতে সাহসী হ বলে আমার চোখে পড়েনি। বরং আল্লামা ইবনে আসীর তো সেরূপ ধারণার প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। মামুন-আল-রশীদের প্রায় সাময়িক কালের ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে, তার ভেতরে ইবনে ওয়া আব্বাসীর ইতিহাস উল্লেখযোগ্য। তিনি মামুনের ইতিহাস লিখতে তাঁদেরই সাহায্য নিয়েছেন যাঁরা মামুনের সময়কার লোক ছিলেন। ইতিহাসেও আমি কিছুটা শিয়া প্রভাব লক্ষ্য করি। তবুও দেখা যায় তিনি হযরত আলী রেজার হত্যার মূলে স্বয়ং মামুনের নির্দেশ না তদ্স্থলে আলী বিন হিশামের প্রতি সন্দেহ পোষণ করছেন।

ইতিহাসের বিচারেও আমরা এটাই বুঝতে পাই যে' হযরত রেজাকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করার পেছনে মামুনের কোন অভিসন্ধি ছিল না। কারণ, তিনি কোন রাজনৈতিক নেতৃত্বে ষ্ঠিত ছিলেন না। এবং তার থেকে আব্বাসীয় খিলাফতের কোন ক্ষতি বৃদ্ধিরও আশংকা ছিল না, অবশ্য শিয়ারা তাই দাবী করছে। নবী বংশের প্রতি যে মামুনের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল, তা তো ঐতিহাসিক স পরিণত হয়েছে। হযরত আলী রেজার পরেও নবী বংশের সাথে মামু

ম্পর্ক কিরূপ ছিল? হযরত আলী রেজার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ঘটনা-লীর কার্যকারণ নির্ণয় করে সামগ্রিকভাবে ব্যাপারটি তলিয়ে দেখলে নে হয় যে' মামুনের ওপরে শিয়াদের এটা মিথ্যা অপবাদ বই নয়।

সন্দেহ নেই আব্বাসীয়রা হয়ত হযরত আলী রেজার ওপরে অসন্তুষ্ট লেন। তাই তাদের অন্য কেউ এ অন্যায় কার্যটি করে থাকতে পারে।

হযরত আলী রেজা শিয়াদের বারো ইমামের অন্যতম এবং হযরত মুসা জেমের পরবর্তী ইমাম। ১৪৮ হিজরীর (৭৬৫ খৃঃ) শুক্রবার তিনি ীনা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মস্ত বড় আলেম ও বিত্তশালী ক্তি ছিলেন। হযরত আলী রেজা খলীফা মামুনের জন্যে একখানা লী গ্রন্থ রচনা করেন।

আরবের বিখ্যাত কবি আবু নোয়াসকে সবাই ধরল হযরত আলী জার রচনার উপরে কবিতা লেখার জন্যে এবং তাঁকে নিয়েও দু'লাইন বিতা রচনার জন্যে। আবু নোয়াস জবাব দিল—তাঁর অসীম জ্ঞান ও গ্যতা আমার প্রসংসার অনেক উর্ধ্বে রয়েছে।

মু'রিয়াসাতাইন ও হযরত আলী রেজার পর্ব শেষে মামুন বাগদাদ-সীর সব অভিযোগের যবনিকাপাত ঘটল ভেবে তাদের কাছে লিখলেন—ন আর তোমাদের বলবার কি থাকতে পারে?

কিন্তু দুর্ভাগ্য মামুনের। যে বিরাট আশা নিয়ে তিনি এতখানি ছিলেন, বাগদাদবাসী তাঁর সে আশার গুড়ে বালি ঢেলে দিল। তারা র চিঠির কড়া জবাব দিল।

ইব্রাহীমের পদচ্যুতি

(২০৩ হিঃ—৮১৮ খৃঃ)

মামুন যে সময়ে বাগদাদ রওয়ানা হলেন ইব্রাহীম তখন ছিলেন মাদায়েনে। মূসা বিন মুহাম্মদ ও মতলব বিন আবদুল্লাহ্ প্রমুখ সেনাপতিরাও তাঁর সাথে ছিল। যদিও তারা ইব্রাহীমের পক্ষে দৃঢ়তার সাথেই ছিল, তবুও তাদের এ বিশ্বাস ছিল যে, ইব্রাহীমের খিলাফত মামুন যদ্দিন বাগদাদ থেকে দূরে থাকবেন তদ্দিন চলবে। বস্তুত, দেখা গেল যে, মামুন বাগদাদ পেঁৗছার সাথে সাথে মুত্তালিব নামক ইব্রাহীমের এক সঙ্গী নিয়ে তার সাথে যোগদান করল। অসুখের ভান করেই মাদায়েন ছেড়ে সে বাগদাদ চলে এসে গোপনে মামুনের আনুগত্য মেনে নিল। স্বয়ং ইব্রাহীমের ভাই মনসুর বিন আল মাহ্দী পয়লা এসে মামুনের বাইয়াত গ্রহণ করল। মুত্তালিব আলী বিন হিশাম ও হামীদকেও বাগদাদে এসে মামুনের আনুগত্যের শপথ গ্রহণের জন্য লিখল।

ইব্রাহীম যখন এসব জানতে পারলেন, তক্ষুণি মাদায়েন ছেড়ে এসে যিন্দারাদ পৌঁছলেন (১৫ই সফর, ২০২)। এখানে এসে যারা গোপনে মামুনের আনুগত্য মেনে নিয়েছিল তাদের ডেকে পাঠালেন। তাতে তাঁর পরিবারের মনসুর ও খোযায়মা এসে হাজির হল এবং তাদের অপরাধও ক্ষমা হল। কিন্তু মুত্তালিবকে তাঁর বংশের লোকেরা এই বলে ফিরিয়ে রাখল যে, কথা ঠিক রাখা উচিত। ইব্রাহীম সাধারণ অনুমতি দান করল ১৭ই সফর মুত্তালিবের ঘরবাড়ী লুটে নেবার জন্যে। ওদিকে আবার আলী বিন হিশাম ও হামীদ ইব্রাহীমের রাজধানী মাদায়েন দখল করে বসল। ইব্রাহীমের বিখ্যাত সেনাপতি ঈসা বিন মুহাম্মদ গিয়ে যোগদান করল হাসান বিন সহলের সাথে। ২০১ হিজরী শওয়াল মাসে ঈসা মুহাম্মদ বাবুল জবরে ঘোষণা করল—আমি বিবদমান দল দুটোর কোন দলেই নেই। হামীদও তার সুরে সুর মিলালো।

ইব্রাহীম ঈসাকে দেখা করার জন্যে কয়েকবার দূত মারফত সংবাদ

ন। অগত্যা সে এল। ইব্রাহীম তার ওপরে খুবই অসন্তোষ প্রকাশ এবং স্বপক্ষে আনয়নের জন্যে চাপ দিলেন। ঈসা তাতে অক্ষমতা করায় ইব্রাহীম চটে গিয়ে তাকে কয়েদ করলেন। তার সাথে তার জন সহ-সেনানায়ককেও শাস্তি দিলেন।

ঈসা ছিল বেশ প্রতিপত্তিশালী ও নামযাদা সেনাপতি। তার সাথে বিখ্যাত সেনানায়ক ছিল। তারা সবাই ইব্রাহীমের বিরুদ্ধে চলে। বিশেষ করে ঈসার খাস ভক্ত আব্বাস আবেগপূর্ণ বক্তৃতা দিয়ে বাগদাদের লোককে ইব্রাহীমের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলল। জুসর, ইত্যাদি স্থানে ইব্রাহীমের যেসব কর্মকর্তা ছিল তাদের তাড়িয়ে দেয়া। তারা সবাই মিলে হামীদকে চিঠি লিখল বাগদাদ দখল করে নেবার

[illegible]।

হামীদ বাগদাদবাসীর এ আহবান পেয়ে নহরে সরসায় পৌঁছে আস্তানা। আব্বাস ও অন্যান্য কতিপয় সেনানায়ক বাগদাদে থেকে গেল অভ্যর্থনা জানাতে। সেখানে এসে ঠিক হল যে, শুক্রবার দিন রিয়ায় খলীফা মামুনের নামে খুতবা পাঠ করা হবে এবং ইব্রাহীমকে বলে ঘোষণা করা হবে।

হামীদ এ কাজ সুসম্পন্ন করার বিনিময়ে প্রত্যেক সৈন্যকে পঞ্চাশ করে পুরস্কার দেবারও অঙ্গীকার দান করল। নির্দিষ্ট তারিখে সে সসৈন্যে ইয়াসরিয়ায় প্রবেশ করল। কিন্তু সেখানে গিয়ে টাকা নিয়ে সৈন্যদের সাথে তার মতান্তর দেখা দিল। কারণ, সৈন্য পঞ্চাশ সংখ্যাটিকে অশুভ মনে করত। অথচ আলী বিন তার দলকে পঞ্চাশ টাকা করে দেবার ওয়াদা দিয়েছিল। সৈন্যরা তাদের কাছে এ দাবী জানাল যে, আপাতত আমাদের চল্লিশ টাকা দেয়া হোক এবং পরে দশ করে দেয়া হোক. তাহলে পঞ্চাশের ঢুকে যায়। হামীদ উদারতা দেখিয়ে তাদের ষাট টাকা করে দেয়ার করে অশুভ সমস্যার অবসান ঘটাল।

বিপক্ষ শিবিরে যখন সৈন্য ও সেনানায়কদের ভেতরে একটা শুভাশুভের চলছিল, ইব্রাহীম তখন সুযোগ বুঝে ঈসাকে জেলখানা থেকে দিয়ে হামীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যে পাঠালেন। ঈসাও হামীদের লড়াইয়ের ভান করল। আক্রমণের অভিনয় চালালো। নিজে হামীদের সৈন্যদলের ভেতরে ঢুকে পড়ে দেখাল যে, ইব্রাহীমের সাথে

বিশ্বস্ততা রক্ষার জন্যে সে প্রাণের মায়া পর্যন্ত ছেড়ে দিতে পারে। হামী
সৈন্যরাও তার মনের ভাব অনুসারে তাকে জীবিত বন্দী করে নি
অগত্যা স্বয়ং ইব্রাহীম অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে হামীদকে বাধা দিতে লাগলে
এটাই ছিল তার শেষ চেষ্টা। কিন্তু তিনিও সফলকাম হলেন না। ২
হিজরীর জিলক্বদ মাসের শেষভাগ উভয় দলের ভেতরে যে যুদ্ধ হল, তা
ইব্রাহীমের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল।

সতেরই জিলহজ্জ বুধবার তাঁর খিলাফতের শেষ দিন ছিল। সে দি
সূর্যাস্তের সাথে সাথে তিনি খিলাফতের পোশাক বদল করে ছদ্মবে
রাতের আঁধারে আত্মগোপন করলেন। আর তার সন্ধান মেলেনি। তা
খিলাফত কাল ছিল এক বছর এগার মাস বার দিন মাত্র।

বাগদাদে মামুন

(২০৪ হিঃ—৮১৯ খৃঃ)

২০২ হিজরীর সম্ভবত রজব মাসে মামুন মার্ভ থেকে বাগদাদ যাত্রা
রেন এবং ২০৪ হিজরীর সফর মাসে তিনি সেখানে পৌঁছেন। তাঁর এই
ফর রাজ্য পরিদর্শনের মতই ছিল। কারণ, এর ভেতর দিয়ে তিনি
দেশের অনেক কিছুই জানতে ও বুঝতে পেরেছিলেন। সে অনুসারে তিনি
বভিন্ন শহরে নতুন নতুন ব্যবস্থারও প্রবর্তন করেছিলেন।

তিনি যখন নহরোয়ান পৌঁছলেন তখনই বাগদাদের সব সেনানায়ক
ও গণ্যমান্য নেতারা বিপুল উদ্দীপনা নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে
গল। তাহের বিন আল হুসায়েনও মামুনের আমন্ত্রণ পেয়ে রোকা থেকে
খানে এসে তাঁর সাথে মিলিত হলেন।

নহরোয়ানে আটদিন অবস্থান করে মামুন বাগদাদ চললেন। ২০৪
হজরীর ৬ই সফর তিনি বিপুল জাঁকজমকের সাথে রাজধানী বাগদাদে
বেশ করলেন। হাজার হাজার নাগরিক এখানে দীর্ঘদিন ধরে তাঁরই
তীক্ষায় দিন গুণছিল।

মামুন ও তার সেনাবাহিনীর সবাই সবুজ পোশাকে সজ্জিত ছিলেন।
াগদাদবাসীও তা দেখে সবুজ পোশাক নিয়ে তাঁর দরবারে হাজির
ল। কিন্তু তা ছিল তাদের ইচ্ছার বিরোধী ব্যাপার। তাদের ইচ্ছা ছিল
াব্বাসীয় খলীফাকে তারা তাদের নিজস্ব পোশাকেই সজ্জিত দেখবে।

তাই মামুন যখন তাহেরকে ডেকে তার অশেষ কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার
ানের ইচ্ছা প্রকাশ করে বললেন—তোমার কি প্রার্থনা করার রয়েছে,
ল। তখন তাহের জবাব দিল—আমার কৃতকর্মের পুরস্কার-স্বরূপ
তটুকুই প্রার্থনা করছি যে, আব্বাসীয়দের প্রাণের একমাত্র আকাংখাটি
ূরণ করুন।

মামুন তাহেরের এই ত্যাগপূর্ণ যৌক্তিক আব্দার না মেনে পারলেন

না। তিনি তৎক্ষণাৎ দরবারে বসেই আব্বাসীয়দের বিশেষ ধরনের কালো পোশাক পরিধান করলেন এবং সাথে সাথে তাহের জু ল্‌য়ামী-নায়েন ও অন্যান্য সেনানায়কদের সেই রঙের মূল্যবান পোশাক উপঢৌকন দিলেন। ২০৪ হিজরীর ২৩শে সফর সমগ্র বাগদাদের নাগরিকরা কালো পোশাক ধারণ করল। সে দিনের সেই কাজ যেন গোটা মুসলিম জগতে সাধারণভাবে এ ঘোষণা প্রচার করে দিল যে, গোটা ইসলামী খিলাফত এখন সর্বতোভাবে আব্বাসীয়দের কুক্ষিগত হল।

ভাইসরয় তাহের

(২০৭ হিঃ—৮২০ খৃঃ)

সেই বছরই এক বিশেষ আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাহেরকে ভাবিত সাফল্যের যোগ্য পুরস্কার দান করা হল। মানে; তাকে খেলা-তের সমগ্র পূর্বাঞ্চলের (বাগদাদ থেকে সিন্ধু পর্যন্ত) ভাইসরয় করে লা হল।

তার এ বিরাট পুরস্কার লাভের ইতিহাস হল এই: তাহের এক তে মামুনের প্রমোদ মজলিসে হাজির হল। মামুন তখন শরাবের নেশায় হয়ে স্বর্গসুখ অনুভব করছিলেন। তাই উদার প্রাণে তিনি তাহেরকেও াবপূর্ণ দুটি পেয়ালা এগিয়ে দিলেন এবং তাঁরই সামনে আসন নেবার ন্য ইশারা করলেন।

তাহের আদব রক্ষা করে বলল—"এতখানি মর্যাদার যোগ্য আমি নই" মুন বললেন—সেসব সৌজন্য ও রীতিনীতি দরবারের জন্যে। এসব দের মজলিসে তার প্রয়োজন নেই।

তাহের তথাপি কিছুটা সংকোচের সাথে তার সামনে আসন নিল। মুন যখন তার দিকে তাকালো, তখন দেখা গেল তাঁর দু'চোখ অশ্রু-র্ণ। তা দেখে তাহের আরম্ভ করল—এমন আর কি আকাঙ্ক্ষা বাকী াছে যা ভেবে হুযুর মনোকষ্টে ভুগছেন?

মামুন জবাব দিলেন—তা এরূপ একটা কথা যা চাপা রাখলে অন্তর্দাহ ষ্টি করে এবং প্রকাশ করলে মর্যাদা নষ্ট করে।

এ কথা শুনে তাহের চুপ হয়ে গেল। কিন্তু তার মনে এ নিয়ে এক কার স্বস্তি হল। ভাবল, এমন কি কথা হতে পারে? যে করেই হোক কথা উদ্ধার করতে হবে। তাই সে মামুনের শরাব সরবরাহকারী ভৃত্য াকী) হুসায়েনকে দু'লাখ দিরহাম নজর দিল এবং মামুনের প্রাণের ই গোপন কথা উদ্ধার করে দেবার জন্যে অনুরোধ জানাল।

হুসায়েন সুযোগ বুঝে এক সময়ে মামুনের কাছে তাঁর সেই মনো-বেদনা জানতে চাইল। মামুন তাকে বলল—যদি এ কথা কখনো বেফাঁস হয়ে যায় তা হলে তোর মাথা উড়িয়ে দেব। সত্যি কথা বলতে কি, তাহের যখনই আমার সামনে আসে তখনই ভাই আমীনের অসহায় ও অবমাননাকরভাবে মৃত্যুর কথা মনে পড়ে। তাহের তাই একদিন অবশ্যই আমার হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তাহের এ খবর পেয়েই তখনকার উযীরে আযম আহমদ বিন আবি খালিদ আল আহওয়ালির কাছে ধর্ণা দিয়ে গিয়ে বলল—তুমি তো জানো আমি অকৃতজ্ঞ নই। আমার কল্যাণ করলে উপকার ছাড়া ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। আমি শুধু তোমার কাছে এতটুকু প্রার্থনা করি যে, আমাকে মামুনের দৃষ্টিপথ থেকে দূরে রাখ।

আহমদ বিন আবি খালিদ সে কাজটি করল। দ্বিতীয় দিন সকালে সে বড়ই বিষন্ন ও চিন্তাক্লিষ্ট ভাব নিয়ে মামুনের কাছে গিয়ে হাজির হল।

মামুন ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কি ব্যাপার ? নতুন কোন দুঃসংবাদ নয় তো ?

আহমদ—জাঁহাপনা ! আজ সারারাত ঘুম হয়নি আদৌ।

মামুন—তা কেন ?

আহমদ—শুনতে পেলাম খোরাসানের শাসনভার নাকি জাহাঁপনা গাচ্ছানের ওপরে ন্যস্ত করেছেন। তার সাথে মুষ্টিমেয় সৈন্য রয়েছে মাত্র। যদি তুর্কীরা সীমান্ত এলাকায় আক্রমণ চালায়, তা হলে গাচ্ছান কি তাদের ঠেকাতে পারবে ?

মামুন—সেটাতো আমিও ভেবেছিলাম। তবে, তুমি কারো নাম প্রস্তাব করতে চাও কি ?

আহমদ—তাহের জুল য়্যামীনাইন থেকে এ কাজে যোগ্য লোক আর কে থাকতে পারে ?

মামুন—কিন্তু তার হাবভাব তো বিদ্রোহাত্মক মনে হয়। সে আনুগত্য ভংগ করার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে মনে হয়।

আহমদ—আমি সে দায়িত্ব গ্রহণ করলাম।

মামুন—তা হলে তোমার দায়িত্বেই তাকে নিযুক্তিপত্র দাও।

তাহেরকে ডাকা হল। তাকে ভাইসরয় নিযুক্ত করে সনদ দেয়া হল। াথে এককোটি দিরহামও প্রদান করা হল। খোরাসানের ভাইসরয়কে াধারণত তা দেয়া হ'ত।

একমাসের ভেতরেই তাহের খোরাসান যাত্রার প্রস্তুতি সেরে ফেলল। ০৯ হিজরীর ২৯শে জিলকদ সে খোরাসান রওয়ানা হয়ে গেল। তাহেরের াপদান ত্যাগের পরে তার পুত্রকে মামুন 'সাহেব-ই-শর্তা' নিযুক্ত করলেন —নিজ সন্তানের প্রতি ভাল ধারণা সবাই পোষণ করে থাকে। কিন্তু তাহের ামার সম্পর্কে যা কিছু বলেছে, তোমার যোগ্যতার তুলনায় তা অনেক াই বলা হয়েছে।

তাহের যখন মামুনের এ মন্তব্য শুনল, পুত্রের কাছে তক্ষুণি সে এক ্তারিত অথচ সারগর্ভ পত্র লিখল। প্রেরিত পত্রে রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন াসন-শৃংখলা, জনস্বার্থ সংরক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কেও এক জ্ঞানগর্ভ মূলনীতি ল। এ পত্রটি এতই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে, ঘরে ঘরে তার নুলিপি ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি স্বয়ং মামুন তা নকল করিয়ে সব াসনকর্তাদের নিকট পাঠিয়ে লিখলেন—তাহের ইহ ও পরকাল, চিন্তা ও াধনা, রাজনীতি ও রাজ্য সংস্কার, রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও রাজ্যরক্ষা—এক কথায় ব কিছুর জ্ঞানই এতে পুরে দিয়েছে।

আবদুর রহমান বিন আহমদের বিদ্রোহ

(২০৬ হিঃ—৮৬১ খৃঃ)

আবদুর রহমান আহমদের বিদ্রোহ যেমন অহেতুক ছিল না, তেমনি আবার মারাত্মকও ছিল না। তবে তার এ বিদ্রোহ এ জন্যে স্মরণীয় যে, এর ফলে মামুনের জীবনে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে।

ইয়ামনের জনসাধারণ সেখানকার শাসনকর্তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। তারা সবাই মিলে আবদুর রহমানকে এক-জন প্রভাবশালী লোক হিসেবে ধরে খলীফা নির্বাচন করল।

মামুন দীনার বিন আবদুল্লাহ্‌কে পাঠালেন সেখানের বিদ্রোহ আয়ত্তে আনার জন্যে। তার সাথে শান্তিচুক্তির খসড়াও দিলেন। দীনারকে বলে দিলেন—যদি আবদুর রহমান এ চুক্তি মেনে নেয় তা হলে যুদ্ধের কোনই প্রয়োজন নেই।

হজ্জের সময় তখন। দীনার ইয়ামন চলল দলবল নিয়ে। সেখানে পৌঁছে আবদুর রহমানকে শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর দানের জন্যে আহবান জানাল। আবদুর রহমান তা পেয়ে নিজেই দীনারের কাছে চলে এল এবং মামুনের আনুগত্য মেনে নিল। তারপর উভয়ে মিলে বাগদাদ চলে এল।

মামুন আলী বংশের বারংবার উৎপাতে একেবারেই অতিষ্ঠ হয়ে পড়লেন। তাই ২০৭ হিজরীর ২৮শে জিলকদ ঘোষণা করলেন—আলী বংশের সবাইকে তাদের বিশেষ ধরনের সবুজ পোশাক ছেড়ে কালো পোশাক পরিধান করতে হবে এবং আজ থেকে কেউ খলীফার দরবারে আসতে পারবে না।

বলা বাহুল্য, সাদাত বংশের সাথে মামুনের যে প্রগাঢ় হৃদ্যতা ছিল, তার অবসান এই দিন থেকেই শুরু হল।

জুল য়্যামিনাইন তাহেরের মৃত্যু

(২০৭ হিঃ—৮২২ খৃঃ)

মামুন যদিও আহমদ বিন আবি খালিদার দায়িত্বে তাহেরকে খোরা-সানের মত বিরাট রাজ্যের ভাইসরয় মনোনীত করলেন, তবুও তার থেকে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাহের খোরাসান যাত্রার প্রাক্কালে যখন মামুনের কাছে এল অনুমতি ও বিদায় নেবার জন্যে মামুন তখন একজন খাস গোলাম তার সাথে দিলেন। তাহেরকে বলা হল যে, তার অশেষ পরিশ্রমের বিনিময়েই তাকে এ গোলামটি পুরস্কারস্বরূপ দেয়া হল। অপর দিকে গোলামকে নিভৃতে ডেকে বলে দিলেন—তাহেরকে যদি কখনো কোনরূপ বিদ্রোহাত্মক ভাব প্রকাশ করতে দেখ, তা হলে বিষ প্রয়োগে মেরে ফেলবে।

খোরাসান পৌঁছেই তাহের সম্ভবত বিদ্রোহ করার ইচ্ছা করেছিল। তবে তার প্রমাণস্বরূপ ইতিহাসকাররা একটা ঘটনা ছাড়া আর কিছুই সংগ্রহ করতে পারেন নি। তা হল এই যে, একবার জু'মার নামাযের খুতবায় সে মামুনের নাম পাঠ করে নি।

খোরাসানের যোগাযোগ রক্ষাকারী কুলসুম বিন সাবেত সেখানে উপস্থিত ছিল। সে বাসায় ফিরে এসে গোসল করল এবং কাফন পরিধান করে মামুনের কাছে এ ঘটনা জানাবার জন্যে লেখনী ধারণ করল। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাহের অবশ্যই তার এ কাজ জানতে বা বুঝতে পারবে। তখন সে কিছুতেই তাকে জীবিত রাখবে না।

মামুন সে পত্র পেয়ে আহমদ বিন আবি খালিদকে ডাকলেন। সে আসা মাত্রই নির্দেশ দিলেন—এক্ষুণি খোরাসান চলে যাও। আহমদ অনেক বলে কয়ে এক রাতের সময় নিল। তার কিছু সময় পরেই দ্বিতীয় পত্র এসে পৌঁছল। তাতে জানানো হল—তাহের হঠাৎ মারা গিয়েছে। তাই আহমদের আর খোরাসান যাওয়া হল না।

শুক্রবার দিন তাহেরের জ্বর দেখা দিয়েছিল। সে খবর পেয়ে শনিবার

সকালে অনেক লোক তার সেবা-শুশ্রূষার জন্যে এসে দারোয়ানের কাছে শুনতে পেল যে, অন্যান্য দিন যেরূপ তিনি সকালেই নিদ্রা ছেড়ে বেরিয়ে আসেন, আজ তো সেরূপ আসছেন না। তারপর অপেক্ষা করে করে যখন বেলা বেশ বেড়ে চললো, তখন সবাই তার নিদ্রাকক্ষে ঢুকে দেখতে পেল যে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাপড় মোড়ানো অবস্থায় তাহের মরে রয়েছে।

কারো মতে, হঠাৎ কি কারণে যেন সে ফিট হয়ে পড়ে মারা যায়।

মামুন তাহেরের পরে তার পুত্র তালহাকে খোরাসানের ভাইসরয় করেন। তার দ্বিতীয় ছেলে আবদুল্লাহ্‌কেও সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত করেন। তাহেরের তিন পুরুষ যথাক্রমে তাহের, আবদুল্লাহ্ বিন তাহের ও ওবায়দুল্লাহ্ বিন আবদুল্লাহ্ আব্বাসীয় খিলাফতের সময়ে প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল।

এ ব্যাপারে আমার কোনই সন্দেহ নেই যে, তাহেরকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে এবং তার মূলে রয়েছেন স্বয়ং মামুন।[১] এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, এরূপ ক্ষেত্রে মামুন না হয়ে যদি অন্য কোন খলীফা হতেন তিনিই বা কি করতেন? এ প্রশ্নের জবাবের জন্যে আমাদের বেশী দূরে যেতে হয় না। মামুনের পিতা হারুন-অর-রশীদের কার্যধারা লক্ষ্য করলেই তা বুঝা যায়।

আমরা দেখছি যে, কাল্পনিক অভিযোগের দায়ে হারুন বিখ্যাত অতুলনীয় মনীষাপূর্ণ বার্মেকী পরিবারটিকে ধ্বংস করে ফেললেন। তাই মামুন যা করলেন, রাজনৈতিক কারণে তা অপরিহার্য ছিল। তবুও তার বংশ সে কারণে আদৌ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। বরং তার ছেলেকে এতখানি মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন যে কিছুকাল পরে সে খোরাসানে স্বাধীন রাজত্ব কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিল।

১. উয়ুনোল হাদাএক প্রণেতা ইবনে খালদুন ও আবুল ফেদা—এদের কেউই তাহেরের মৃত্যুর কারণ উল্লেখ করেন নি। আরব ইতিহাসবেত্তাদের নিয়ম হল এই তাঁরা সব ঘটনাই বিস্তারিতভাবে লিখে যাবেন, কিন্তু তার কার্যকারণ নিয়ে কোনরূপ আলোচনা করবেন না। কেবলমাত্র ইবনে খাল্লকান এ ঘটনাটি ভালভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি হারুন বিন আব্বাস বিন মামুন-অর-রশীদের ইতিহাসকে ভিত্তি করে লিখেছেন বলে নির্ভরযোগ্য ভেবে আমি তা থেকেই আমার মতামত লিখেছি। (তারীখ-ই-ইবনে খাল্লকান—কায়রো মুদ্রণ)

মামুনের কাছে যখন তাহেরের মৃত্যুর সংবাদ এল, তখনই মামুন [illegible]লেন: আল্লাহ্‌কে অশেষ ধন্যবাদ! তিনি তাহেরকে আমার আগেই [illegible] করেছেন।

এ কথায়ও পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তাহেরের বিদ্রোহী মনোভাব [illegible]র্কে তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল। এ বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে জানা [illegible] যে, দেশের খুঁটিনাটি খবরাখবর মামুন কতখানি রাখতেন। তাই [illegible] কার্যধারার গুরুত্বও তখন অনুধাবন করা সহজ হবে।

অফ্রিকায় গোলযোগ ঃ মূসা বিন নাসিরের বিদ্রোহ

(২০৮ হিঃ—৮২৩ খৃঃ)

উত্তর আফ্রিকা ইসলামের আওতাধীনে এসেছে মাত্র একশ বছর হল। কিন্তু তা বিজিত হবার পর থেকে সেখানে গোলযোগ লেগেই ছিল। সেখানকার আবহাওয়া ও পরিবেশ দেশবাসীকে সুশৃংখল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হতে দেয়নি। আরবীয়রা সেসব এলাকায় গিয়ে বসতি স্থাপনের ফলে বিদ্রোহ ও বিশৃংখলা তাদের ভেতরে যেন বেশী মাত্রায় দেখা দিল। তাই সেখানে যা কিছু রাজস্ব আদায় হ'ত তা সেখানকার শান্তি-শৃংখলা রক্ষার কাজেই ব্যয় হ'ত। তাছাড়াও মিসরের সরকারী তহবিল হতে আরও পাঁচ লাখ টাকা বার্ষিক সাহায্য গ্রহণ করতে হ'ত।

১৮৪ হিজরীতে (৮০০ খৃঃ) হারুন-অর-রশীদ ইবরাহীম বিন আল আগলাবকে আফ্রিকার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। সে আফ্রিকা থেকে বার্ষিক চল্লিশ হাজার টাকা রাজস্ব আদায় করে দিতে স্বীকৃত হয়েছিল। ইবরাহীম অত্যন্ত সুনামের সাথে শাসনকার্য চালিয়েছিল। তাই আফ্রিকার গভর্নর পদ তার বংশ পরম্পরায়ের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদে পরিণত হয়েছিল। তাই দেখা যায়, হারুনের মৃত্যুর পরে মামুনের সময়ে সেখানকার গভর্নর ছিল ইবরাহীমের স্বনামধন্য পুত্র যিয়াদাতুল্লাহ্।

২০৮ হিজরীতে তিউনিসিয়ায় এক নয়া বিদ্রোহের সূত্রপাত হল। তার মূলে ছিল মনসুর বিন নাসির। যিয়াদাতুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন হামযা নামক এক সেনাপতিকে সেই বিদ্রোহ দমনের জন্যে প্রেরণ করল। তার সাথে তিনশ অশ্বারোহী সৈন্য দেয়া হল। সে হঠাৎ তিউনিসিয়া আক্রমণ করে মনসুরকে বন্দী করে নিয়ে আসবে এটাই ছিল উদ্দেশ্য।

কিন্তু মুহাম্মদের সেখানে পৌঁছার আগেই মনসুর খবর পেয়ে গেল। সে তুনায়যাহ চলে গেল। মুহাম্মদ তিউনিসিয়ায় পৌঁছে উদ্দেশ্য সাধনে

কাম হল। অগত্যা সে একটা কৌশল আবিষ্কার করল। সেখানকার জীকে সে পাঠাল মনসুরের কাছে দূত হিসেবে। চল্লিশজন বিজ্ঞ ও রযোগ্য ব্যক্তিও কাজী সাহেবের সাথে গেলো। তাদের শিখিয়ে হল যে, ওয়াজ-নসীহতের ফাঁদ পেতে শিকার ধরে নিয়ে আসবে।

মনসুর ছিল মোল্লাজীদের চাইতে আরেক দফা বেশী চালাক। সে জী সাহেবকে বলল, আমি তো আপনার বহু নুন খেয়েছি। আজকে কিছু ওয়াজ নসীহত শোনার পরে আমার বড়ই সাধ জেগেছে আপনার কিছু নুনভাতে খাওয়াবার। গরীবানাভাবে যা কিছু ব্যবস্থা করব তা দয়া করে গ্রহণ করেন তা হলে কালকে ভোরেই আমি আপনার সাথে ফিরে যাব।

মনসুর এভাবে মুহাম্মদকেও এক দাওয়াতনামা লিখলো। তাতে সে —কাজী সাহেবের সাথে কাল যদি দয়া করে আপনিও আমার ীতে মেহমান হতেন, তা হলে কিছুটা খিদমত করে ধন্য হতাম।

মনসুরের দাওয়াত পেয়ে মুহাম্মদ খুশীতে ফুলে উঠলো। তার ক্ষুদ্র দল নিয়ে মহা উল্লাসে সেখানে হাজির হয়ে নিশ্চিন্তে জিয়াফত খাওয়ায় গুল হল। শরাব সরবরাহ করা হল প্রচুর। তাতে একে একে সবাই লো। তখনও কারো নেশা টুটেনি। এমন সময় যুদ্ধের নহবৎ গুরু নে বেজে উঠল। সবাই চমকে উঠল। হরিষে বিষাদ। চোখ তেই দেখল মনসুরের সেনাদল যমদূতের মত সামনে দাঁড়িয়ে। ম্মদের সংগী সৈন্যরাও হাতিয়ার সামলে নেবার উদ্যোগ করল। কিন্তু গই সার। শেষ পর্যন্ত ছোটখাট একটা যুদ্ধের মতও হল। ফল যা র, তাই হল। রাতের আঁধারে মনসুরের সৈন্যরা মুহাম্মদের সৈন্য এক করে নিঃশেষ করল। বাঁচল শুধু তারাই যারা কোন মতে আঁধারে কা দিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে অপর পারে পৌঁছাতে সমর্থ হল।

এখন মনসুরের প্রতিপত্তি স্বভাবতই বেড়ে গেল। তিউনিসিয়ায় যিয়া-তুল্লাহ্‌র যে সৈন্য ছিল তারা এসে মনসুরের আনুগত্য মেনে নিল। তবে আরোপ করল এই যে যিয়াদাতুল্লাহ্‌র কোন প্রিয় ব্যক্তিকে হত্যা মনসুর তাদের ভিতরে এ বিশ্বাস জন্মাবে যে কিছুতেই সে আবার দাতুল্লাহ্‌র সাথে মিশে যাবে না। তদনুসারে মনসুর যিয়াদাতুল্লাহ্‌র আত্মীয় ইসমাইলকে হত্যা করল। সে ছিল সেখানকার এক উচ্চ কর্মচারী।

এর পর থেকে তিউনিসিয়ায় দিন দিন মনসুরের শক্তি বেড়ে চলল। তাই তাকে দমন করার জন্যে যিয়াদাতুল্লাহ্ এক শক্তিশালী বাহিনী তার বিশেষ উযীর গালিউনের নেতৃত্বে পাঠালো। দশই রবিউল আউয়াল মনসুরের দলের সাথে এই দলের মুকাবিলা হল। যুদ্ধে গালিউন চরমভাবে পরাজিত হল। তার সাথের যেসব সৈন্য বেঁচেছিল, তারা যে যেদিকে সুযোগ পেল প্রাণ নিয়ে পালালো।

এর ফলে মনসুরের সাহস এতখানি বেড়ে গেল যে, সে সসৈন্যে গিয়ে যিয়াদাতুল্লাহ্‌র রাজধানী কায়রোয়ান অবরোধ করল। চল্লিশ দিন পর্যন্ত অবরোধ চলল। বড় বড় যুদ্ধও হল। শেষ যুদ্ধ সংঘটিত হল ২৫শে জমাদিউস্ সানী। যিয়াদাতুল্লাহ্ এরূপ বিরাট আয়োজন সহকারে যুদ্ধের ময়দানে নামল যে, মনসুর তা দেখেই ঘাবড়ে গেল। যুদ্ধও হল বটে। মনসুরের ধারণা অনুসারেই তার ফল দেখা দিল। যিয়াদাতুল্লাহ্ পূর্ণ জয়ী হল।

অবরোধের সময়ে কায়রোয়ানের নাগরিকরা গিয়ে অনেকেই মনসুরের সাথে যোগ দিয়েছিল। যুদ্ধে জয়লাভ করে যিয়াদাতুল্লাহ্ তাদের ওপরে প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু দরবারের সব আলেম ও ফকীহ্‌রা তাকে সে মনোভাব বর্জন করতে বাধ্য করলেন। তবুও তাদের কিছুটা সবক দেবার জন্যে যিয়াদাতুল্লাহ্ শহর-প্রাচীর ধ্বংস করে ফেলে।

যদিও মনসুর পরাজিত হয়ে কায়রোয়ান থেকে পালিয়ে গেল, কিন্তু তার অন্যান্য কর্মকর্তারা উত্তর আফ্রিকার বহু জেলার ওপরে আধিপত্য জমিয়ে বসেছিল। তাদের ভেতরে আমের বিন নাফের সিরিয়া দখল করে বসেছিল।

২০৯ হিজরীতে মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ নামক এক প্রিয় সেনাপতিকে যিয়াদাতুল্লাহ্ তার বিরুদ্ধে পাঠাল। ২০শে মুহররম আমেরের দলের সাথে তার ভীষণ যুদ্ধ হয়। তাতে মুহাম্মদ পরাজিত হল এবং কায়রোয়ান ফিরে এল।

ইত্যবসরে মনসুর শক্তি সংগ্রহ করে আবার গিয়ে কায়রোয়ান অবরোধ করল। কারণ, গতবারে পরাজিত হয়ে আসার সময় তার দলের বহু আপনজন কায়রোয়ানে বন্দী জীবন যাপন করছিল। তাদের উদ্ধার করাই ছিল মনসুরের এবারকার আক্রমণের মূল উদ্দেশ্য। যোলদিন

অবরোধ চলল। এর ভেতরে কোন যুদ্ধ হল না। তবে, মনসুর [illegible]উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করল। তার দলের লোকদের আত্মীয়-স্বজন [illegible]বন্দী ছিল, তারা মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এসে আপনজনদের সাথে মিলিত [illegible]

[illegible]নসুর সেখান থেকে চলে এল তিউনিসিয়ায়। আফ্রিকার প্রায় এলাকাই [illegible]াতুল্লাহ্‌র হাতছাড়া হয়ে গেল। খলীফার যে সৈন্যদল মনসুরের [illegible] যোগ দিয়েছিল, তারাই যিয়াদাতুল্লাহ্‌কে এক সান্ত্বনাপূর্ণ পত্র [illegible]। তাতে তারা লিখল—তোমার প্রাণ বাঁচাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, [illegible] ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া। এরূপ শুভবুদ্ধি যদি তোমার [illegible], তা হলে সে পথে আমরা তোমার প্রাণের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা [illegible]।

[illegible]তঃ, পর পর কয়েকটি আকস্মিক ঘটনা না ঘটলে আগলাব বংশ [illegible] লোপ পেয়ে যেত। কিন্তু ২১১ হিজরীতে মনসুরের দক্ষিণ [illegible]আমের নিজেই মনসুরের ওপরে নারাজ হল। সেই মনোমালিন্যের [illegible]রিণতি দাঁড়াল এই যে, আমেরই মনসুরকে হত্যা করাল। অবশ্য [illegible]রাও তার পরে বেশী দিন টিকে থাকল না। দু'তিন বছরের ভেতর [illegible]জীবনের বিনিময়ে মনসুর হত্যার প্রায়শ্চিত্ত ঘটে গেল। ফলে, [illegible] আকাশ যিয়াদাতুল্লাহ্‌র জন্য মুক্ত ও প্রশস্ত হয়ে গেল।

[illegible] ঘটনার পর থেকেই যিয়াদাতুল্লাহ্ সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হল। তাই [illegible] বলেছিল যে, যুদ্ধ এতদিনে হাত গুটাল।

নসর বিন শীসের গেফতারী

(২০৯ হিঃ—৮২৪ খৃঃ)

হলবের উত্তর দিকে কয়সুম নামক স্থানে নসর জন্মগ্রহণ করে। সে ছিল খলীফা আমীনুর রশীদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। বাগদাদ অবরোধের সময়ে অবশ্য সে আমীনকে কোনরূপ সাহায্য করতে পারেনি। কিন্তু আমীন নিহত হবার সংগে সংগে সে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। যেহেতু তার সাথে আরবের কতিপয় গোত্র এবং অনেক বেদুঈন যাযাবর যোগ দিল, সেহেতু তাদের সাহায্যে সে হলব, দগিয়াত ও অন্যান্য কয়েকটি এলাকা দখল করে নিল।

হাসান বিন সহল বাদগাদ বিজয়ী তাহেরকে তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করল। তাহের তার সাথে যুদ্ধ করে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল এবং রেক্কায় পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হল।

১৯৯ হিজরীর ভেতরেই উপকূল ভাগের প্রায় এলাকাই নসরের হস্তগত হল। এমন কি ২০৮ হিজরী পর্যন্ত দোর্দণ্ডপ্রতাপে স্বাধীন নরপতি হিসেবে সে খলীফার সাথে সমানে পাল্লা দিয়ে চললো।

২০৪ হিজরীতে তাহের যখন রেক্কা থেকে চলে এল তখন তার পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে নসরের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্যে মনোনীত করা হল। কিন্তু সে বেচারা পর পর চার বছর ধরে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়েও নসরের ওপরে জয়ী হতে পারল না।

৮২১ খৃস্টাব্দে অগত্যা মামুন মুহাম্মদ আমেরীকে নসরের কাছে দূত হিসেবে প্রেরণ করলেন। নসর আমেরীর প্রভাবে যদিও নামমাত্র মামুনের আনুগত্য স্বীকারে সম্মত হল; কিন্তু সেক্ষেত্রে সে যেসব শর্ত পেশ করল তা বিদ্রোহের চাইতে কম মারাত্মক নয়। প্রথম শর্তই হল এই, মামুনের দরবারে সে কখনও উপস্থিত হবে না। তাই মামুন তার এ ধরনের শর্ত মেনে নিতে সাফ অস্বীকার করলেন। অগত্যা আমেরী

মনোরথ হয়ে ফিরে এল এবং নসরকে জানিয়ে এল যে খলীফা মামুন ...মার দরবারে উপস্থিতির ওপরেই বেশী জোর দিচ্ছেন। নসর তা শুনে ...কার ছেড়ে বলল : কয়েকটা ভেকের (খুত জাতি)[১] ওপরে যার আধিপত্য ... না, তার সামনে আরবের দুর্ধর্ষ বীরেরা কি করে মাথা নত করবে?

দুর্ভাগ্য যে, নসরের এ অহংকার বেশি দিন টিকে রয়নি। আবদুল্লাহ্‌ ... তাহের যুদ্ধের পর যুদ্ধ চালিয়ে তাকে এতই ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল ... শেষ পর্যন্ত তাকে বিনা শর্তেই আত্মসমর্পণ করতে হল।

---

১. খুত সম্প্রদায় খলীফা মামুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। মামুন কিছুতেই তাদের আয়ত্তে আনতে পারেন নি।

ইবনে আয়েশা ও মালিক নিধন ঃ ইবরাহীমের গ্রেফতার

মামুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ইবরাহীম বাগদাদে খলীফা হয়ে বসে-ছিলেন। তিনি যদিও অবস্থাচক্রে আত্মগোপন করতে বাধ্য হলেন, তবুও তাঁর চেলাচামুণ্ডারা মামুনের বিরুদ্ধে তাদের কার্যধারা অব্যাহত রেখে চলছিলেন। তারা ইবরাহীমকে পুনরায় খলীফা রূপে পাবার জন্যে আপ্রাণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল।

মামুন অনতিবিলম্বে এ ব্যাপার জানতে পারলেন। তিনি ২১০ হিজরীতে হঠাৎ তাদের সবাইকে গ্রেফতার করে ফেললেন। ইবনে আয়েশা ও মালিক ছিল এই দলের শীর্ষস্থানীয়। তারা দীর্ঘ এক ফিরিস্তি তৈরী করে মামুনের সকাশে পেশ করে বলল ঃ এইসব লোকও আমাদের সাথে বিদ্রোহ কার্যে লিপ্ত ছিল। কিন্তু মামুন এই ভেবে তাদের সে অভিযোগের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করলেন না, হয়ত তারা নিজেদের সাথে শত্রুতামূলকভাবে ভাল লোকদের জড়িয়ে নিতে চায়।

যা হোক, বিদ্রোহীদের কয়েদখানায় পাঠানো হল। দুর্ভাগ্য যে, সেখানেও তারা নিশ্চুপ রইল না। একদিন হঠাৎ তারা ভেতর থেকে সব দরজা বন্ধ করে দিল এবং দেয়াল ভেংগে বেরিয়ে যাবার প্রচেষ্টা চালালো।

মামুন খবর পাওয়া মাত্র স্বয়ং জেলখানায় এসে একমাত্র ইবনে আয়েশা ছাড়া সবাইকে হত্যা করালো। ইবনে আয়েশা হাশিমী ছিল। তাই তাকে হত্যা না করিয়ে শূলিদানের ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু মামুনের এই ব্যবস্থা একটি রেকর্ড ভঙ্গ করল। অর্থাৎ হাশিমীদের কেউ আজ পর্যন্ত শূলে প্রাণ দেয় নি। মামুনই তার উদ্বোধন করলেন।

এ ঘটনা ছিল ইবরাহীমকে গ্রেফতার করার ভূমিকা মাত্র। স্বয়ং ইবরাহীম বর্ণনা করেন ঃ মামুন যখন ইরাক পৌঁছলেন, আমাকে গ্রেফতার করার

তিনি একলক্ষ দিরহাম পুরস্কার ঘোষণা করলেন। আমি তখন বুঝতে ... যে, বাগদাদে এখন আর প্রাণের নিরাপত্তা নেই। গরমের মৌসুম ... ঠিক দুপুর বেলা আমি ঘর ছেড়ে বেরোলাম। কিন্তু কোথায় যাব ...ন ঠিক-ঠিকানা ছিল না। একটা সড়কে ঢুকলাম। কিন্তু তার ... ছিল বন্ধ। এখন আগেও এগোতে পারছি না, পেছনেও ফিরতে ... না। এমনি অসহায় ও অস্থির অবস্থায় একটা বাড়ী চোখে পড়ল। ... দরজায় একজন হাবশী ভৃত্যকে দেখতে পেলাম। আমি এগিয়ে ...র কাছে অনুরোধ জানালাম—কিছু সময়ের জন্যে আমাকে এ ... স্থান দেবে কি?

... অত্যন্ত খুশী হয়েই আমার অনুরোধ মঞ্জুর করল। আমাকে সে ... মূল্যবান বস্তুতে সুসজ্জিত একটা কক্ষে নিয়ে সসম্মানে বসাল। যেহেতু সে আমাকে বসিয়ে দিয়ে নিজে বেরিয়ে গেল এবং যাবার ...ইরে থেকে দরজা বন্ধ করে গেল, সেহেতু সব আশাই আমার ...াশায় রূপান্তরিত হয়। আমার নিশ্চিন্ত ধারণা জন্মে গেল যে, আমাকে গ্রেফতার করিয়ে দেবার জন্যে এভাবে আটকে রেখে ... খবর দিতে গিয়েছে। যখন আমি এরূপ এক অন্তর্জ্বালা ও ...া কাটাচ্ছিলাম তখনই দেখতে পেলাম যে, সে অপর একটা ভৃত্য ...সে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো। আমি খুশী ভরা অবাক দৃষ্টিতে দেখলাম, সে গোশ্‌তভরা ডেকচী ও বিভিন্ন ধরনের খাদ্য-সরঞ্জাম ...সেছে। সে সেইসব বস্তু আমার সামনে দিয়ে করজোরে বলল— আমি নাপিত। তাই হুযুরের জন্যে আমার ঘরে থেকে পাকানো ...াবার আনতে পারলাম না। তাই আমি সব খাদ্য-বস্তু ও সরঞ্জামাদি ... থেকে সদ্য কিনে আনলাম। এখন হুযুর যা ভাল মনে করেন, ...ন।

...মি নিজ হাতে খানা পাকালাম ও বেশ তৃপ্তি মিটিয়ে খেয়ে নিলাম। ... সে আমার অনুমতি নিয়ে শরাব এনে দিল এবং অনুমতি প্রার্থনা ... আমার কাছে বসে থাকার। আমি তাকে অনুমতি দিলাম। আমি ...াব পানে মত্ত ছিলাম। হঠাৎ সে একটা বাঁশী তুলে নিল হাতে ...জোড়ে আরজ করল—এ অধিকার নেই আমার যে হুযুরকে গান ...র জন্যে আবেদন করব। যদি হুযুরের উদার ও মহান চরিত্র ... সে আকাংখা পূরণ করে, তা হলে হয়তো তা সম্ভবপর।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—আমি যে সংগীতপ্রিয় ও সঙ্গীতজ্ঞ তা তুমি বুঝলে বা জানলে কি করে ?

সে জবাব দিল—সুবহানাল্লাহ ! হুযুর কি কিছুতেই নিজকে লুকিয়ে রাখতে পেরেছেন, না পারবেন ? হুযুরের পবিত্র নামটি কি ইবরাহীম নয় ? বাগদাদের সিংহাসন কি হুযুরের চরণ চুমে ধন্য হয়নি। মামুন-অর-রশীদ কার মস্তকের জন্যে একলাখ দিরহাম পুরস্কার ঘোষণা করেছেন ?

এ কথা শুনে আমি বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লাম। মনে মনে বললাম—এ ভৃত্যটিও আল্লাহ্‌র আশ্চর্য লীলার অন্যতম নিদর্শন। এরূপ মহানুভব সেবকের অন্তরে আঘাত দেয়া আমি মানবতার পরিপন্থী ভাবলাম। তার বাঁশীর সুরের তালে তাল মিলিয়ে আমি সংগীতের কয়েকটা লাইন আবৃত্তি করলাম। ভৃত্য দেখতে দেখতে পূর্ণরূপে মত্ততার ডুবে গেল। তন্ময় হয়ে সে নিজেও গান শুরু করল। সে তা এতই সকরুণভাবে গাইল যে, দেয়াল ও দরজাগুলোও যেন তার সাথে গেয়ে চলল। আমি মুহূর্তের জন্যে আমার সব বিপদ ভুলে গেলাম। তাকে সাগ্রহে অনুরোধ করলাম গেয়ে যাবার জন্যে। সে তখন আরও চিত্তাকর্ষক ও মর্মস্পর্শী আবেগভরে এই লাইন ক'টি আবৃত্তি করল ঃ

تعيرنا انا قليل عديدنا
فقلت لها ان الكرام قليل

(তা'ঈরুনা আন্নাহ্ কালীলুন আদীদুনা
ফাকুলতু লাহা ইন্নাল কিরামা কালীলুন)

সাথী মোর কম বলে দুষিছে আমায় কোন জন।
নগণ্য সংখ্যক বটে দুনিয়ার জ্ঞানী মহাজন।

وانا لقوم ما نرى القتل سبة
اذا ما راته عامر وسلول

(ওয়া আনা লিকাওমিন মা নুরীল কাত্‌লু সাব্বিয়াতুন
ইযা মা রাআতহু আমিরুন রসলুলি।)

ভাবছে আমের সলুল মরণ বড়ই দোষের
আমার কাছে মৃত্যু গভীর পরিতোষের।

এরূপ প্রভাব ও আবেগপূর্ণ সঙ্গীত আমার চেতনা ও শক্তি যেন এক...

...লোপ করে দিল। অবশ হয়ে আমি অলস তন্দ্রার বুকে গা এলিয়ে ...। যখন ঘুম ভাঙল, সন্ধ্যা নেমে এসেছিল। আমি পকেট থেকে ...লে বের করে গোলামটিকে এই বলে দিতে মনস্থ করলাম যে, ...ফেজ ! অভাগার এ সামান্য বখশিস্ নাও। আল্লাহ্ যদি কোন ...মার এ দুর্ভাগ্য রূপান্তরিত করেন, সেদিন আমি তোমার যথাযোগ্য ...তিক দান করব।

...মটি আমার সেই ভাব দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বলল—হুযুরের ...দমতের সুযোগ পেয়ে আমি যতখানি মর্যাদার অধিকারী হয়েছি ...টাকা-পয়সার বিনিময়ে কি তা বিক্রী করা চলে ? আল্লাহ্‌র কসম ! ...থা আমি আপনার থেকে দ্বিতীয়বার শুনতে আশা করি না। ...পনি আবার সেরূপ কিছু বলেন, তা'হলে এই নগণ্য জীবন আমি ...দিতে বাধ্য হব।

...মি লজ্জিত হয়ে আমার বখশিসের থলে ফিরিয়ে নিলাম। আমি ...র তার থেকে বিদায় নিতে মনস্থ করলাম। তা টের পেয়েই সে ...ল কন্ঠে বলল—প্রভু ! এখানে আপনি সবচাইতে নিশ্চিন্তে ও আরামে ...কতে পারবেন। আরও কয়েকটা দিন ধৈর্য ধরে এখানে থাকুন। ...র এই হাংগামা শেষ হয়ে যাক। তারপরে আপনার যা মর্জি তাই ...পারবেন।

...মি আরও কিছুদিন তার সেখানে অবস্থান করলাম। কিন্তু আমি ...মেযবানের ওপরে দুঃসাধ্য বোঝা হয়ে উঠি, এই ভয়ে একদিন ...দি সরে পড়লাম এবং নিজেকে লুকিয়ে রাখার জন্যে নারীর পোশাক ...করলাম। তবুও পথে আমাকে এক অশ্বারোহী সৈন্য চিনতে ...মামুনের বিঘোষিত পুরস্কারের আশায় চীৎকার করে আমাকে ...ধরল। আমি অগত্যা সজোরে এক ধাক্কা মেরে তার থেকে নিজেকে ...ড়িয়ে নিলাম। সে বেচারা সিটকে গিয়ে একটা গর্তে পড়ে গেল। ...শুনে বাজারের লোকজন এসে জড়ো হল। আমি এক ফাঁকে ...দিয়ে একবাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়ানো এক মহিলার কাছে আশ্রয় ...করলাম। সে বেচারী নেহাৎ সরলপ্রাণা ছিল। তাই সহানুভূতির ...দিয়ে নিয়ে নিজ ঘরের ভেতরে আশ্রয় দান করল। দুর্ভাগ্য যে, ...নুভব নারীটি সেই অর্থ-পিশাচ সৈনিকটিরই স্ত্রী। কিছুক্ষণ পরে ...শ্বারোহী সৈন্যটি তার ঘরে ঢুকেই প্রথম দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে

পেল। তারপর সে নিজ স্ত্রীকে দূরে ডেকে নিয়ে সব ঘটনা শোনাল। তবুও সে মহৎপ্রাণা নারীটি আমাকে এসে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ আপনার দুর্ভাবনার কোনই কারণ নেই।

আমি পর পর তিনদিন তার সেখানে অতিথি হয়ে রইলাম। তবে, স্বামীর ওপরে ভদ্রমহিলার তেমন আস্থা ছিল না বলেই চতুর্থ দিন এসে আমাকে বলল—দুঃখের বিষয় যে, আমি আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব আর বহন করত পারছি না।

অগত্যা সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। এরূপ দুর্ভাগ্যের মুহূর্তে আমার এক প্রিয় দাসীর কথা মনে পড়ল। আমি সোজা গিয়ে তার ঘরে পৌঁছলাম। আমাকে দেখেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল এবং কান্নাভরা আওয়াজ ও লোক দেখানো অশ্রু চোখে নিয়ে সে আমাকে অভ্যর্থনা জানায়। কিছুক্ষণ অবধি দুঃখ-দরদের কথাবার্তা হল। তারপরে সে বাইরে চলে গেল। আমি নিশ্চিন্তে বসে রইলাম যে, আমার আতিথেয়তার আয়োজনেই সে বেরিয়েছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সে আমার জন্যে যে উপঢৌকন নিয়ে এল তা হল রক্তপিপাসু পুলিশ বাহিনী। আমি তখন নারীর পোশাক ধারণ করেছিলাম। সেই অবস্থায়ই আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে মামুনের দরবারে হাজির করা হল।

দরবারে পৌঁছেই রীতি অনুসারে অভিবাদন জানালাম। মামুন তদুত্তরে বললেন—আল্লাহ্ তোর অমংগল করুন।

আমি তখন নিঃশংকচিত্তে বললাম—আমীরুল মু'মিনীন। একটু চুপ করুন। সন্দেহ নেই, আমি সাজা পাবারই যোগ্য। কিন্তু ক্ষমাশীলতা আল্লাহ্ ভীরুতার নিদর্শন। আমার পাপ সব পাপের বড়। কিন্তু আপনার মহানুভবতার চাইতে তা আর বড় হতে পারে না। যদি আপনি আমাকে শাস্তি দান করেন, আপনার সেটা অধিকার বটে। যদি ক্ষমা করেন, সেটা আপনার অনুগ্রহ। তারপরে আমি নিম্নের চরণ ক'টি আবৃত্তি করলাম :

ذنبي إليك عظيم وأنت أعظم منه
فخذ بحقك أو لا فاصفح بحلمك عنه
إن لم أكن في فعالي من الكرام فكنه

(যামবী ইলায়কা আজীমু
ওয়া আন্‌তা আ'জমু মিনহু
ফা'খুয্ বিহাক্কি আওয়ালান
ফাস্‌ফাহ্ বিহিলমিকা আনহু
ইনলাম আকুন ফী ফা'আ'আলুন
মিনাল কিরামি ফকিন্নাহু।)

—সন্দেহ নেই পাপ বড় মোর
তার চেয়ে তো তুমি বড়
শাস্তি দেয়ার রয় অধিকার
করতে ক্ষমা তুমিই পার
কাজ যদি মোর জঘন্য হয় হোক
তুমি তো আর নও নগণ্য লোক।

আমার এই আবেদনপূর্ণ আবেগময় কথাগুলো মামুনের মনে স্বভাবতই বিস্তার করে চলছিল। তিনি আমার দিকে গভীর প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি পাত করলেন। আমি আরও কয়েকটি বেদনাদায়ক চরণ বড়ই করুণ আবৃত্তি করলাম। তাতে মামুনের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। তিনি দরবারের সবার দিকে দৃষ্টি তুলে বললেন—আপনাদের কি অভিমত?
সবাই সমবেত কণ্ঠে জবাব দিল—হত্যা।

একমাত্র উজীরে আযম আহমদ বিন আবি খালেদ এর বিরুদ্ধে মত দেন। তিনি আমার সুপারিশ করতে গিয়ে বললেন—ইতিহাসে বিদ্রোহের যে হত্যা, তার নজীরের অভাব নেই। তবে, আমীরুল মু'মিনীন বিদ্রোহীকে ক্ষমা করে দেন, তা হলে ইতিহাসে মহানুভবতার একটা নজীর দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হবে।

মামুন তা শুনে মাথা নত করলেন এবং লাইন দু'টি পাঠ করলেন :

قومي هم قتلوا أميم أخي
فإذا رميت يصيبني سهمي

(কাওমী হুম কাতালু আমীনুন আখী
ফাইযা রমায়তুম য়ুসীবুনী সাহমী।)
—আমীন আমার ভাই
কতল করিল সবে তায়
হানিলে আঘাত তারে
ফিরে এসে লাগে মোর গায়।

আমি তৎক্ষণাৎ মুখ থেকে পর্দা তুলে ফেলে চীৎকার করে বললাম—আল্লাহ্‌র কসম ! আমীরুল মু'মিনীন আমাকে ক্ষমা করেছেন।

মামুন তৎক্ষণাৎ সিজদায় পড়ে গেল এবং বহুক্ষণ সেই অবস্থায় ছিল। তারপর সিজদা থেকে মুখ তুলে বললো—চাচাজান। আমি এতক্ষণ সিজদায় ছিলাম কেন তা বলতে পারেন ?

আমি জবাব দিলাম—হয়ত আমার আনুগত্য পেয়ে।

সে বাধা দিয়ে বলল—না, না। আল্লাহ্ যে আমাকে ক্ষমা করার শক্তি দান করেছেন সেই জন্যেই এই সিজদা করলাম।

মামুন এরপরে আমার সব বিবরণ সবিস্তারে শুনলেন। তারপর আমার সাথে যেই ভৃত্য ও নারী সদ্ব্যবহার করেছে, তাদের মধ্যে ভৃত্যকে বার্ষিক এক হাজার দীনার ও স্ত্রীলোকটিকে বিশেষ পুরস্কার দানের নির্দেশ দিলেন। পক্ষান্তরে যেই দাসীটি আমাকে ধরিয়ে পুরস্কারের আশা পোষণ করেছিল, তাকে ডেকে সাজা দেয়া হল।

মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ায় বিদ্রোহ

(২১০ হিঃ—৮২৫ খৃঃ)

২০৬ হিজরীতে উবায়দুল্লাহ্ মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হল। যদিও সে অত্যন্ত প্রভাব-প্রতিপত্তি ও জাঁকজমক নিয়ে রাজত্ব চালাচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত আশাতিরিক্ত সাফল্য তাকে স্বাধীনতার স্বপ্নে মাতিয়া তুলল।

তাহেরের বিখ্যাত ছেলে আবদুল্লাহ্‌কে তার বিরুদ্ধে পাঠানো হল। মিসর থেকে যখন সে এক মঞ্জিল দূরে এসে পৌঁছল তখন একজন সর্দারকে সে কতিপয় ফৌজ নিয়ে শিবির সন্নিবেশের জন্যে সুরক্ষিত স্থান নির্ধারণ কল্পে আগে পাঠাল।

উবায়দুল্লাহ্ সে খবর পেয়ে হঠাৎ এসে সর্দারের ওপরে আক্রমণ চালালো। সর্দারও পেছনে হটবার পাত্র ছিল না। অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে চলল। ইত্যবসরে একজন সৈন্য পাঠিয়ে দিল আবদুল্লাহ্‌কে সংবাদ দানের জন্যে।

আবদুল্লাহ্ যথা সময়ে এসে পৌঁছল। উবায়দুল্লাহ্‌ও এতখানি মূর্খ ছিল না যে, এর পরের যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। সে তক্ষুনি মিসরের পথ ধরল। শহরে ঢুকেই সে দরজা বন্ধ করে দিল।

আবদুল্লাহ্ এসে শহর অবরোধ করল। কিছুদিন না যেতেই উবায়দুল্লাহ্ বেগতিক দেখে আত্মসমর্পণ করল। সে আবদুল্লাহ্‌র কাছে বহু মূল্যবান উপঢৌকন পাঠিয়ে দিল। তাকে ঘুষ বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কয়েক হাজার দাস-দাসী পাঠাল এবং তাদের প্রত্যেকের হাতে এক হাজার করে স্বর্ণমুদ্রা পাঠাল। যদিও সেগুলো ইচ্ছা করেই রাত্রে পাঠানো হয়েছিল, তবুও আবদুল্লাহ্ তা গ্রহণ করতে সাফ অস্বীকার করল। সেগুলো গ্রহণ করতে পারতাম, তা হলে অবশ্য রাত্রে গ্রহণ করতে অস্বীকার করতাম না।

পত্রের শেষ ভাগে সে কুরআনের এই প্রেরণা ও প্রভাবপূর্ণ আয়াতটি উদ্ধৃত করল :

ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها

অর্থাৎ—তুমি তাদের কাছে ফিরে যাও। আমি অবশ্যই এমন সৈন্য নিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হব, যাদের সামনে দাঁড়াবার ক্ষমতা তাদের নেই।

এই ভয়াবহ পত্র তরবারির চাইতেও বেশি কাজে আসল। উবায়দুল্লাহ ভীত হয়ে নিরাপত্তা প্রার্থনা করল।

মিসর সম্পর্কে তো আবদুল্লাহ্ নিশ্চিন্ত হল। কিন্তু আলেকজান্ড্রিয়া অভিযান এখনও বাকী। উবায়দুল্লাহ্র বিদ্রোহ ঘোষণার পরেই স্পেনের উমাইয়া শাসকদের একদল সৈন্য এসে আলেকজান্ড্রিয়া দখল করে বসল। কিন্তু আবদুল্লাহ্ পৌঁছার সংগে সংগে তাদের সাহস ও উৎসাহে ভাটা পড়ে গেল। তারাও আবদুল্লাহ্র থেকে নিরাপত্তার আশ্বাস নিয়ে আলেকজান্ড্রিয়া ত্যাগ করে চলে গেল। ফলে উত্তর আফ্রিকার সর্বত্র ফিতনা ফ্যাসাদ ঠাণ্ডা হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল।

যোরায়েকের বিদ্রোহ

(২১১ হিঃ—৮২৬ খৃঃ)

যোরায়েক ছিল আরব বংশজাত। ২০৯ হিজরীতে সে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের গভর্নর নিযুক্ত হয়। কিন্তু কিছুদিন পরেই সে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজ এলাকা সম্পূর্ণভাবে করায়ত্ত করে নিল।

সাইয়েদ ইবনুল আনাস ছিল মু'সেলের অধিনায়ক। কয়েকবার সে যোরায়েকের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েও সফলতা লাভ করল না।

২১১ হিজরীতে যোরায়েক বিশাল এক সৈন্যদল গড়ে তুললো। অন্যূন চল্লিশ হাজার সৈন্যের সমাবেশ ঘটল তাতে। যোরায়েকের একজন বাহাদুর ভৃত্য ছিল। তাকে প্রতি বছর একলাখ টাকা দিয়ে এ জন্যে পোষা হ'ত যে, সে সাইয়েদকে হত্যা করায় সম্মত হয়েছিল। তাই যোরায়েক যখন তার এই বিরাট বাহিনী সাইয়েদের বিরুদ্ধে পাঠাল তখন সে বাহাদুর ভৃত্যটিও সংগে গেল।

সাইয়েদের নিয়ম ছিল যে, যুদ্ধের ময়দানে প্রথম সে একাই আক্রমণ শুরু করত। যোরায়েকের বিরাট বাহিনী দেখতে পেয়েও সে তার রীতির ব্যতিক্রম করল না। একাই প্রথম যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হল। তা দেখে যোরায়েকের সেই বাহাদুর ভৃত্যটিও এগিয়ে এল। উভয়ের ভেতরে তুমুল যুদ্ধ শুরু হল। উভয়ে প্রাণপণে যুদ্ধ চালালো। অবশেষে তারা একসংগে একের আঘাতে অপরে নিহত হয়ে প্রমাণ করল যে, উভয়েই সমান বীর ছিল।

এরপরে মামুন মুহাম্মদ বিন হামীদ তূসীকে মুসেলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করল। মুহাম্মদ ২১২ হিজরীতে মুসেল পৌঁছল। শাহী ফৌজ ছাড়াও আরব গোত্রের বহু বীরযোদ্ধা তার সাথে ছিল। এই আরবগণ দীর্ঘদিন থেকে মুসেলে বসবাস করে আসছিল। সাইয়েদ বিন আনাসের ছেলে মুহাম্মদও পিতার খুনের বদলা নিবার জন্যে অধীর আগ্রহে সুযোগের

অপেক্ষা করছিল। তাই সেও এসে মুহাম্মদ বিন হামীদের সাথে যোগ দিল।

যোরায়েক মুহাম্মদের আগমনবার্তা পেয়ে নিজেই এগিয়ে এল যুদ্ধ করার জন্যে। যাপ নামক স্থানে উভয় দল সম্মুখীন হল। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যোরায়েক নিরাপত্তা প্রার্থনায় বাধ্য হল।

মামুন এই বিজয়ের পুরস্কারস্বরূপ মুহাম্মদকে যোরায়েকের বাজেয়াপ্ত করা সব সম্পত্তি দান করলেন। কিন্তু মুহাম্মদ যোরায়েকের ছেলেকে ডেকে এনে সব কিছুই ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন—এ সব আমি নিজের থেকেই তোমাকে দিচ্ছি।

এরপরে মুহাম্মদ আজারবাইজান পৌঁছে যোরায়েকের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন জেলায় যারা আধিপত্য জমিয়ে বসেছিল তাদের গ্রেফতার করল।

বাবুক খেরামীর বিদ্রোহ

জাভীদান নামক এক মজুসী নয়া এক ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সাজল। অচিরেই দিকে দিকে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। তার মৃত্যুর পরে বাবুক নামক এক ব্যক্তি দাবী করে বসল যে, জাভীদানের আত্মা এসে তার ভেতরে ঠাঁই নিয়েছে। এসব নানা বাহানা তুলে ২০১ হিজরীতে সে বেশ শক্তি ও প্রতিপত্তির মালিক হয়ে উঠল তখন থেকে সে ইসলামী খিলাফতের অবসান ঘটাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেল।

২০৬ হিজরীতে, আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার গভর্নর ঈসাকে তার বিরুদ্ধে নিয়োজিত করা হয়। কিন্তু সে বাবুকের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়।

২০৯ হিজরীতে আহমদ আসকাফী বাবুককে আক্রমণ করল; কিন্তু বাবুকের সৈন্যরা তাকে জীবন্ত ধরে নিয়ে গেল।

২১৪ হিজরীতে যোরায়েকের পর্যুদস্তকারী মুহাম্মদ বিরাট সাজসজ্জা সহকারে বাবুকের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করল। অনেক বড় বড় ময়দান ও কঠিন কঠিন ঘাঁটি পার হয়ে সে গিয়ে বাবুকের রাজধানীতে পৌঁছল।

হাশতাদসারের সম্মুখভাগে ছিল বড় এক পর্বতশ্রেণী। বাবুক সেই সুরক্ষিত স্থানেই বড় এক পর্বতশৃঙ্গের ওপরে তার সদর দফতর স্থাপন করেছিল। মুহাম্মদ খুবই শৃঙ্খলার সাথে তার সৈন্যদল নিয়ে সেখানে উঠল। মধ্যবর্তী সৈন্যদলের নেতৃত্ব দিল আবু সাঈদকে এবং দক্ষিণ ও বাম বাহুর ভার দিল যথাক্রমে সা'দী ও আব্বাসের হাতে। স্বয়ং মুহাম্মদ পশ্চাদ্ভাগের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিল।

বাবুকের কিছু সৈন্য আগেই ওঁৎ পেতে বসেছিল। মুহাম্মদের সৈন্যদল তিন ফরসং দূরত্বের ভেতরে আসতেই সহসা তার সব সৈন্য চারদিক থেকে মুহাম্মদকে ঘিরে ফেলল। স্বয়ং বাবুকও একটা বিরাট দল নিয়ে মুহাম্মদের সৈন্যদলকে ঘিরে ফেলল। মুহাম্মদের

সৈন্যদল তাই তাদের বেষ্টনীর ভেতরে চলে গিয়ে একেবারেই অসহা
হয়ে পড়ল। আবু সাঈদ ও মুহাম্মদ স্ব-স্ব সৈন্যদল সামনে নেবার
জন্যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালালো। কিন্তু তা আর সম্ভবপর হল না।
মুহাম্মদ একাকী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। যেহেতু সে লড়াইয়ের স্থান থেকে
অনেক দূরে ছিল, তাই কোন দিকে পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে কয়ে
পা অগ্রসর হল। অমনি দেখতে পেল যে, শাহী সৈন্যদলকে বাবুক সদ
বলে পয়মাল করে চলছে। মুহাম্মদ তখন স্বভাবসুলভ বীরত্ব ধ
রাখতে পারল না। তক্ষুনি পেছন ফিরে দাঁড়াল। তার সাথে আরেক
বীর যোদ্ধাও যোগ দিল। উভয়ে মিলে বাবুকের ওপরে আক্রমণ চালা
এবং অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে প্রাণ দিল।

মামুন-অর-রশীদ ২১৮ হিজরী পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশ
বাবুকের হাংগামা লোপ পায়নি। পরবর্তী খলীফা মুতাসিম বিল্লা
জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল বাবুকের পতন। তাঁর সেনানায়ক
পর পর কয়েকটি ভয়াবহ যুদ্ধের পরে বাবুককে জীবিত ধরে এনেছিল।

রাজ্য-বিস্তার

যদিও মামুনের শাসনকালের শুরু থেকেই গৃহযুদ্ধ ও বিদ্রোহ লেগেই ছিল, তবুও তার উচ্চাকাংখা ও সাহস ইসলামী খেলাফতের বিস্তার লাভে বাধাপ্রাপ্ত হতে দেয়নি। সাহাবা ও বনু উমাইয়াদের মত ব্যাপক রাজ্য বিস্তার তো আব্বাসীয় খলীফাদের ইতিহাসে একেবারেই অবর্তমান, তথাপি মামুন এক্ষেত্রে তার পূর্ব পুরুষ হারুন, মনসুর, মাহদী প্রমুখের কারুর চাইতে পেছনে পড়েছিলেন না। বনু উমাইয়াদের হাতে ছিল শুধু তরবারি। পক্ষান্তরে আব্বাসীয়দের হাতে তরবারি ও লিখনী দুই-ই ছিল। এদিক বিবেচনা করলে আব্বাসীয়দের রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে ব্যাপকতা দেখতে না পাওয়াটা তেমন বিচিত্র ব্যাপার বলে মনে হবে না ; আর সে জন্যে তাদের আমরা দায়ী করতেও পারি না।

লেখনীর জয়যাত্রাই আব্বাসীয়দের দুনিয়ার ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। ইউরোপ ও এশিয়া তা আজও অকুন্ঠভাবে স্বীকার করছে। আজও মুসলমানরা সেই গৌরবে বুক ফুলিয়ে নিজেদের ইউরোপের শিক্ষা-গুরু বলার মোহ ভুলতে পারছে না।

১৯৭ হিজরীতে যদিও মামুনের অধিকাংশ সৈন্য বাগদাদ অবরোধের কাজে ব্যাপৃত ছিল, তবুও পূর্বদেশগুলোতে তার দোর্দণ্ড প্রভাব অব্যাহত গতিতে বেড়ে চলছিল। কাবুলে সৈন্য পাঠানো হল। কাবুলের শাসনকর্তা ইসলাম গ্রহণ করে মুকুট ও সিংহাসন উপঢৌকন স্বরূপ খলীফার দরবারে পাঠিয়ে দিল। সে তার সাথে এরূপ আবেদনও জানাল যে, কাবুল ও কান্দাহারকে যেন রাজধানী খোরাসানের অন্তর্ভুক্ত দুটি জেলা বলে ঘোষণা করা হয়। এর আগেও এসব এলাকায় ইসলামী জয়যাত্রার প্লাবন বয়ে গেছে বটে, কিন্তু কাবুলের শাসনকর্তাকে মুসলমান করার গৌরব কেবল মামুনই অর্জন করলেন। কান্দাহার ও গজনী ইত্যাদি এলাকা থেকে পৌত্তলিকতা বলতে গেলে প্রায়ই লোপ পায়। চিরদিনের তরে এসব এলাকা ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল। অসংখ্য মসজিদ গড়ে উঠল। নির্ভেজাল

তওহীদের জয়ধ্বনিতে পাহাড় জংগল গুঞ্জরিত হল। সিন্ধুদেশ বহুদিন ধরে ইসলামী জগতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মনসুর আব্বাসীয় খিলাফতকালে এখানকার শাসনকর্তা এখানে মনসুরা নামে একটা শহরও গড়ে তুলেছিল। সিন্ধুর অধিপতিরা সেটাকেই সর্বদা রাজধানী করে আসছিল। মামুনের সময়ে মুসা বিন ইয়াহিয়া বার্মেকী সেখানের গভর্নর নিযুক্ত হল। সে এগে পূর্ব এলাকার এক রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করল। ফজল বিন হাসান সিন্দান জয় করে নিল। সে এ জয়ের নিদর্শনস্বরূপ সেখানকার একটা বড় হাতী পাঠিয়েছিল খলীফার দরবারে। আরবদের জন্যে হাতী ছিল এক বিস্ময়ের বস্তু। অমূল্য উপঢৌকন ভাবত একে তারা।

ফজলের পুত্র মুহাম্মদ সত্তরটি জাহাজ তৈরী করাল এবং ভারতের উপকূল ভাগে অভিযান চালিয়ে অসংখ্য শত্রুসৈন্য নিপাত করে কালেরী জয় করে নিল। (দুঃখের বিষয়, এ স্থানটির বর্তমান নাম উদ্ধার করতে পারলাম না।)

এই সময়ে খুরিয়াসাতাইন কাশ্মীর ও তিব্বতে অভিযান চালাল। পথে বুখান ও দেরাদর জয় করল। তুর্কিস্তানও তার হাত থেকে নিস্তার পেল না। কারাব, লাগের, আতরায ইত্যাদি শহরে ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডীন হল। জিগোভিয়াম খায়লেজীর (তুর্কী-শাসনকর্তা) বংশধর এবং হাসীন গ্রেফতার হল। ফরগনা রাজ্যে সবুজ পতাকা উড্ডীন হল।

আশ্‌রোস্তার স্বাধীন অধিপতি কাউস ইসলাম গ্রহণ করল। ঘটনা ছিল এই ঃ কাউসের ছোট ছেলে হায়দর তাদের এক সেনাপতির ওপরে চটে গিয়ে তাকে হত্যা করাল। সেনাপতিটি ছিল খুবই পদমর্যাদাশীল ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। এমন কি কাউসের বড় ছেলের জন্যে তারই মেয়ে আনা হয়েছিল। হায়দর তাই বাপের ভয়ে শহর ছেড়ে গেল এবং মামুনের দরবারে হাজির হয়ে বলল ঃ অল্প সংখ্যক সৈন্য হলেই আশ্‌রোস্তা জয় করার জন্যে যথেষ্ট।

মামুন তখন আহমদ বিন আবি খালেদকে বিরাট এক সৈন্যদল নিয়ে আশ্‌রোস্তা পাঠালেন। কাউস এ খবর পেয়ে তুর্কিস্তানের রাজা বাদশাহদের কাছে মুসলমানদের আক্রমণের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্যে সাহায্য প্রার্থনা করল। এভাবে সেখান থেকে সে এক বিরাট বাহিনী সাথে করে নিয়ে এল। কিন্তু তার সেই দলবল সাজিয়ে রাজধানীতে ফিরে আসার আগেই মুসলমানরা তার দেশ জয় করে নিল। অগত্যা বেচারা বাগদাদে চলে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করল। মামুন তার বিনিময়ে তাকে তার রাজ্য প্রত্যার্পণ করলেন।

তিব্বতের অধিপতি এই অভিযানের ফলে ইসলাম গ্রহণ করল। সে বেচারা এক অদ্ভুত মূর্তিপূজা করত। সেটার বাহ্যিক অবয়ব বড়ই বিস্ময়কর ছিল। মূর্তিটির মাথায় সোনার মুকুট ছিল এবং তাতে লাল জহরত-পান্না-চুনি বোঝাই ছিল। সেটা রাখার আসনটাও ছিল অদ্ভুত ধরনের। বহু মূল্যবান রত্নাদি ছিল সেখানে বিভিন্ন উপকরণে জড়ানো। তিব্বতের অধিপতি ইসলাম গ্রহণ করার পরে সেই মূর্তি ও আসন খলীফার দরবারে পাঠিয়ে দেয় এবং লিখে পাঠায় যে, আমি অমুকের পুত্র অমুক ইসলামের সুশীতল ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করলাম এবং আমার বিভ্রান্তির জন্য অনুশোচনার নির্দশন-স্বরূপ এই মূর্তিটি কা'বাঘরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম।

নোসায়েব বিন ইবরাহীম আ'যমী ২০১ হিজরীতে সেই মূর্তি ও আসন নিয়ে মক্কা মুয়াজ্জমা পৌঁছল এবং সেটাকে সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী পথে স্থাপন করার নির্দেশ দিল। তিনদিন পর্যন্ত এক ব্যক্তি সেই সিংহাসনে দাঁড়িয়ে হজ্জব্রত সম্পাদনকারী ও পথচারীদের ভেতরে ঘোষণা করে চলল—তিব্বতের অধিপতি ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং এই সিংহাসন তারই আগেকার কল্পিত মহাপ্রভুর আসন। সর্বসাধারণ মুসলমান যেন এই বলে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করে যে, তিনি এক ঘোর পৌত্তলিক নরপতিকে ইসলাম গ্রহণের শক্তিদান করেছেন।

এই বছরেই তাবিস্তানের গভর্ণর আবদুল্লাহ্ দায়লাম আক্রমণ করল। সেখানকার বড় বড় জেলাগুলো জয় করল। দায়লামের শাসনকর্তা আবু লায়লাকে গ্রেফতার করে নিয়ে এল। তাবিস্তান যদিও ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তবুও তার পার্বত্য অঞ্চল শাহরিয়ার ও মাযিয়ার নামক দুইজন মজুসী শাসনকর্তার অধীনে ছিল। আবদুল্লাহ্ সে এলাকাও আক্রমণ করল। শাহরিয়ার ও মাযিয়ার উভয়েই আনুগত্য মেনে নিল। মাযিয়ারকে মামুনের দরবারে পাঠিয়ে দেয়া হল জয়ের নিদর্শনস্বরূপ।

এদিকে আবু দলফ দায়লামের কয়েকটি বিখ্যাত দুর্গ যথা, এক্লীম, বৌমজ, আমলাম ও আমযাক দখল করে নিল।

মামুন ইউরোপে যুদ্ধ জয়ের কয়েকটি বিখ্যাত নিদর্শন কায়েম ক
ছিলেন। মামুনের অন্যতম সেনাপতি আবু হাফস আন্দালুসী ক্রীট দ
করল। প্রথমে সে সেখানের একটি দুর্গ দখল করে কিছুদিন অব
করল। সেখান থেকে ধীরে ধীরে সমগ্র দ্বীপ জয় করে নিল (২০১ হি
৮১৬ খৃঃ)

সিসিলী বিজয়

(২১২ হিঃ—৮২৭ খৃঃ)

সিসিলী বিজয় মামুনের রাজত্বকালের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় ঘটনা। ২১২ হিজরীতে রোম সাম্রাজ্যের একমাত্র শাহানশাহ মাইকেল (মিখাইল) কন্সেটন্টাইনকে সিসিলির গভর্নর করে পাঠালেন। কন্সেটন্টাইন ফায়মী নামক এক ব্যক্তিকে অ্যাডমিরাল পদে নিয়োগ করল। ফায়মী ছিল এক বিখ্যাত বীরপুরুষ। সে আফ্রিকার উপকূল ভাগে অভিযান চালিয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে। কিন্তু সে গীর্জায় উপাসনারত এক সাধ্বী মহিলাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসায় রোম সম্রাট তার জিহবা কেটে ফেলার নির্দেশ দান করেন।

ফায়মী এই হিংস্র ফরমান মেনে নিতে পারল না এবং প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এর পরেই সে সিসিলীর বিখ্যাত শহর সারকোস্টা দখল করে নিল এবং এ ভাবে দিন দিন সে ক্ষমতা বাড়িয়ে চলল। কন্সেটন্টাইন সারকোস্টা আক্রমণ করে পরাজিত হল এবং কেন্টানিয়ায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হল।

ফায়মী গিয়ে তখন কেন্টানিয়া আক্রমণ করল। কন্সেটন্টাইন গ্রেফতার হল এবং তাকে হত্যা করা হল। এরপর থেকে সমগ্র সিসিলী ফায়মীর অধিকারে চলে এল। সেখানে সে এক স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করল সারকোস্টা হল তার রাজধানী। প্রত্যেক জেলায় নতুন শাসনকর্তা নিযুক্ত করল। কোন শত্রুই আর তার গতিপথ রুখে দাঁড়াতে পারল না।

দুর্ভাগ্যক্রমে তার এক বন্ধু শেষ পর্যন্ত শত্রু হয়ে দাঁড়াল। তার নাম প্লাটো। সে তার ভাইয়ের সহায়তা নিয়ে সারকোস্টা আক্রমণ করল এবং ফায়মী পরাজিত হল। তক্ষুণি সে উত্তর আফ্রিকায় মামুনের নিযুক্ত গভর্নর যিয়াদাতুল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করে পত্র লিখল। এই পত্রে সে যিয়াদাতুল্লাহ্‌কে জানাল: যদি এই সময়ে আপনি আমার ইজ্জত

রক্ষা করেন, তা হলে তার বিনিময়ে আমি আপনাকে সিসিলী দ্বীপ উপঢৌকন দিব।

যিয়াদাতুল্লাহ্ এই পত্র পেয়ে ২১২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে সাতশ' অশ্বারোহী ও দশ হাজার পদাতিক সৈন্য বোঝাই করে একশ' যুদ্ধ জাহাজ ফায়মীকে সাহায্য করার জন্যে পাঠাল। এই সেনা দলের সেনাপতি ছিলেন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম মালিকের প্রিয় শিষ্য আসাদ বিন ফোরাত। এই সৈন্যদল সিসিলী পৌঁছেই বলাটার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করল। সে তখন ফায়মীকে সারকোস্টা থেকে বিতাড়িত করে সেখানেই অবস্থান করছিল।

উভয় দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হল। ফায়মীও ঐ যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। কিন্তু মুসলমানরা এই জন্যে তাকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ থেকে দূরে রাখল যে, কারণ যে যুদ্ধে বিজাতির একটি মানুষও যোগদান করবে, সে যুদ্ধে জয়লাভ করার গৌরব সর্বতোভাবে মুসলমানের প্রাপ্য হবে না। যুদ্ধ শেষ হল বলাটার পরাজয়ের ভেতর দিয়ে। এখন আর আসাদের জয়যাত্রার পথে কোন অন্তরায় রইল না। যেদিকেই অগ্রসর হল, জয়ের পর জয় করে চলল। ক্রাস নামক একটা বিখ্যাত দুর্গ ছিল, চারদিক থেকে সিসিলীবাসী আসাদের ভয়ে এসে এখানে জড়ো হয়েছিল। সেটা যথার্থই একটা সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। এখন আরও সুদৃঢ় হল। মুসলমানরা সেটা আক্রমণ করতে উদ্যত হলে দুর্গবাসী জানাল যে, তারাই মুসলমানদের হাতে দ্বীপ তুলে দেয়ার সহায়তা করছে। মূলত এটা ছিল তাদের একটা ধাপ্পা মাত্র। কারণ ফায়মী মুসলমানদের জয়যাত্রা দেখে ঘাবড়িয়ে গিয়ে দুর্গবাসীকে লিখে জানায় যে, মুসলমানরা যেন কোনমতে দুর্গ হাত করতে না পারে।

আসাদ দুর্গবাসীর প্রস্তাবিত জিযিয়া কর গ্রহণে সম্মত হয়ে প্রতিশ্রুতি দিল যে, মুসলমান সৈন্য দুর্গ থেকে দূরে অবস্থান করবে। ইত্যবসরে সুযোগ পেয়ে দুর্গবাসীরা চারদিক থেকে যুদ্ধের সরঞ্জাম পুরাদমে সংগ্রহ করে নিল এবং জিযিয়া কর দানে অস্বীকার করল। আসাদ এ সংবাদ শুনে চরমভাবে উত্তেজিত হলেন এবং অকস্মাৎ সমগ্র দ্বীপে সৈন্য প্রেরণ করলেন।

তাঁর একদল সৈন্য গিয়ে সারকোস্টা অবরোধ করল। সময়ে আফ্রিকা

থেকে আরও সৈন্য এসে গেল। সারকোস্টা জয় প্রায় সম্পন্নই হয়েছিল, ঠিক এমনি সময়ে বলাটার ভাই মাইকেল বিরাট এক সেনাবাহিনী নিয়ে এসে মুসলিম সেনাদলকে ঘিরে ফেলল। আসাদ সেনাদলকে সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্যে খন্দক তৈরী করাল। তারই চারদিকে বড় বড় গভীর খাল খনন করিয়ে তার উপরে ঘাস বিছিয়ে দেয়া হল।

মাইকেল ইতিমধ্যে তৈরী হয়ে বিপুল বেগে মুসলমান সৈন্যদের ওপরে আক্রমণ চালালো। কিন্তু তার সেনাদল মুসলমানদের দিকে যতই অগ্রসর হতে লাগল ততই তাদের লাশে গভীর খাদ পূর্ণ হয়ে চলল। এভাবে সহজেই মুসলমানরা জয়ী হল।

কিন্তু ২০৩ হিজরীতে সহসা মুসলমানদের ভেতরে ভীষণ মহামারী দেখা দিল। সেনাদলের বিরাট অংশ সেই মহামারীর কবলে প্রাণ হারাল। এমনকি স্বয়ং সেনাপতি আসাদও তাতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। অবশিষ্ট যা কিছু সৈন্যের সেনাপতি হল মুহাম্মদ বিন আবিল জাওয়ারী।

এর ভেতরেই কনস্টান্টিনোপল থেকে রোম সম্রাটের প্রেরিত যুদ্ধ জাহাজ এসে পৌঁছল। মুসলমানরা অগত্যা সিসিলী থেকে হাত গুটিয়ে আফ্রিকায় ফিরে যাবার আয়োজন শুরু করল। কিন্তু রোমক সৈন্যরা চারদিক থেকে তাদের পথ রুদ্ধ করে দিল। অগত্যা হতাশচিত্তে মুসলমানরা মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হল। তাদের যুদ্ধ জাহাজগুলো নিজেরাই সব জ্বালিয়ে দিল এবং সমগ্র দ্বীপ জুড়ে তারা ছড়িয়ে পড়ল মরণপণ করে।

প্রথমে মীনা নামক দুর্গ আক্রমণ করে তিন দিনের ভেতরে তা দখল করে নিল। গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে জর্জেন্ট জয় করে নিল। কসরিয়ানা অবরোধ করে ফায়মীর সহায়তায় তাও জয় করে নিল। অবশ্য পরে তারা ধোকা দিয়ে ফায়মীকে হত্যা করেছিল।

ইত্যবসরে রোম থেকে আরও একদল সৈন্য এসে কসরিয়ানার অধিবাসীদের সংগে যোগ দিল। তবুও মুসলমানদেরই জয়লাভ ঘটল। অসংখ্য রোমক সৈন্য নিহত হল। যারা অবশিষ্ট ছিল তারা কসরিয়ানায় বন্দী হল।

পর পর এরূপ যুদ্ধ জয়ের ফলে মুসলমানদের সাহস ও শত্রু নিধন স্পৃহা অনেকগুণে বেড়ে গেল। তারা অতি উৎসাহের বশবর্তী হয়ে জয়যাত্রা

ছেড়ে দিয়ে লুটতরাজের দিকে ঝুঁকে পড়ল। ফলে সেনাদল কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়ে যারা যেদিকে সুযোগ পেল লুঠতরাজ করে চলল। রোমকরা তাদের এই বিশৃংখল অবস্থা দেখে সবাই মিলে এক যোগে মুসলমানদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল আক্রমণ করে একের পর এক করে পরাজিত করে চলল। একটি যুদ্ধে মুসলমানদের পদাতিক ও অশ্বারোহী নিয়ে অন্যূন্য এক হাজার সৈন্য মারা গেল।

এরপরে রোমকগণ চারদিক থেকে মুষ্টিমেয় মুসলিম সেনাদের ঘিরে ফেলল। এমনকি তাদের পালাবার পথও বন্ধ করে দিল। মুসলমানরা চাইল রাতের আঁধারে হামলা চালিয়ে বেরিয়ে যাবে, কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হল। রোমকরা তা টের পেয়ে গেল এবং তাঁবু ছেড়ে সবাই এদিক ওদিক ওৎ পেতে রইল। মুসলমানরা যখন তাদের তাঁবুতে পেঁছাল, তাঁবু শূন্য দেখতে পেল। সেখান থেকে যখন ফিরে আসতে চাইল তখন তারা রোমকরদের দ্বারা পুরাপুরি বেষ্টিত ছিল। অগত্যা যুদ্ধ করতে হল।

অধিকাংশ মুসলমান প্রাণ দিল। অবশিষ্ট দু'চারজন কোনমতে বেঁচে গিয়ে মীনার দুর্গে আশ্রয় নিল। কিন্তু সেখানে তারা এরূপভাবে অবরুদ্ধ জীবন যাপন করছিল যে, কিছুদিন ধরে কুকুর বিড়াল হত্যা করে তার গোশ খেয়ে জীবন ধারণ করতে হল।

এরূপ কঠোর দুর্দিনে হঠাৎ ঐশী মদদের মতই একটা ঘটনা তাদের অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করল। স্পেনের মুসলিম সরকার সে দিনে বিভিন্ন নতুন দ্বীপ ও তার অধিবাসীদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্যে জাহাজ পাঠাতেন। সেগুলো বিভিন্ন সমুদ্রে ভেসে বেড়াত। ঘটনাচক্রে তারই একটা জাহাজ এসে এই দ্বীপে ভিড়ল। তা দেখেই রোমকরা ঘাবড়ে গেল। ইত্যবসরে আফ্রিকা থেকেও কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ এল মুসলমানদের সাহায্যের জন্যে। এভাবে প্রায় তিনশ' জাহাজ সিসিলী এসে ভিড়ল।

রোমকরা এক্ষণে জয়ের আশা ছেড়ে দিল এবং মীনা অবরোধ তুলে নিল।

মুসলমানরা অবরোধ অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের তীব্র উত্তেজনা নিয়ে পয়লা প্লার্ম শহর আক্রমণ করে জয় করল (২১৬ হিঃ)। তবে তাদের সিসিলী অভিযানে সম্পূর্ণ কৃতকার্যতা এসেছিল মামুনের মৃত্যুর পরে। তাই সেসব বিবরণ এখানে লেখা হল না।

রোম (এশিয়া মাইনর) আক্রমণ

এই আক্রমণ এদিক থেকে বেশি চিত্তাকর্ষক যে, স্বয়ং মামুন এতে শরীক হয়েছিলেন। সত্যি কথা এই যে, যদি এ যুদ্ধে তিনি তাঁর বীরত্ব ও সাহসের চরম পরাকাষ্ঠা না দেখাতেন, তা হলে ইতিহাসবেত্তাদের কাছে তিনি কেবল মাত্র একজন কবি ও লেখক হিসাবেই পরিচিতি লাভ করতেন। এই বিজয়ের মাধ্যমেই ইতিহাসকাররা জানতে পারলেন যে, তিনি একাধারে অসি ও মসীর সমান অধিকারী ছিলেন।

২১৫ হিজরীর জমাদিউল উলায় তিনি রোমের ওপরে আক্রমণ চালান। রোমের সীমান্তে যখন তিনি পৌঁছলেন তখন রোমের শাহানশাহ দূত পাঠালেন সন্ধি প্রার্থনা করে এবং নিম্ন-শর্তগুলো উত্থাপন করলেন ঃ

১. রাজধানী থেকে এ পর্যন্ত আসায় যা কিছু খরচ-পত্তর হয়েছে তা সবই আমি আদায় করব।

২. আমার সাম্রাজ্যের ভেতরে যে কয়জন মুসলমান বন্দী হয়েছে তাদেরে বিনা শর্তে ও স্বার্থে মুক্তি দেব।

৩. পূর্বকালে আমাদের আক্রমণে মুসলমানদের যেসব শহরের কিছু মাত্র ক্ষতি হয়েছে, আমরা সেগুলো সবই পুনর্নির্মাণ করে দেব।

অতঃপর লিখলেন যে, ওপরের এই তিন শর্তের যেটা আপনি পছন্দ করেন, গ্রহণ করুন। আমি তার বিনিময়ে শুধু এতটুকু কামনা করি যে, আপনি রাজধানীতে ফিরে যাবেন।

মামুন এ চিঠি পেয়ে দু' রাকাত নামায আদায় করলেন এবং বহুক্ষণ ধরে চিন্তা করতে লাগলেন যে, কোন্ কর্মপন্থা গ্রহণ করবেন। কিন্তু তাঁর উচ্চাকাংখা তাকে এ প্রেরণাই যোগাল যে, এ সবের চাইতে যুদ্ধ জয়ই উত্তম। তাই তিনি দূতকে ডেকে বললেন ঃ

প্রথম শর্ত সম্পর্কে আমি হযরত সুলায়মান (আ.) এর মতই বলতে চাই যে, তোমার উপঢৌকন তোমার কাছেই থাক। দ্বিতীয় শর্ত

সম্পর্কে আমার কথা হল এই যে, তোমাদের দেশে যেসব মুসলমান বন্দী হয়ে আছে, যদি তারা ধর্মের জন্যে সংগ্রাম করতে গিয়ে থাকে তা হলে এই বন্দী জীবনই তাদের পক্ষে গৌরবময়। আর যদি তারা অর্থের স্বার্থে লড়াই করতে থাকে, তা হলে এটাই তাদের যোগ্য শাস্তি। তৃতীয় শর্তও গ্রহণ করার যোগ্য নয়। কারণ বন্দী হবার মুহূর্তে যেসব মুসলমান নারী 'হায় মুহাম্মদ!' বলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়েছে, তাদের সেই মর্মন্তুদ ফরিয়াদ আমি রোম সাম্রাজ্যের বড় বড় দুর্গগুলোর বিনিময়ে বিক্রী করে দিতে পারি না।

এরপরে মামুন বড়ই জাঁকজমকের সাথে লড়াই করতে করতে রোম সাম্রাজ্যের মূল ভূখণ্ডের সীমান্তে গিয়ে পৌঁছলেন। কোরা দুর্গ অবরোধ করা হল। ২৬শে জমাদিউল উলা তা জয় করে ধ্বংস করে ফেলা হল। মাজেদা দুর্গের অধিবাসীরা এসে বিনা যুদ্ধেই আত্মসমর্পণ করল। সিনান দুর্গ সামান্য যুদ্ধের পরেই বিজিত হল। আশনাস তার ভৃত্যকে সন্দেশ দুর্গ জয় করার জন্যে পাঠাল। সে সেই দুর্গ জয় করে তার অধিপতিকে গ্রেফতার করে নিয়ে এল। এভাবে ওজায়েফ ও জা'ফর সিনান দুর্গে বিজয় পতাকা উড্ডীন করল।

মামুন এভাবে রোম সাম্রাজ্যের বিশেষ অংশ জয় করে সগৌরবে দেশে ফিরলেন। কিন্তু ২১৬ হিজরীতে রোম সম্রাট, তরতুস ও মোসীস পৌঁছে নির্মমভাবে দু'হাজার মুসলমান হত্যা করে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করল। মামুন ভীষণভাবে উত্তেজিত হলেন এবং তক্ষুণি আবার রোম সাম্রাজ্য আক্রমণের জন্যে যাত্রা করলেন। এবারে তিনি নিজেই প্রতিটি দুর্গ অবরোধের ভার গ্রহণ করলেন। তারপর নিজ পুত্র আব্বাস ও ভ্রাতা আবু ইসহাক মু'তাসিমকে বললেন—তোমাদের সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য বিরাট সাম্রাজ্য পড়ে আছে। যেদিকে চোখ যায়, জয় করে নিয়ে যার কৃতিত্ব প্রদর্শন কর।

আবু ইসহাক অন্যূন ত্রিশটি দুর্গ জয় করল। তার ভেতরে দানলা ছিল বারটি দুর্গের সমন্বয়ে সর্ববৃহৎ দুর্গ। আবু ইসহাক এই দুর্গ জয় করে ধ্বংস করে দিল এবং আগুন লাগিয়ে সবকিছু জ্বালিয়ে দিল।

আব্বাস আয়ুযীফু, আহরাব ও হেসীন দুর্গ জয় করে স্বয়ং রোম সম্রাটকে আক্রমণ করল। ভীষণ যুদ্ধের পরে রোম সম্রাট পরাজিত

হয়ে অজস্র ধন-সম্পদ মুসলমানদের হাতে ছেড়ে কোন মতে পালিয়ে গেলেন।

২১৭ হিজরীতে রোম সম্রাট সন্ধির প্রার্থনা করে পত্র লিখলেন। কিন্তু তাতে নিজের নাম উপরে লিখায় মামুন ক্রোধান্বিত হলেন এবং প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে উত্তেজিত হয়ে আবার যথেষ্ট শান-শওকতের সাথে যুদ্ধযাত্রা শুরু হল। মাহরুসা রাজ্যে পৌঁছে সব এলাকার শাসনকর্তাদের নিকট ফরমান পাঠালেন যে সব দিক থেকেই যেন মুসলিম সৈন্যদল রোম সাম্রাজ্যের দিকে অগ্রসর হয়।

সেই যুগে লুলুয়া ছিল রোম সাম্রাজ্যের সবচাইতে শক্তিশালী দুর্গ। অতীতকালে যেসব শক্তিশালী দুর্গের নাম আজও শোনা যায়, এ দুর্গ তাদেরই সাথে তুল্য বলে মেনে নেয়া হয়েছিল। মামুন প্রথমেই সেই দুর্গ অবরোধ করলেন। পর পর কয়েকবার আক্রমণ চালিয়েও যখন সেই অজেয় দুর্গ জয় করা গেল না, তখন তিনি তারই অদূরে নতুন দুটি দুর্গ তৈরীর জন্যে নির্দেশ দিলেন। বিদেশ-বিভুঁই-এ এরূপ একটা নির্দেশ অত্যল্প সময়ের ভেঁতরে প্রতিপালিত হওয়ার ফলে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, মুসলিম সৈন্যরা কত রকমের উপকরণ ও প্রস্তুতি নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করতেন। এই সদ্যগড়া দুর্গ দুটির একটির ওপরে জাবালা ও অপরটির ওপরে আবু ইসহাক মু'তাসিমকে নিযুক্ত করা হল। প্রধান সৈনাপত্যের ভার দেয়া হল ওজায়েফের ওপরে। মামুন স্বয়ং অপর একটি বিখ্যাত দুর্গ জয় করার জন্যে অগ্রসর হলেন। ইত্যবসরে ওজায়েফ শত্রুসৈন্যদের হাতে সহসা গ্রেফতার হল। একমাস পর্যন্ত সে সেই বন্দীদশায় জীবন অতিবাহিত করল।

রোম সম্রাট স্বয়ং লুলুয়া দুর্গের খবর নিতে এসেছিলেন। কিন্তু আবু ইসাহাক ও জাবালা বীরবিক্রমে তাঁর উপরে আক্রমণ চালিয়ে তাঁকে পরাজিত করল এবং বহু ধন-সম্পদ দখল করে নিল। স্বয়ং সম্রাটের এই দশা দেখে লুলুয়াবাসী সাহস হারিয়ে ফেলল এবং ওজায়েফকে এই আশা নিয়ে মুক্তি দিল যে, তার প্রতি এই উদারতার বিনিময়ে হয়ত তাদের নিরাপত্তা মিলবে। মামুন তাদের এ প্রার্থনা কবুল করলেন এবং সেখানে জয়ের নিদর্শনস্বরূপ একটি মুসলমান কলোনী স্থাপন করলেন। রুশ সীমান্তের নিকটবর্তী তেওয়ানা নামক পল্লীতে মুসলমানদের একটি বস্তি গড়ে তোলা হল।

এই বস্তি স্থাপনের ভার দেয়া হয়েছিল শাহযাদা আব্বাসের ওপরে। নতুন শহরের তিন ফরসং দূরে শহরতলী গড়ে উঠল। এর চারদিকে ছিল চারটি সদর দরজা। প্রত্যেক দরজায় ছিল একটি সুদৃঢ় দুর্গ।

ফরমান জারি করা হল যে, প্রত্যেক এলাকা থেকে একদল মুসলমান সৈন্য এসে এই নতুন শহরে বসতি স্থাপন করবে। তাদের ভাতা নির্ধারিত হল। প্রত্যেক অশ্বারোহী মাসিক একশ' দিরহাম এবং প্রত্যেক পদাতিক সৈন্য চল্লিশ দিরহাম করে পেত।

মামুনের মৃত্যু

(১৮ই রজব—২১৮ হিঃ—৮৩৩ খৃঃ)

এতদিনে মামুন তাঁর জীবনে আটচল্লিশটা অধ্যায় পার হলেন। তাঁর প্রথম জীবনটা তো গৃহযুদ্ধ আর বিদ্রোহের শিকারেই পরিণত হল। তা থেকে কোনমতে পরিত্রাণ লাভ করেই তিনি নিজ হাতে শাসন ক্ষমতার বাগডোর ধারণ করলেন। সেই থেকেই শুধু তিনি সুযোগ পেলেন তাঁর ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করার এবং পূর্বপুরুষদের সুনাম বহুগুণে বাড়িয়ে তোলার।

যদিও রোমক সাম্রাজ্য আক্রমণ করতে গিয়েই তিনি তাঁর বীরত্ব ও কৃতিত্বের নিদর্শন সর্বপ্রথম দেখাবার সুযোগ পান, তবুও এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর পূর্বপুরুষের চইতে আদৌ কম কৃতিত্ব দেখান নি। বিজয় সুদৃঢ় করার জন্য তিনি তখনও বিজিত এলাকায় অবস্থান করেছিলেন। শুধু তাই নয়, রোম সাম্রাজ্যের চির অবসান ঘটাবার জন্যেই তিনি হয়ত সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। খাস কনস্টান্টিনোপল আক্রমণের জন্যে তিনি নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্ত মৃত্যু তার সে সব আশা পূরণ করার সুযোগ দেয়নি।

তখন মামুনের সামনে হাজার স্বপ্ন, অশেষ গৌরব অর্জনের সাধ। কিন্তু মৃত্যু এসে তার সব স্বপ্ন-সাধ সাঙ্গ করে দিল।

একদিন মামুন তাঁর ভাই মু'তাসিমকে নিয়ে বজেন্দাছান নামক ঝর্ণার পাশে বের হলেন। পানি ছিল তাতে অত্যন্ত পরিষ্কার। তাই তার ঢেউগুলো আশ্চর্যজনকভাবেই ঝিলমিল করে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল। মামুন ও মু'তাসিম তারই তীরে বসে পা দুটো ঝর্ণার ভেতরে ডুবিয়ে দিলেন। মামুনের খাস সেবক সা'দও সেখানে উপস্থিত ছিল। মামুন তার দিকে চেয়ে বললেন ঃ

"সাদ! এরূপ ঠাণ্ডা ও পরিষ্কার পানি কখনও দেখছ কি ?

সা'দ-(কিছুটা পানি পান করে নিয়ে) "সত্যিই এ পানি অতুলনীয়!"

মামুন—এ পানির সাথে কি খাওয়া চলে ?

স'াদ—হুযুরই এর উত্তর ভাল জানেন।

মামুন—উজাজের খেজুর।

এসব কথাবার্তা হচ্ছিল এমন সময়ে ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ পাওয়া গেল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল ডাক এসেছে। দেখা গেল ডাকপিওন সরকারী চিঠিপত্র ছাড়াও মামুনের নির্দেশিত খাবার নিয়ে এসেছে। সবাই মিলে মহানন্দে তা খেয়ে নিয়ে পেট পুরে সেই ঝর্ণার পানি পান করল। কিন্ত সেখান থেকে ওঠার সাথে সাথেই মামুনের শরীরে গরম অনুভূত হল। ঘাঁটিতে পৌছামাত্র তাঁর ভীষণ জ্বর দেখা দিল। সেই জ্বরেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

মৃত্যুর কয়েকদিন আগেই যখন জীবনের আশা ত্যাগ করলেন তখন তিনি রাজ্যের সকল এলাকায় যে ফরমান পাঠালেন তার শিরোনামায় ছিল "আমীরুল মু'মিনীন মামুন ও তাঁর ভাই আবু ইসহাকের পক্ষ থেকে।"

বলাবাহুল্য, মামুনের সুযোগ্য সন্তান আব্বাসও সেখানে ছিল। তাকে খিলাফতের উত্তরাধিকার মনোনয়ন করা কোনমতেই অসংগত ছিল না। তবুও তার ভেতরে পুত্রস্নেহের চাইতে ভ্রাতৃপ্রেমই প্রাধান্য লাভ করে। অথচ হারুন-অর-রশীদ অযোগ্য বিবেচনায় আবু ইসহাককে খিলাফতের উত্তরাধিকার থেকে একেবারেই বাদ দিয়েছিলেন।

এ কাজের দ্বারা মামুন শুধু তাঁর মহানুভবতারই পরিচয় দেননি, বরং এই মনোনয়ন বিচার-বিবেচনার সুষ্ঠুতারও পরিচায়ক বটে। এই আবু ইসহাকই ইতিহাসে মু'তাসিম বিল্লাহ নামে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর বিরাট গৌরবময় কার্যাবলী স্মরণের জন্যে এই নামই যথেষ্ট।

মামুন মৃত্যুর প্রাক্কালে সমস্ত সেনানায়ক, আলেম কাজী এবং শাহী খান্দানের লোকজন সমবেত করলেন এবং অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় অসিয়ত করলেন :

"আমার পাপ আমি নিজেই স্বীকার করছি। আমি এখন আশা ও নিরাশার মাঝখানে দোদুল্যমান। কিন্ত যখনই আমি আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমার কথা স্মরণ করি, তখনই আশার পাল্লা ভারী হয়ে দাঁড়ায়। আমি যখন মরণের কোলে ঢলে পড়ব, আমাকে খুব ভাল করে

গোসল করাবে এবং ওজু করাবে। আমার কাফনও পাক-পবিত্র হওয়া চাই। তারপর আল্লাহ্‌র প্রশংসা পাঠ করে আমাকে মরণখাটে তুলবে। যতখানি তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার দাফনকার্য সমাধা করবে। যে ব্যক্তি আমার আত্মীয়তার দিকে ঘনিষ্ঠতম এবং বয়োবৃদ্ধ তাঁকে আমার জানাযা আদায় করতে বলবে। জানাযার নামাযে যেন পাঁচবার তকবীর বলা হয়। আমার কবরে সেই ব্যক্তি অবতরণ করবে, যে আমার নিকটতম আত্মীয় এবং আমাকে খুবই ভালবাসে। কবরে আমার মুখ কেবলার দিকে ফিরিয়ে রাখবে। তা কবরে রাখার পরে আমার মাথা ও পায়ের কাপড় সরিয়ে রাখবে। তারপর কবর ঠিকঠাক করে সবাই যেন আমাকে আমার কর্মফল ভোগ করার জন্যে রেখে কাজে চলে যায়। কারণ, তোমরা তখন সবাই মিলেও সেখানে আমার কিছুমাত্র দুঃখ দূর করতে পারবে না, আরাম দিতে পারবে না। এরপরে যদি পার আমার ভাল দিকটা আলোচনা করবে, কুৎসা রটনা করবে না। কারণ মৃত ব্যক্তির কুৎসা রটনার জন্য তোমাদের আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সাবধান! আমার জন্যে যেন কেউ জোরে চীৎকার করে কান্নাকাটি না করে ; কারণ, সে জন্যে হয়ত আমাকে সাজা পেতে হবে।

"একমাত্র সেই আল্লাহ্‌ই প্রশংসার যোগ্য যিনি সবার অদৃষ্টে মরণ লিখে রেখেছেন এবং স্থায়ীত্ব কেবল নিজের জনাই নির্দিষ্ট করেছেন। দেখ, আমি কত ঠাঁটের শাহানশাহ ছিলাম। অথচ আল্লাহ্‌র এই অমোঘ ফরমানের সম্মুখে আমার কিছুই করার শক্তি নেই। পরন্ত এই শাহী ঠাঁটই আমার ভাবী জীবনকে কন্টকময় করে ফেলেছে। আহ! হায়! আবদুল্লাহ্‌ মামুন যদি সৃষ্টি না হ'ত। হে আবু ইসহাক! আমার কাছে এস। আমার এ শোচনীয় অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর।

আল্লাহ্‌ তোমার ঘাড়ে এবারে খিলাফতের বেড়ি পরালেন। তোমার এখন তাঁদের মত হওয়া প্রয়োজন যাঁরা আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি হবার ভয়ে অহরহ কম্পিত ছিলেন। জনসাধারণের কল্যাণের কাজকে সব কাজের উর্ধ্বে স্থান দেবে। বড়রা যেন ছোটদের ওপরে জুলুম করতে না পারে। দুর্বলদের বন্ধু হবে এবং তাদের আপ্রাণ ভালবাসবে। যারা তোমার সহচর হবে তাদের ভুল-ত্রুটি থেকে চোখ ফিরিয়ে নেবে এবং তাদের যথাযোগ্য বেতন ও ভাতা দিতে কসুর করবে না।"

এতটুকু বলেই তিনি কুরআনের একটা আয়াত পাঠ করলেন। সাথে

সাথে চেকুর তুলতে শুরু করলেন। উপস্থিত সবাই পাশে বসে তাঁকে কলেমা
তওহীদ পাঠ করে শোনাতে লাগল। ইবনে মাসবিয়া নামক এক খৃস্টান
ডাক্তার তা দেখে বিদ্রূপ করে বলল ঃ রেখে দিন ওসব হেঁয়ালি মন্ত্র।
এখন মামুনের কাছে আল্লাহ্ আর শয়তান সমান।

মামুন এ কথা শোনা মাত্র যেন শিউরে উঠলেন। তিনি এতখানি রুষ্ট
হলেন যে, তাঁর সর্বাংগ থর থর করে কাঁপতে লাগল। চেহারা ও চোখ
লাল হয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে ইবনে মাসবিয়াকে ধরে ফেলতে চাইলেন
এবং তার ভ্রান্ত ধারণার যথোপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্যে উদগ্রীব হলেন।
কিন্তু নিজের অংগ-প্রত্যংগ তখন তার আওতাধীন ছিল না। মুখে কিছু
বলতে চাইলেন জিহ্বা নড়ল না কিছুতেই। অত্যন্ত আক্ষেপ ও বেদনায়
চোখে আকাশের দিকে তাকালেন। দু'চোখ অশ্রুতে ভরে এল। এমনি
মুহূর্তে আল্লাহ যেন তাঁর বাক্শক্তি ফিরিয়ে দিলেন। তিনি আল্লাহ্‌কে
উদ্দেশ্য করে বড় কষ্টে বললেন—হে অনন্তকালের অবিনশ্বর শাহানশাহ!
স্বল্পকালীন এই নশ্বর রাজ্যাধিপতির প্রতি কৃপা বর্ষণ কর।

এই কথা বলার সাথে সাথে তাঁর পবিত্র আত্মা এ পৃথিবী থেকে বিদায়
সালাম জানাল এবং আল্লাহ্‌র করুণার সুশীতল ছায়ায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ
করল। কতই পুণ্যবান ছিলেন তিনি। আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন।
ইন্নালিল্লাহে......রাজেউন।

আব্বাস ও আবু ইসহাক তাঁর লাশ তরতুস নিয়ে গেলেন এবং হারুন
অর রশীদের খাস গোলাম খাকানের গৃহে তাঁকে দাফন করা হল। ইতি
হাসবেত্তারা এ ব্যাপারটাকে অত্যন্ত শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত বলে এজন্য মনে করেন
যে, যেই মামুন ছিল হারুন-অর রশীদের সবচাইতে প্রিয় সন্তান ও নয়নের
পুতুল, তাঁর কবর ও পিতার কবরের ভেতরে প্রায় পূর্ব গোলার্ধে ও পশ্চিম
গোলার্ধের ব্যবধানে বর্তমান।

মামুনের দৈহিক গড়ন

তাঁর দেহের রং লাল-সাদা ছিল। চোখ দুটো ডাগর ছিল। দাড়ি
ছিল; কিন্তু পাতলা ছিল। কপাল ছোট ছিল। মুখমণ্ডলে একটা তিলের
ফোটা ছিল। মাঝারি ধরণের গড়ন। চেহারা খুবই আকর্ষণীয় ছিল।

মামুনের সন্তান-সন্ততি

১. মুহাম্মদ আকবর
২. মুহাম্মদ আসগর
৩. আব্বাস
৪. আলী
৫. হাসান
৬. ইসমাঈল
৭. ফজল
৮. মুসা
৯. ইবরাহীম
১০. ইয়াকুব
১১. হোসায়েন
১২. সুলায়মান
১৩. জা'ফর
১৪. ইসহাক
১৫. আহমদ
১৬. হারুন
১৭. ঈসা

দ্বিতীয় খণ্ড

মহানগরী বাগদাদ

মামুনের পরদাদা আবু জা'ফর মনসুর মহানগরী বাগদাদের ভিত্তি স্থাপন করেন। মনসুর যদিও আব্বাসীয় বংশের দ্বিতীয় খলীফা ছিলেন, এবং ১৩৭ হিজরীতে সিংহাসনে আরোহণ করেন, তথাপি রাজ্যের প্রসারতা ও দৃঢ়তা সাধনকল্পে তিনি এক নতুন রাজধানীর চরম প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

প্রথমে তিনি সেই জন্যে কুফার শহরতলী এলাকায় হাশিমী খান্দান অধ্যুষিত একটা স্থান মনোনীত করেন রাবেন্দিয়া ফেরকার বিদ্রোহ ও কুফাবাসীর ইতিহাসখ্যাত বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তাঁর সে মনোভাব পাল্টে গেল। এরপরে বহু অনুসন্ধান ও প্রচেষ্টা চালিয়ে এবং অনেক জ্ঞানী-গুণীর পরামর্শ নিয়ে ক্ষুদ্রতম বাগদাদকেই রাজধানী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই বাগদাদ একদিন অবশ্য বিশ্বখ্যাত ন্যায়বিচারক বাদশাহ নওশেরোয়ার রাজধানী ছিল। তারপর ছোট হতে হতে ক্ষুদ্রতম বাগদাদ শহর নামে বেঁচে রইল। [১]

প্রতিটি দিক থেকে বিবেচনা করে দেখা যায় যে, মনসুরের এই নির্বাচন খুবই উপযুক্ত হয়েছিল। এর উভয় দিকে চারটি খুবই সুজলা সুফলা ও সম্পদপূর্ণ প্রদেশ ছিল। তাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর সাথে সংযুক্ত থাকায় ভারত, বসরা, সিরিয়া, মিসর, আজারবাইজান, দিয়ারবকর ইত্যাদি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হবার যোগ্যতা লাভ করেছিল। আবহাওয়াও এরূপ চমৎকার যে, সব দেশের মানুষের পক্ষেই তা উপযোগী। রাজনৈতিক প্রয়োজনের দিক থেকেও এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ কথা বলা সমীচীন যে, গোটা ইসলামী খিলাফতের ভেতরে সেদিক থেকে এর চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও উপযুক্ত স্থান আর হতে পারে না। তা একদিকে যেমন আরবের এতখানি বেষ্টনীর ভেতরে ছিল না যে, শাহী তাঁটের স্বাধীনচেতা সরকার জোর পাবে না সেখানে। পক্ষান্তরে আরব থেকে এত দূরেও ছিল না যে, আরব শক্তি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে খিলাফতের কাজে লাগানো যায় না।

এসব দিক বিবেচনা করে রাজধানীর জন্যে বাগদাদের উপযুক্ততার সাথে কেবল দামেস্ক কিছুটা তুলনীয় হতে পারে। কিন্তু সেখানের পরিবেশে তখনও মারোয়ানী শাসনের বিষময় প্রভাব ছড়িয়ে ছিল। মনসুর যদিও কার্পণ্যের ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় ছিলেন, তথাপি নতুন রাজধানী নির্মাণের ব্যাপারে তাঁর স্বভাবের আমূল পরিবর্তন ঘটে। যথোপযুক্ত মূল্য দিয়ে তিনি পুরোহিতদের কাছে থেকে সমগ্র বাগদাদ খরিদ করে নিলেন। তারপর ফরমান পাঠিয়ে সিরিয়া, মুসেল, কোহিস্তান, কুফা ও ওয়াসেত থেকে বিখ্যাত সব কারিগরদের ডেকে আনলেন।

১৪৫ হিজরীতে মনসুর স্বহস্তে বাগদাদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তখন তিনি কুরআন শরীফের এই আয়াত পাঠ করেন ঃ

ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই সমগ্র পৃথিবীর মালিক আল্লাহতাআলা। তিনি তাঁর বান্দাদের থেকে যাকে ইচ্ছা করেন, তার ওপরে অধিকার দান করেন।

কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করা হল শহরের প্লান ঠিক করে দেবার জন্যে। হযরত ইমাম আবু হানিফা (র.)-কে মনসুর দেশের প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত করার জন্যে বারংবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু প্রতিবারেই ইমাম সাহেব সেই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। মনসুর তাই তাঁর ওপরে চটে গিয়ে রাজনির্দেশ অমান্যের শাস্তিস্বরূপ তাঁকে ডেকে এনে ইট গণনার কাজে নিযুক্ত করলেন। ইমাম সাহেব সানন্দে এই নগণ্য কাজ গ্রহণ করলেন এই ভেবেই যে, এতে আগের কাজের চাইতে দায়িত্ব অনেক কম।

মাটির নীচে ভিত্তির প্রশস্ততা পঞ্চাশ হাত এবং মাটির উপর থেকে মাত্র বিশ হাত প্রশস্ত প্রাচীর দাঁড় করানো হয়েছিল। পৃথিবীর ভেতরে এটাই হচ্ছে একমাত্র গোলাকার শহর। মনসুর শাহীপ্রসাদ ঠিক মধ্যস্থলে গড়ে তোলেন। উদ্দেশ্য এই যে, শহরের প্রত্যেক এলাকার লোকই খলীফার সাথে যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে সমান সুবিধা লাভ করবে।

১. বাগদাদ এলাকায় নওশেরোয়া বিচারকার্য পরিচালনার জন্যে একটা বাগান তৈরী করে দিয়েছিলেন। ফারসীতে বাগান হল 'বাগ' এবং ইনসাফ হল 'দাদ'। তাই এর নাম হয়েছে বাগদাদ।

শহর বেষ্টিত প্রাচীরের চারদিকে চারটি দরজা রয়েছে। এক দরজা থেকে অপর দরজার দূরত্ব এক মাইল। সৌধরাজির ভেতরে শাহীপ্রসাদ, জামে মসজিদ, কসরুজ জাহাব, কসরুল খুলদ প্রভৃতি অত্যন্ত শানদারভাবে গড়ে তোলা হয়েছিল, এর ভেতরে 'কুব্বাতুল খাজরা' নামক সবুজ গম্বুজটি সবার শিরোমনিরূপে বিরাজমান। এর উচ্চতা হল অন্যূন আশি গজ।

বাগদাদের যে এলাকা এভাবে নতুন করে গড়ে তোলা হল তার নাম দেয়া হল 'মদীনাতুস্ সালাম'। যদিও এ নাম জনসাধারণের ভেতর বেশী প্রচলিত ছিল না। তবুও সরকারী দফতরগুলোতে এ নামই জোরে শোরে ব্যবহৃত হতো।

মনসুর অত্যন্ত হিসাবী লোক ছিলেন। এমনকি এসব নির্মাণ কার্যের ব্যাপারে জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির কাছে পনের দিরহাম (৩৭৫) পাওনা হয়েছিল বলে তাকে কয়েদখানায় পাঠানো হয়েছিল। এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও যখন বাগদাদ শহর নির্মাণের পূর্ণ হিসাব শেষ হল, তখন দেখা গেল যে রাজকোষ থেকে দু'কোটি দিরহামই উধাও হয়ে গেছে।

এ তো গেল খলীফা মনসুরের সদ্য প্রতিষ্ঠিত বাগদাদের কথা। কিন্তু তারপর থেকে দিন দিন অতি দ্রুত এ শহর উন্নতির পথে ধেয়ে চলল। এমন কি কিছুদিনের ভেতরে বাগদাদ এতখানি বদলে গেল যে, আগেকার কোন চিহ্নই তাতে রইল না।

খলীফা মনসুরের উত্তরাধিকারী খলীফা মাহদী বাগদাদ শহরের সম্প্রসারণ ঘটান দজলা নদীর পূর্বতীরে। ফলে দজলা নদী চলে এল বাগদাদের মাঝখানে। তাই শহরটা তখন আরও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠল।

এরপর থেকে এই মুসলিম শহরটি বিস্ময়করভাবে দ্রুত উন্নতি করে রূপকথার সোনার স্বর্গপুরী হয়ে উঠল। প্রায় পাঁচশ বছর খলীফা, আমীর-উমরাহ ও বড় বড় ধনী ব্যবসায়ীদের নিত্য-নতুন তালে তালে শহরের নব নব রূপ ফুটে চলল।

খলীফা হারুন-অর-রশীদের উযীরে আযম জা'ফর বার্মেকী সৌধ নির্মাণে যা খরচ করলেন, খলীফা মনসুর সমগ্র বাগদাদ গড়ে যে খরচ করেছিলেন, তার সমান। বিলাসপ্রিয় খলীফা আমীন-অর-রশীদ দু'কোটি দিরহামেরও বেশি খরচ করে নতুন সৌধ তৈরী করিয়েছিলেন।

মামুন-অর-রশীদের সময়ে খাস শহরের অধিবাসীই ছিল দশ লাখের চাইতে বেশি। 'আসারুল দাওল'-এ লেখা হয়েছে যে, এককালে বাগদাদে ত্রিশ হাজার মসজিদ ও দশ হাজার হাম্মামখানা ছিল। ইতিহাসকার গীবন লিখেছেন যে, বাগদাদে আটশ ষাট জন ডাক্তার প্রাকটিস করার অনুমতি লাভ করত।

বাগদাদে বিখ্যাত সৌধগুলোর পরিচয় দিতে গেলে পৃথক একখানা বড় পুস্তক লেখা প্রয়োজন। তাই এ ব্যাপারে জানতে হলে পাঠকগণ যেন আমার 'ইমারাতুল ইসলাম' গ্রন্থখানা পাঠ করেন। তবে বিশ্ববিখ্যাত 'দারুস্ শাজারা' প্রসাদ সম্পর্কে গীবন সাহেব যখন তার বইতে কিছুটা উল্লেখ করেছেন, আমি বা তা ছেড়ে দেব কেন? আমিও তার মোটামুটি পরিচয় পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরব।

এই বিস্ময়কর অতুলনীয় প্রসাদটি খলীফা মুক্তাদির বিল্লাহ্ তৈরী করেন। তিনি ২৯৫ হিজরীতে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সৌধের বারান্দায় প্রশস্ত এক পানির কূপে একটা স্বর্ণনির্মিত বৃক্ষ ছিল। তাতে আঠারটি সোনা-রূপার শাখা ছিল। প্রত্যেকটি শাখায় অনেকগুলো প্রশাখা ছিল। প্রতিটি প্রশাখায় হরেক রঙের মনি-মুক্তা এমনভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল যে, সেগুলোকে সেই সোনার গাছের সোনার ফুল ও ফল বলে মনে হ'ত। নরম নরম ডালগুলোতে রঙবেরঙের পাখী এমনভাবে তৈরী করে বসিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, যখন হাওয়া দোলা দিয়ে যেত, সমস্ত গাছের শাখায় দুলে দুলে সেগুলো সুমধুর সুমধুর সুরে গান গাইতে থাকত।

সেই কূপের চারপাশে পনের জন কৃত্রিম অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। তাদের বহু মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদে ভূষিত রাখা হয়েছিল। স্বর্ণখচিত তরবারী ছিল তাদের প্রত্যেকের হাতে। আর তা এমনিভাবে ঘুরতে থাকত যে, দেখলেই মনে হ'ত একে অপরকে আক্রমণ করার জন্য পাঁয়তারা করছে।

দু'শ বছর মাত্র বাগদাদের খলীফাদের দোর্দণ্ড প্রতাপ অব্যাহত ছিল। তারপর থেকেই তাদের প্রতিপত্তি দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে। তবে সর্ব-সাধারণ মুসলমান নাগরিকদের জাঁক-জমক সেখানে দুর্ধর্ষ তাতারদের বর্বর হামলার পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তবুও খলীফার দরবারে এসে বিভিন্ন দেশের বহু শক্তিশালী রাজা-বাদশাহরা মাথা নত করে দিত। দুর্বল থেকে দুর্বলতর খলীফার দরবারে এসে দায়লাম ও সেলজুক শাসকদের

বীর মস্তক অবনত হ'ত। সুলতান মাহমুদ গজনভী যাঁর থেকে "ইয়ামীনুদৌলা" খেতাব লাভ করে মহাগৌরবান্বিত ভেবেছিলেন, তিনি বাগদাদের একজ ক্ষমতাহীন নামমাত্র খলীফা ছিলেন।

হাজার হাজার কবি, ধর্মবেত্তা ও গবেষক এবং বিভিন্ন বিষয়ের বিজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ দূর-দূরান্তর থেকে এসে বাগদাদের মাটিতে নিজেদের বিলীন করে দিয়েছেন। বাগদাদের গোরস্থানে ইসলামের যেসব গৌরব অস্তমিত হয়েছে, মহাকাল যুগ যুগ ধরে সাধনা চালিয়ে তাদের সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল।

ইমাম মূসা কাজেম, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল হযরত যুনায়েদ, হযরত শিবলী হযরত মা'রূফ কুরখী প্রমুখ যেসব মনীষীদের হারিয়ে মহাকালও আক্ষেপ করে মরেছে, তাঁদের মাজার এই মহানগরী বাগদাদে অবস্থিত।

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার দিক থেকে বিবেচনা করলেও দেখতে পাই যে, বাগদাদের যখন প্রায় ধ্বংসাবস্থা দেখা দিল, তখনও শহরের পূর্বভাগে ত্রিশটি বড় বড় কলেজ বিদ্যমান ছিল। ৫৮৭ হিজরীতে আল্লামা বিন জুবায়ের যখন সেখানে গেলেন, তখন তিনি কলেজের সুবৃহৎ সৌধগুলো বিস্তৃত এলাকা জুড়ে প্রতিষ্ঠিত দেখতে পেয়ে সেটাকে পৃথক একটা শহর বলে ভুল করেছিলেন।

পারস্যের বিখ্যাত কবি আনোয়ারী তাঁর এক কবিতায় রূপকথার শহর বাগদাদের এক চমৎকার বর্ণনা দান করেছেন।

রাজ্যের বিস্তৃতি

মামুন-অর-রশীদ এক সুদূর বিস্তৃত সাম্রাজ্যের শাহানশাহ ছিলেন। পূর্বে ভারত ও মঙ্গোলিয়া থেকে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত এই বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। মোটকথা, শুধুমাত্র স্পেনের উমাইয়া শাসিত রাজ্য ভিন্ন সমস্ত মুসলিম রাজ্যই মামুনের খিলাফতের আওতাধীন ছিল। ভারতের সীমান্ত এলাকার রাজ্যগুলোতেও মামুনের নামে খুৎবা পাঠ করা হ'ত। এমনকি বিশাল রোমক সাম্রাজ্যের শাহানশাহও তাঁকে কর দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

হারুন-অর-রশীদের যুগে গোটা সাম্রাজ্যের রাজস্ব ছিল বার্ষিক একত্রিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ। মামুনের খিলাফতের সময় তা আরও বেড়ে যায়। কয়েকটি বিখ্যাত জেলার ভিন্ন ভিন্ন রাজস্বের পরিমাণ আমি নকশা সহকারে উদ্ধৃত করছি। এগুলো স্বয়ং মামুনের সরকারী দফতর থেকে নেয়া হয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা হয়।

জেলা	বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ
সোয়াদ	দুই কোটি আটাত্তর লাখ দিরহাম ও দুইশত নজরাণী হলী (মহর তৈরীরর বিশেষ ধরনের মাটি)।
কাস্কর	এক কোটি ষোল লাখ দিরহাম
দজলা উপকূল	দুই কোটি আট লাখ ,,
হালোয়ান	আটচল্লিশ লাখ ,,
আহোয়াজ	পঁচিশ হাজর দিরহাম ও ত্রিশ হাজার রোতল চিনি।
পারস্য	দুই কোটি সত্তর লাখ দিরহাম, ত্রিশ হাজার রোতল গোলাব জল, শুষ্ক খেজুর বিশ হাজার রোতল।
কেরমান	বিয়াল্লিশ লাখ দিরহাম, ইয়ামানের কাপড় পাঁচ থান, বিশ হাজার রোতল খেজুর।
মাকরান	চার লাখ দিরহাম।

জেলা	বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ
সিন্ধু	এক কোটি পনের লাখ দিরহাম, ভারতীয় সুগন্ধি কাঠ দেড়শ রতল।
সীস্তান	চল্লিশ লাখ দিরহাম, বিশেষ ধরণের তিনশ থান কাপড়, বিশ বোতল কাণীজ।
খোরাসান	দুই কোটি আশি লাখ দিরহাম, চার হাজার ঘোড়া, এক হাজার গোলাম, বিশ হাজার থান কাপড়, ত্রিশ হাজার রতল হালীলা, দুই হাজার কাঁচা রূপা।
ভুর্জান	এক কোটি বিশ লাখ দিরহাম, এক হাজার শিক্কা রেশম।
কাওমাস	দশ লাখ দিরহাম, পাঁচ লাখ কাঁচা রূপা।
রে	এক কোটি বিশ লাখ দিরহাম ও বিশ হাজার রতল মধু।
তাব্রিস্তান, রোমান ও নেহাওয়ান্দ	তেষট্টি লাখ দিরহাম, ছয়শ' তাব্রিস্তানী বিছানা, দু'শ চাদর, পাঁচশ' থান কাপড়, রুমাল তিনশ, তিনশ' জামা।
হামদান	এক কোটি তের লাখ দিরহাম, বার হাজার রোতল মধু, এক হাজার রোতল রুব্বোর রুমায়েন।
বসরা ও কুফার মধ্যবর্তী জেলাগুলো	এক কোটি সাত লাখ দিরহাম।
মামীদান ও দানপুর	চল্লিশ লাখ দিরহাম।
শহরযোর	সাড়ে ষাট লাখ দিরহাম।
মোসেল	দু'কোটি চল্লিশ লাখ দিরহাম, দু'কোটি রোতল মধু।
আজারবাইজান	চল্লিশ লাখ দিরহাম।
জাজীরার জেলাসমূহ	তিন কোটি চল্লিশ লাখ দিরহাম, এক হাজার গোলাম, বার হাজার মশক মধু।
ফোরাত	বায়দস চাদর বিশখানা।
আর্মেনিয়া	এক কোটি ত্রিশ লাখ দিরহাম, বিছানা বিশখানা, যোক[illegible] ফল ত্রিশ রোতল, দশ হাজার রোতল মাসায়েহ সুরমা[illegible] দশ হাজার রোতল সোজ, দু'শ খচ্চর, ত্রিশটি ঘো[illegible] বাচ্চা।

জেলা	বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ
কন্নাসরীন	চার লাখ দিনার ও হাজার রোতল......।
দামেস্ক	চার লাখ বিশ হাজার দিনার।
উর্দুন	সাতানব্বই হাজার দিনার।
ফিলিস্তিন	তিন লাখ দশ হাজার দীনার, তিন লাখ রোতল......।
মিসর	উনিশ লাখ বিশ হাজর দিনার।
বোরকা	দশ লাখ দিরহাম।
আফ্রিকা	এক কোটি বিশ লাখ দিরহাম, একশ' বিশখানা বিছানা।
ইয়ামন	তিন লাখ সত্তর হাজর দীনার ও ইয়ামনের বিভিন্ন সম্পদ।
হেজাজ	তিন লাখ দীনার।

এ তো শুধু রাজস্বখাতে আদায় হ'ত। এ ছাড়া জিম্মিরা কর আদায় হ'ত। তার বিবরণ পরে দেব। সে সব খাতে বায়তুল মালে অর্থ সম্পদ জমা হ'ত তা চার প্রকার: রাজস্ব, মুসলিম আয়কর (ওশর), অমুসলিম আয়কর (জিযিয়া), যাকাত।

মামুন রাজস্ব, আয়কর ও যাকাতের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন আইন তৈরী করেন নি। এসব ব্যাপারে পূর্ববর্তী ন্যায়পরায়ণ খলীফারা যে নীতি ও পদ্ধতি প্রবর্তন করে গেছেন, তিনি তাই অনুসরণ করেছেন। তাই এ সবের বিশ্লেষণ দিতে গিয়ে প্রসংগত আমি মামুনের পূর্ববর্তী যুগের ওপরেও আলোকপাত করলাম। আশা করি পাঠক বন্ধুরা আমার এটাকে অপ্রাসংগিক মনে করবেন না।

হাঁ—এটা সত্যি কথা যে, নিছক রাজনৈতিক আলোচনার ভেতরে আমি ধর্মীয় প্রসংগ টেনে আনব না। যা কিছুই লিখব ইতিহাসকারের দৃষ্টি নিয়েই লিখব। ইউরোপের লেখকরা যেরূপ মুসলমানের প্রতিটি কার্যধারার ভেতরে খুঁজে খুঁজে ধর্মীয় সূত্র বের করার অপপ্রয়াস পেয়ে থাকে, আমি অবশ্যই তা করতে যাব না।

রাজস্ব ও ওশর জমাজমির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাপার। অবশিষ্ট দুটি ব্যবস্থা দু'ধরনের ট্যাক্স বই নয়। এ ধরনের মুসলমানদের দেয় অপরটি অমুসলিমদের ওপরে ধার্য করা হতো।

সন্দেহ নেই যে মামুন ও তাঁর পূর্ববর্তী আব্বাসীয় খলীফারা সাধারণ

রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ (স.) ও তাঁর পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রবর্তিত ব্যবস্থাকেই পথ-নির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই এ কথা জোরের সাথেই বলা চলে যে, মামুনের যুগেও যে ট্যাক্স বা আয়কর ব্যবস্থা চালু ছিল তা পূর্ববর্তী যুগেই প্রবর্তিত হয়েছিল। এখানে আমাকে এ কথাটা পরিষ্কারভাবে বলে দিতে হচ্ছে যে, ওশর, খেরাজ ও জিযিয়া ব্যবহারিক ভাষায় আদৌ ধর্মসংশ্লিষ্ট শব্দ নয়। তাই আমাদের এ ধোঁকায় পড়লে চলবে না যে, সেসব ব্যাপারে ফিকাহ্ শাস্ত্রে যা কিছু লিপিবদ্ধ হয়েছে তাই ধর্মসম্মত কিংবা পূর্ববর্তী খলীফা ও সুলতানগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত সেটাই।

নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, রসূলুল্লাহ্‌র (স.) যুগেই ওশর রাষ্ট্রীয় রূপ পেয়েছিল। তাই যখনই যেভাবে সুবিধা হয়েছে, ওশর, যাকাত, জিযিয়া সবই আদায় করা হয়েছে। কিন্তু এ দাবী করা ভুল যে, তিনি এসব ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন বিধি-ব্যবস্থা দিয়ে গেছেন যার ব্যতিক্রম করা কোন ক্ষেত্রেই চলবে না। রাষ্ট্রীয় অন্যান্য সাধারণ রীতি-নীতির মতই এ ব্যবস্থা সরকারের সুযোগ-সুবিধার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এই কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন খলীফা ও সুলতানের কার্যধারা এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের ও কালের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করেছে। এখন আমি খেরাজ ও ওশরের কয়েকটি নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা করব। রসূলুল্লাহ (স.) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এই নিয়ম-পদ্ধতিই অনুসৃত হয়েছিল। মামুনের যুগেও প্রায় এই নীতিই অব্যাহত ছিল।

১. যেসব ভূমি-প্রাকৃতিক ব্যবস্থামতেই সুজলা ও উর্বর। কিংবা,
২. যে ভূমি সৈন্যদের ভেতরে বন্টন করে দেয়া হয়েছে। কিংবা,
৩. যেসব এলাকার লোক সে এলাকায় যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় মুসলমান হয়েছে।

এই তিন অবস্থার ভূমি থেকেই 'ওশর' অর্থাৎ উহার আয়ের এক-দশমাংশ আদায় করা হবে এবং সেটাই হবে সেই ভূমির খেরাজ বা রাজস্ব।

এ তিন ধরনের ভূমি ছাড়া আর যেসব জমিজমা রয়েছে তা সবই খেরাজী (রাজস্ব ধার্য যোগ্য) হবে। হোক তা মুসলমানের অধিকারে কিংবা অমুসলমানদের। ওশরী জমিতে যদি কেউ এক বছর ফসল না

ফলায় তা হলে তা থেকে ওশর আদায় করা হবে না। তবে, খেরাজী জমিতে তা চলবে না। অবশ্য, খেরাজী জমি যদি কেউ এক বছর ফেলে রেখে পর বছর আবার চাষাবাদ করে তা হলে তাকে এক বছরেরই খেরাজ দিতে হবে। যে জমিতে দোকানপাট বসানো হয় তার ওপরে ওশর বা খেরাজ কিছুই ধার্য হবে না। যদি কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে কোন জমির ফসল নষ্ট হয়ে যায়, তা হলেও রাজস্ব বা ওশর মাফ হবে।

ওপরে যেসব ধরনের ওশরী জমির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার ভেতরে প্রথম দু'ধরনের ওশরী জমির পরিমাণ খুবই কম ছিল। হযরত উমর (রা.)-এর যুগে ইরাক এলাকার সব জমাজমির জরীপ হয়ে গিয়েছিল এবং সেগুলোর বিভিন্ন মালিকানায় রাজস্বের হারও নির্ধারিত হয়েছিল। সিরিয়া বিজয়ীরা অবশ্য খলীফাকে খুবই চাপ দিয়েছিল সেখানকার জমা-জমি তাদের ভেতরে বন্টন করে দেবার জন্যে। কিন্তু মহানুভব খলীফা কিছুতেই বিজয়ী মুজাহিদদের অনুরোধ রক্ষা করতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত তিনি শরীয়তের ফয়সালাই করলেন যে, পূর্বেকার মালিকদের কিছুতেই বেদখল করা চলবে না।

মিসরেও তিনি ফরমান পাঠিয়েছিলেন সৈন্যরা যেন জমির মালিক চাষী হতে না পারে। এই নির্দেশ অমান্য করে জনৈক সৈন্য কিছু জমি নিয়ে চাষাবাদ শুরু করায় খলীফা তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রেফতার করে এনে কঠোর শাস্তিদানে উদ্যত হলে সে বেচারা স্বীয় দোষ স্বীকার করে তওবা করল এবং ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে কোনমতে মুক্তিলাভ করল।

ওশর ও খেরাজের ব্যাপারে মুসলিম রাষ্ট্রে মুসলমান ও জিম্মীদের (অনুগত অমুসলমান) ব্যবস্থা প্রায়ই সমান। খেরাজী জমি যারই অধিকারে থাকে একই হারে রাজস্ব নেয়া হবে। ওশরী জমি সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ ও সুফিয়ান আস্ সওরীর অভিমত হল এই যে, যেহেতু এ বিশেষ কর নির্ধারণেও সর্বতোভাবে ভূমিই বিবেচ্য, তাই যে ধরনের ভূমিতে ওশর হবে, তা কোন জিম্মীর অধিকারে থাকলেও ওশরই আদায় করতে হবে। হযরত উমর (রা.) নাবাতী সম্প্রদায় থেকে ওশরই আদায় করবেন। ইমাম মালিক (র.) আম্মারে যদিও জিম্মীদের ব্যাপারে কিছুটা কড়াকড়ি ব্যবস্থার পক্ষে মত দিয়েছিলেন, তবুও তিনি এ ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদের সাথে একমত যে, যদি কোন জিম্মী কোন মুসলমান থেকে ওশরী জমি খরিদ করে, তা হলে তাকে ওশরই দিতে হবে।

খেরাজ বা ভূমি করের কোন নির্ধারিত হার ছিল না। তবে সাধারণ নীতি এই করে দেয়া হয়েছিল যে, তা কোন মতেই ভূমির আয়ের অর্ধেকের বেশি হতে পারবে না।

হযরত উমর (রা.) ইরাকের শহরতলী এলাকার সব জেলাগুলোই জরীপ করিয়েছিলেন। সেখানে তিন কোটি ষাট লাখ জরীব (পৌনে এক বিঘায় এক জরীব) জমি হয়েছিল। নিম্নহারে তার রাজস্ব ধার্য হয়েছিল ঃ

খেজুরের বাগান	প্রতি	জরীব	বার্ষিক	দশ	দিরহাম
আংগুরের ক্ষেত	,,	,,	,,	,,	,,
নীশকার	,,	,,	,,	,, ছয়	,,
গম	,,	,,	,,	,, এক দিরহাম ও ছা'শস্য	
যব	,,	,,	,,	,, ,, ,,	,,
তুলা	,,	,,	,,	,, পাঁচ দিরহাম	

মিসরে ভূমিকর প্রতি জরীব এক দীনার (পাঁচ টাকা) নির্দিষ্ট হয়েছিল। হযরত উমর (রা.)-এর নিযুক্ত মিসরের গভর্নর আমর ইবনুল আস লিখে দিয়েছিলেন যে, কোন ক্ষেত্রেই এর চাইতে বেশি কর ধার্য করা হবে না। তাই মিসরের সেই ব্যবস্থাকে স্থায়ী ব্যবস্থা বলে মনে করা চলে। তবে এই হারই চরম পর্যায়ের। হযরত উমর (রা.)-এর যুগে অধিকাংশ সময়ে এর পরিবর্তন দেখা গিয়াছে।

হযরত আলী (রা.) এ হার আরও হ্রাস করেছিলেন। যেসব এলাকার ভূমি ফোরাত নদীর পানিতে উর্বরা ছিল, নিম্নহারে সেসব জমির কর ধার্য করা হয়েছিল। তুলা, তিল, পেঁয়াজ, রসুন ও নানাবিধ তরকারির ক্ষেত থেকে সাধারণত ভূমিকর তুলে দেয়া হয়েছিল।

গমের উৎকৃষ্টতম ভূমি	প্রতি জরীব	বার্ষিক দেড় দিরহাম ও এক ছা'ফসল (পৌনে চার সের)
মধ্যম পর্যায়ের ভূমি	,,	,, এক দিরহাম
সাধারণ পর্যায়ের ভূমি	,,	,, ১/৩ দিরহাম
যব—প্রথম শ্রেণী	,,	,, ৩/৪ দিরহাম ও ১/২ ছা'ফল
,, মধ্যম শ্রেণী	,,	,, ১/২ দিরহাম
,, তৃতীয় শ্রেণী	,,	,, ১/৩ দিরহাম

প্রায় এ হারেই সমগ্র মুসলিম জাহানে ভূমিকর ধার্য করা হ'ত। এ ক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুসলিম সবাই সমান ছিল। অবশ্য সোয়াদ এলাকার জনসাধারণের আবেদনের প্ররিপ্রেক্ষিতে খলীফা মাহদী তাদের ভূমিকর অর্ধেক ধার্য করেছিলেন। মামুন তা আরও হ্রাস করে ২০৪ হিজরীতে ৫ অংশ করেন। এ ভাবে রাজস্ব হ্রাস করার মূলে দুটো কারণ ছিল। প্রথমত তখনও ইসলামের খলীফাদের ভেতরে মহানুভবতা বিদ্যমান ছিল এবং অর্থলিপ্সা তাদের পুরাদস্তর পেয়ে বসেনি। দ্বিতীয়ত, আরবের যেসব বীর সৈনিক ইসলামের স্বার্থে গোটা দুনিয়ার মানচিত্র ওলট-পালট করে দিচ্ছিল, তারা সবাই ছিল মরুভূমির নিঃস্ব ও সরল জনসাধারণ। তাদের অবস্থা তো এই ছিল যে, যদি তাদের কোন সেনাপতি কোন বিরাট সম্পদশালী কাফির অধিপতির সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে এক হাজার টাকা করদানের বিনিময়ে সন্ধির প্রস্তাব পেত, অমনি খুশি হয়ে তার প্রস্তাব মেনে নিত। যদি কেউ পাশ থেকে প্রশ্ন তুলত, মাত্র এক হাজর টাকার বিনিময়ে এত বড় সম্পদশালী অধিপতির সন্ধির প্রস্তাব মেনে নিলেন? সে জবাব দিত ঃ বল কি? এক হাজারের ওপরেও কোন সংখ্যা আছে নাকি?

এরূপ ক্ষেত্রেও খুলাফায়ে রাশেদীন সাধারণ নীতি ঘোষণা করেছিলেন যে, যদি কোন মুসলমান অন্য কোন জাতির সাথে কোন ভুল শর্তও করে থাকে, তা হলে খলীফার পক্ষে তা মেনে নেয়া অপরিহার্য হবে।

দেশ জয়ের ইতিহাস খুলে দেখুন। অসংখ্য নিদর্শন পাবেন যে, সরলপ্রাণ মুসলিম সেনানায়করা ইরান, আর্মেনিয়া, মিসর, সিরিয়া প্রভৃতি এলাকায় অতি অল্প করের বিনিময়ে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেছেন এবং তৎকালীন খলীফা তাঁদের সেই চুক্তিই বহাল রেখেছেন। বনু উমাইয়া এবং আব্বাসীয় খলীফারা তা থেকে কিছুটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাও সেসব এলাকার উৎপাদনের তুলনায় অনেক কমই বিবেচিত হবে।

যাকাত শুধু মুসলমানদের ওপরই ধার্য হ'ত। সোনা, রূপা, উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি সব কিছুরই ভিন্ন ভিন্ন হারে যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। মূলত, এ একটা গুরুতর ট্যাক্স যা ইসলাম শুধু মুসলমানদের ওপরেই অপরিহার্য করে দিয়েছে।

পক্ষান্তরে অমুসলিমদের ওপরে ধার্য হ'ত জিযিয়া কর। তা ছিল খুবই নগণ্য ট্যাক্স। যাকাতের তুলনায় তাতো কিছুই নয়। অথচ, আশ্চর্য যে,

অমুসলিমরা মুসলমানদের জাতি বিদ্বেষী ও সাম্প্রদায়িক নামে অভিযুক্ত করার জন্যে এ জিযিয়া কর নিয়া খুবই হৈ চৈ করে থাকে। এই নগণ্য ট্যাক্সের প্রশ্নে ইউরোপীয় লেখকরা মুসলমানদের ওপরে খড়গহস্ত হয়ে উঠেন এবং তাদের চরম অন্তর্দাহ শুরু হয় অথচ এই কর মাথাপিছু অতিরিক্ত মাত্র বার টাকা ধার্য হ'ত বছরে। আর এই কর কেবল মস্তবড় ধনীদের ওপরেই ধার্য হ'ত। মাঝারী অবস্থার লোকের ওপরে বার্ষিক ছয় টাকা এবং সাধারণ অবস্থার লোকের ওপরে বার্ষিক মাত্র তিন টাকা জিযিয়া কর ছিল। তাও এই শর্তে যে, তাদের আদায় করার মত ক্ষমতা থাকা চাই। এর উপরে আবার সরকারের ইচ্ছার ওপরেই এটা কম করে ধার্য করা কিংবা একেবারেই মাফ করে দেয়ার অধিকার ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া নাবালেগ, বৃদ্ধ, নারী, অচল, ল্যাঙা, অন্ধ ইত্যাদির উপর কখনও জিযিয়া কর ধার্য হ'ত না।

কখনও আবার মাথাপিছু না হয়ে ঘরপিছু জিযিয়া কর ধার্য হ'ত। কখনও সেই নির্ধারিত হারে অর্থাৎ এক দিনার কিংবা তার চাইতেও কম আদায় করা হ'ত। অথচ এই সামান্য করের বিনিময়ে মুসলিম সরকারের ওপরে অমুসলিমদের জান-মালের পূর্ণ নিরাপত্তার দায়িত্ব ফরজ করে দেয়া হয়েছে।

এসব বিভিন্ন ধরনের আয়ের ভেতরে যাকাত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল অসহায়, অচল, ভিক্ষুক, রাহাগীর ইত্যাকার অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করা। যাকাতের শর্তই হল মুসলমানদের থেকে আদায় করে মুসলমানদের ভেতরে ব্যয় করতে হবে। কিন্তু এ ছাড়া আরও যে বিভিন্ন ধরনের সদকা-খয়রাত মুসলমানদের দেয়, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবার ভেতরেই সমানভাবে বন্টন করা হ'ত। স্বয়ং হযরত উমর (রা.) দুস্থ খৃস্টানদের জন্যে দামেশক সফরের সময়ে বায়তুল মালের এই খাত থেকে ভাতা নির্ধারণ করে দিয়ে ছিলেন।

আরেক স্থানে তিনি বায়তুল মালের দারোগাকে বলে পাঠিয়েছিলেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী—"সদকা ফকীর ও মিসকীনদের জন্যে" যাতে য়াহুদী ও খৃস্টানদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অবশিষ্ট খেরাজ, ওশর ও জিযিয়া জনকল্যাণমূলক কাজে সাধারণভাবে ব্যয়িত হ'ত। সড়ক নির্মাণ, পুল তৈরী, চৌকিদারের বেতন, শিক্ষাদীক্ষা

ইত্যাদি খাতে সেসব ব্যয় হ'ত। দেশরক্ষা খাতেও এই সাধারণ তহবিল থেকে ব্যয় করা হ'ত।

মামুন-অর-রশীদ সাধারণত মহানুভব মুসলিম খলীফাদের সরকার রাজস্ব ও ট্যাক্সের ব্যবস্থা এরূপ ছিল। ইনকাম ট্যাক্স, ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স, শিক্ষা কর, পথ কর, চৌকিদারী ট্যাক্স, স্টাম্প ইত্যাদি নামে অজস্র ধরনের ট্যাক্সের সাথে তাঁরা আদৌ পরিচিত ছিলেন না।

নিয়মিত সৈন্য ছিল অশ্বারোহী ও পদাতিক মিলে দু'লাখ। অশ্বারোহীদের মাসিক বেতন পঁচিশ টাকা ও পদাতিকদের মাসিক বেতন ছিল দশ টাকা মাত্র। সেনাপতি ও বিভাগীয় সেনানায়কদের বেতনও খুব বেশী ছিল না। তবে এশিয়ার দেশসমূহের পদস্থ ব্যক্তিরা বেতন-ভাতার চেয়ে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান ও কৃতিত্ব উপলক্ষে বড় বড় পুরস্কারের প্রতিই বেশী অনুষ্ঠান ও কৃতিত্ব উপলক্ষে বড় বড় পুরস্কারের প্রতিই বেশী অনুরক্ত ছিল। মামুনের মত মহানুভব খলীফা তো এসব ব্যাপারে ছিলেন মুক্তহস্ত।

আবদুল্লাহ্‌ বিন তাহেরকে তিনি একদিন পাঁচলাখ দিরহাম পুরস্কার দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রের অন্যান্য পদস্থ ব্যক্তিদের ভেতরেও শুধু উজীরে আযম যু'রিয়াসাতাইনের বেতন কিছুটা বেশী ছিল। অর্থাৎ তিনি মাসিক ত্রিশ লাখ দিরহাম পেতেন।

সৈন্য বিভাগের প্রধান ব্যক্তিই যে প্রধান সেনাপতি থাকবে সর্বদা, এরূপ কোন ব্যবস্থা ছিল না। প্রয়োজনে খলীফা যে কেউকে যে কোন সময়ের জন্যে প্রধান সেনাপতিত্ব দান করতেন। কখনও গভর্নর বা গভর্নর জেনারেল কিংবা প্রধান কাজী প্রধান সেনাপতি হতেন। ইয়াহিয়া ইবনে আক্তাম প্রধান কাজী ছিলেন। মামুন কয়েকবার তাঁকে প্রধান সেনাপতি করেছিলেন। আদপে, সে যুগে সব মুসলমানই ছিল কুশলী যোদ্ধা। তাই, কেউ মসীজীবী হলেও অসি চালনায় অযোগ্য বিবেচিত হ'ত না।

আরেক ধরনের অনিয়মিত সেনাবাহিনী ছিল। তাদের বলা হত ভলান্টিয়ার। সে ধরনের সৈন্যের প্রয়োজন অনুসারে সংখ্যা বাড়ানো বা কমানো যেত। তা ছাড়া জরুরী পরিস্থিতিতে তো সারা দেশে জিহাদের জন্যে সাজ সাজ রব পড়ে যেত। অনিয়মিত সৈন্যদের অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্রও সরকার থেকে দেয়া হ'ত। এই উদ্দেশ্যে শাহী অস্ত্রাগারে প্রভূত পরিমাণে সমরোপকরণ মওজুদ রাখা হ'ত।

হারুন-অর-রশীদের মৃত্যুর পরে ১৯৩ হিজরীতে যখন শাহী অস্ত্রাগারের হিসাব নেয়া হল, তখন তাতে নিম্নবর্ণিত অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল ঃ

মজবুত স্বর্ণখচিত তরবারি—১০ হাজার
সাধারণ তরবারি—৫০ হাজার
নেযা—একলাখ পঞ্চাশ হাজার
কামান—একলাখ
স্বর্ণখচিত মজবুত বর্ম—এক হাজার
সাধারণ বর্ম—এক হাজার
ঢাল—দেড় লাখ
লৌহশিরস্ত্রাণ—বিশ হাজার
জৌশন—বিশ হাজার
স্বর্ণখচিত জীন পোষ—চার হাজার
সাধারণ জীন পোষ—ত্রিশ হাজার

যুদ্ধ জাহাজের প্রচলন আবদুল মালিক ইবনে মারোয়ানের সময়ে (মৃত্যু ৮৬ হিঃ) থেকেই চলে আসছিল। তাঁর সময়ে হাসান বিন নোমানের (আফ্রিকার গভর্নর) উদ্যোগে তিউনিসিয়ায় যুদ্ধ জাহাজ ও তার উপকরণ তৈরীর জন্যে একটা সুদৃঢ় কারখানা স্থাপন করা হয়েছিল। মামুনের যুগে তা চরম উন্নতি লাভ করে। এই কারখানার সৃষ্ট একশ জাহাজ ও বিবিধ উপকরণের সাহায্যে মামুন সিসিলী অভিযান চালিয়েছিলেন। সেখানে অগ্নি নিক্ষেপণের জন্যেও এক ধরনের ছোট ছোট জাহাজ তৈরী করা হ'ত। তৈল ও বিগলিত শীশার সাহায্যে অগ্নি সৃষ্টি করে সেগুলো থেকে শত্রু জাহাজে অগ্নি নিক্ষেপ করা হ'ত। সেই আগুন যদি কোন জাহাজ স্পর্শ করত, তা হলে সমুদ্রের পানিও তা নেভাতে সমর্থ হ'ত না।

দেশের শাসনব্যবস্থা

আজও আব্বাসীয় খেলাফতের উন্নয়ন ও বিস্তৃতি, শান্তি ও শৃঙ্খলার কথা যেভাবে রূপকথার মত জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করে রয়েছে তার মূলে রয়েছে হারুন-অর-রশীদ ও মামুন-অর-রশীদ। ব্যবসা-বাণিজ্যে তাঁদের সময়ে ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা। কোন দেশের ব্যবসায়ীদেরই কোনরূপ কর দিতে হ'ত না, অসুবিধা ছিল না কোন ব্যাপারে। নতুন নতুন শহর ও বাজারের পত্তন হতো দিন দিন। প্রতিটি গলি ও গ্রামে সে এলাকার শাসক, জমিদার ও জায়গীরদাররা নিজেদের খরচে নদী ও খাল কেটে স্ব-স্ব এলাকাকে সুজলা সুফলা করে তুলতেন।

মামুন স্বয়ং বড় বড় জেলাগুলো ঘুরে বেড়াতেন এবং প্রত্যেক এলাকায় দু'চারদিন থেকে প্রয়োজনীয় সবকিছু ব্যবস্থা সম্পাদন করতেন। ২০২ হিজরীতে তিনি যখন মার্ভ থেকে ইরাকে যাচ্ছিলেন, পথে তুস, হামদান' জুর্জান, নহরওয়ান, রে এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য জেলাগুলোয় সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে অবস্থান করেছিলেন এবং দেশের প্রকৃত অবস্থা যথাযথ-ভাবে জেনে নিয়েছিলেন। আল্লামা মোকরিজী তাঁর রচিত 'কিতাবুল খুতওয়াল আসার' গ্রন্থে লিখেছেন যে, মামুন যখন মিসর এলাকায় সফর করলেন, তখন প্রতি গ্রামে তিনি অন্যূন একদিন ও একরাত অবস্থান করে-ছিলেন। 'তাউন্ নমল' নামক স্থানে পৌঁছে তিনি সে নিয়ম রক্ষা না করে এগিয়ে চললেন। এই গাঁয়ের কর্তা ছিল এক অশীতিপর বৃদ্ধ। সে এই খবর শুনেই ছুটে গেল মামুনের কাছে এবং আরজ করল —এই বঞ্চনা শুধু আমারই অদৃষ্টে লেখা হল কেন? মামুন দ্বিরুক্তি না করে তক্ষুণি তার আতিথেয়তার আশ্রয় নিলেন। সেও তার ক্ষমতা অনুসারে মেহমানদারী করল। বিদায়ের সময় সে দশটি আশরাফী (স্বর্ণমুদ্রা) পূর্ণ থলে মামু-নের কাছে নজরস্বরূপ পেশ করল। মামুন বিস্মিত হয়ে বললেন ঃ কেন তুমি এই কষ্ট স্বীকার করতে গেলে? এসব নেয়া তো আমার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কাজ।

বৃদ্ধ জবাব দিল—সোনা তো আমাদের জমিতেই জন্ম নিয়েছে, তাই আমাদের কাছে এগুলোর তেমন কোন মূল্য নেই। হুযুরের খেদমতে যা কিছু হাজির করলাম এর চেয়ে ঢের ঢের বেশী স্বর্ণমুদ্রা আমার কাছে মওজুদ রয়েছে।

এর থেকে অনুমান করা যায় যে, মামুনের সময়ে দেশে স্বাচ্ছল্য ও শৃঙ্খলা কতখানি ছিল।

দেশের প্রত্যেক অঞ্চলে অক্ষম, অভাবগ্রস্ত, বিধবা, এতীম ইত্যাদি সব গরীব ও দুস্থদের খাওয়া-পরার সুবন্দোবস্ত ছিল। তারা রাজভাণ্ডার থেকে প্রতিমাসে যথাসময়ে তাদের নির্দিষ্ট ভাতা পেত। রাষ্ট্রের এটা ছিল অন্যতম মূলনীতি যে, দেশের কেউ যদি দারিদ্র্যের অভিযোগ তোলে, তা হলে হয় তাকে চাকুরী দিতে হবে, নতুবা 'বায়তুল মাল' থেকে ভাতা মঞ্জুর করতে হবে।

খোরাসানে থাকা কালে মামুন শাসনকার্যে যে উদাসীন্য দেখিয়েছিলেন জীবনভর তাঁকে তার জের টানতে হয়েছিল। এই বাগদাদে এসে তার শাসনপদ্ধতি আমূল পরিবর্তিত হল। এখানে এসে প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার ও দেশের সাধারণ অবস্থা জানার জন্যে তাঁর ঔৎসুক্য এতই বেড়ে গেল যে, তা শুনলে অবাক হতে হয়। সতেরশ' বৃদ্ধকে তিনি নিয়োজিত করলেন শহরের আনাচে কানাচের সব খবরা-খবর এনে দেবার জন্যে। একমাত্র মামুন ছাড়া দুনিয়ার আর কোন প্রাণী তাদের নাম-ধামের কোন খবর রাখত না। প্রত্যেক বিষয়ের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন সি, আই, ডি, বিভাগ খোলা হয়েছিল। দেশের কোন উল্লেখযোগ্য ব্যাপারই তাদের চক্ষু থেকে এড়িয়ে যেতে পারত না। আশ্চর্য যে, এতকিছু সত্ত্বেও মামুন সন্দেহপ্রবণতার ব্যাধি থেকে একেবারেই মুক্ত ছিলেন এবং দেশের জনসাধারণের বিন্দুমাত্র স্বাধীনতাও তার ফলে ব্যাহত হয়নি। তাঁর জীবন ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠা খুলে দেখুন, প্রতিটি শব্দ বিশ্লেষণ করে অধ্যয়ন করুন, একটা ঘটনাও এরূপ পাবেন না যাতে করে তাঁর কার্যের বিন্দুমাত্র বিরূপ সমালোচনা করা চলে। পরন্তু, তাঁর শাসনকাল ছিল মহানুভবতার অজস্র নিদর্শনপূর্ণ।

একদা মামুনের এক সিপাই এক ব্যক্তিকে অমূলক সন্দেহবশে গ্রেফতার করায় সে চিৎকার করে বলে উঠল—"হায় উমর!" মামুন এ খবর পেয়ে তাকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন—হযরত উমর (রা.)-এর ন্যায়বিচার কি তোমার স্মরণে এল? সে জবাব দিল, হাঁ। মামুন ভাবাবেগে উদ্বেলিত হয়ে বললেন—"আল্লাহ্‌র কসম"! আমার প্রজারা যদি হযরত উমরের যুগের জনসাধারণের মত হ'ত তা হলে আমি তার চাইতে বেশী ছাড়া কম ন্যায়পরায়ণ হতাম না।" এ কথা বলেই তিনি সে ব্যক্তিকে বেশ কিছু পুরস্কার দান করলেন। পক্ষান্তরে সিপাইটিকে বরখাস্ত করলেন।

একদা এক ব্যক্তি তার জন্যে বায়তুল মাল থেকে ভাতা মঞ্জুর করার জন্য প্রার্থনা জানাল। মামুন তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার ছেলেপিলে কতজন? সে ওদের সংখ্যা বাড়িয়ে বলল। মামুন যেহেতু শহরের প্রতিটি মানুষের খবরা-খবর রাখতেন, তাই তার এ চালবাজি ব্যর্থ হল। এর কিছুদিন পরে সে ব্যক্তি আবার তার পরিবারের জনসংখ্যার সঠিক হিসাব দিয়ে দরখাস্ত করল। এবারে মামুন তার দরখাস্ত মঞ্জুর করলেন। প্রতি রবিবার তিনি সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সর্বসাধারণ দরবার বসাতেন। সর্বসাধারণ সেখানে অবাধে গিয়ে তাদের অভাব অভিযোগের কথা খলীফাকে জানাত। সেখানে দেশের সবচাইতে দুর্বল ব্যক্তি গিয়েও নাগরিক অধিকারেও প্রশ্নে শাহী খান্দানের যে কোন লোকের সাথে সমতা বজায় রাখতে সমর্থ হ'ত।

একদা বিপর্যস্ত অবস্থার এক বৃদ্ধ নিজে গিয়ে খলীফার কাছে অভিযোগ পেশ করল যে, এক অত্যাচারী ব্যক্তি তার সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছে। মামুন জিজ্ঞেস করলেন—কে নিয়েছে? কোথায় থাকে সে?

বৃদ্ধ অংগুলি সংকেতে জানাল—আপনারই পাশে আছে। মামুন পাশ ফিরে দেখল যে, তাঁরই পুত্র আব্বাস বসে আছে। অমনি তিনি উজীরে আযমকে নির্দেশ দিলেন—শাহযাদাকে বৃদ্ধের সাথে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে উভয়ের এজাহার ও জবানবন্দী শুনুন।

তাই করা হল। শাহযাদা লজ্জাবনত মস্তকে ধীরে ধীরে কথা বলাছিল। কিন্তু বৃদ্ধ চীৎকার দিয়ে দরবার মাতিয়ে তুলছিল। উজীরে আযম বৃদ্ধকে সংযতভাবে কথা বলার জন্যে নির্দেশ দিয়ে বললেন যে, খলীফার দরবারে এরূপ চীৎকার করে কথা বলা অসংগত।

মামুন তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়ে বললেন—না, না। বৃদ্ধ যেভাবে চায় সেভাবেই তার বলার অধিকার রয়েছে। তাকে স্বাধীনভাবে বলতে দিন।

সত্য তার কণ্ঠকে উচ্চ করে দিয়েছে এবং আব্বাসকে বোবা করে ফেলেছে। শেষে মামলার রায় বৃদ্ধের পক্ষেই গেল। তার সম্পত্তি তাকে ফিরিয়ে দেয়া হল।

মামুনের স্বাধীন স্পৃহা তার কর্মচারীদেরও স্বাধীন ও নির্ভীক করে দিয়েছিল।

একবার এক ব্যক্তি কাজীর দরবারে মামুনের বিরুদ্ধে ত্রিশ হাজার টাকা দায়ধার্য করে এক একটা মামলা দায়ের করল। কাজীর নির্দেশে তার জবাবদিহীর জন্যে মামুনকে তাঁর এজলাসে হাজির হতে হল। মামুনের সেবক বসার জন্যে একখানা মূল্যবান গালিচা বিছিয়ে দিল। কাজী তৎক্ষণাৎ মামুনকে জানিয়ে দিলেন—এখানে আপনার আর বিবাদীর মর্যাদা সমান।

মামুন এতে বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্ট হলেন না। পরন্তু, কাজীর বেতন অনেক বাড়িয়ে দিলেন।

মহানুভব মামুনের যদি বিরূপ সমালোচনা করার কিছু থাকে তা হল এই যে, তাঁর মহানুভবতা কখনও কখনও সীমা ছাড়িয়ে যেত। ফলে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত মর্যাদা ও অধিকার অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুণ্ণ করে ফেলতেন। কুৎসারচক কবিরা তাঁর নিন্দাগাঁথা রচনা করে বেড়াত। অথচ, তিনি তাতে মোটেও বিরক্ত হতেন না। এমনকি ভৃত্যরা তাঁর সাথে বেয়াদবী করত নিঃসংকোচে। সেদিকে তিনি আদৌ ভ্রূক্ষেপ করতেন না।

ও'বাল নামক এক কবি তাঁর কুৎসাপূর্ণ একটা কবিতা লিখেছিলেন। তা থেকে দুটি লাইন তুলে দিচ্ছি ঃ

سماو بذكرك بعد طول خموله
واستنقذوك من الحضيض الاوهد

(শামুন ওয়া বিযিকরিকা বা অদা খমুলিহী
ওয়াস্তানদুকা মিনাল খবীবিল আহওয়াদি।)

অর্থাৎ ঃ অখ্যাত তোমার সত্তা বিখ্যাত করেছে জাতি মম
তুলেছে মর্যাদাশীর্ষে যদিও ছিল তা নীচতম।

মামুন যখন এ কুৎসা রচনা শুনলেন, ও'বালকে ডেকে শুধু এতটুকু বললেন—ও'বাল! এরূপ মিথ্যা কথা বলতে তোমার লজ্জা হল না? আমি অখ্যাত ছিলাম কখন? আমি শাহী-খান্দানে জন্ম নিয়ে শাহী

পরিবারের বুকের স্তন্য পান করে মানুষ হয়েছি।

একদা মামুনের চাচা ইবরাহীম অভিযোগ আনলেন যে, ও'বালের কুৎসা প্রচার এখন সীমা ছাড়িয়ে চলছে। আমার নামে এরূপ কুৎসাপূর্ণ কবিতা সে কয়েকটা লাইন পাঠ করে মামুনকে শোনালেন। মামুন বললেন—চাচাজান! ও'বাল তো আমার কুৎসা এর চাইতেও মারাত্মক-ভাবে বর্ণনা করেছে—আমি যখন তাকে ক্ষমা করতে পেরেছি, আশা করি আপনিও পারবেন।

মোট কথা, ও'বালের এসব জঘন্য কার্যে সারা শহরের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল। আবু সাইদ মাখযুমী কয়েকবার মামুনকে তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার প্রয়াস পেয়েছিল। মামুন তাকে এই বলে বুঝালেন যে, যদি এর যোগ্য প্রতিফল দিতে চাও, তা হলে তুমিও তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় প্রবৃত্ত হও। তবে আমার কথা হল এই যে, তার বিরুদ্ধে লেখনী চালালে শুধু এতটুকুই লিখবে যে, ও'বাল যা বলছে তা ভুল।

মামুন প্রায়ই বলতেন যে, ক্ষমা করায় আমি এত আনন্দ পাই যা লোকে জানতে পারলে দলে দলে জুটে সবাই আমার কাছে অপরাধ ও নাফরমানীর সওগাত নিয়ে হাজির হ'ত।

বিভিন্ন সময়ে উযীর, শাহী খান্দানের লোক, শাসনকর্তা ও কর্ম-চারীদের বিরুদ্ধে জনসাধারণ যেসব অভিযোগ উত্থাপন করে দরখাস্ত দিয়েছিল, মামুন সেগুলো সম্পর্কে অভিযুক্তদের কাছে স্বয়ং ফরমান লিখে গেছেন। তার ভেতর থেকে কয়েকটি মাত্র আমি এখানে তুলে দিচ্ছি। আবেদনপত্র জানার আমার তেমন প্রয়োজন নেই। তবে কার বিরুদ্ধে ছিল এবং মামুন তার ওপরে কি ফরমান জারী করেছেন তাই উদ্ধৃত করছি।

অভিযুক্ত ব্যক্তি	ফরমান
হেশাম	যতক্ষণ পর্যন্ত একটি মানুষও তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার দরবারে প্রবেশের অধিকার তোমার আদৌ নেই।
ইবনে হেশাম	সম্ভ্রান্ত লোকদের কাজ হল বড়দের দাবিয়ে রাখা এবং ছোটদের কাছে নিজেকে দাবিয়ে রাখা। তুমি কোন শ্রেণীর লোক?

অভিযুক্ত ব্যক্তি	ফরমান
আবু ইবাদ	হে আবু ইবাদ! ন্যায় ও অন্যায়ের ভেতরে কোনই সম্পর্ক নেই।
আবু ঈসা (মামুনের ভাই)	اذا نفخ فى الصور فلا انساب بينهم অর্থাৎ—যখন শিংগা ফুঁকবে, তখন সব অহংকারের বাঁধন ছিন্ন হয়ে চলবে।
হামীদ তুসী	হে হামীদ ! দরবারের নৈকট্য লাভ করে ভুলে যেও না যে, ইনসাফের ক্ষেত্রে তুমি আর সাধারণ একজন ভৃত্য সমান।
ইবনুল ফজল তুসী	তোমার অভদ্রতা ও রুক্ষ স্বভাব তো আমি সহ্য করে নিয়েছি। তা বলে জনসাধারণের ওপরে তোমার এসব অত্যাচার তো আর সহ্য করা চলে না।
আমর বিন মাসআদা	হে আমর ! নিজ এলাকাকে ইনসাফ দ্বারা গড়ে তোল। অত্যাচার দ্বারা তা ধ্বংস করতে বসেছ।

এখানে আমি যখন মামুনের ন্যায়পরায়ণতার বিবরণী শোনাচ্ছি তখন তার পাশাপাশি তার সময়কার বিদ্রোহগুলোর ওপরেও আমি একবার সূক্ষ্ম দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়া আবশ্যক মনে করি। কারণ, সাধারণত ন্যায়পরায়ণতা ও বিদ্রোহ একত্রিত হতে পারে বলে মানুষের মনে ধারণা আসতে চায় না।

বলা বাহুল্য, মামুনের জীবনের বেশির ভাগ ব্যয়িত হয়েছে বিদ্রোহ দমনের কাজে। কিন্তু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যায় যে সেসব স্বাভাবিক অনিবার্য ঘটনা বই নয়। কারণ, সেসব ক্ষেত্রেও তাঁর পক্ষ থেকে কোনরূপ অবিচারমূলক কাজ পরিলক্ষিত হয় না। সব সময়ই তিনি ছিলেন অন্যায় ও অবিচার উর্ধ্বে।

হারুন-অর-রশীদের দরবারে পরস্পর বিরোধী দুটি গোত্র বিরাজ করত। আরব গোত্র ও ইরানী গোত্র। মামুন ও আমীনের সময়ে তারা দুদিকে ভাগ হয়ে গেল। কারণ, মামুন ছিলেন মাতুলের দিক

থেকে ইরানের রক্তে সৃষ্ট। মীরাসী সূত্রে তিনি অনারব এলাকাই পেয়েছিলেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রীও ছিল জনৈক অনারব (ইরানী) মজুসী (নও মুসলিম)। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণত তিনি আরবদের সহানুভূতি পেতে পারেন নি। তাই আমীনের সাথে যখন তাঁর যুদ্ধ শুরু হল, তিনি সর্বতোভাবেই সাহস হারিয়ে বসেছিলেন। কিন্তু তাঁর সুদক্ষ উযীর যুরিয়াসাতাইনের বিজ্ঞজনোচিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত তিনি জয়ী হন।

যুরিয়াসাতাইনের এই উপকারের কৃতজ্ঞতা আদায়ের ক্ষেত্রে মামুন মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেন। তাকে তিনি খিলাফতের সর্বময় কর্তৃত্ব দান করলেন। এতে আরবরা আরও বিগড়াল। যেখানে যা কিছু বিদ্রোহ সৃষ্টি হল, তার অধিকাংশের মূলেই ছিল যুরিয়াসাতাইন। অথচ সে মামুনকে দেশের প্রকৃত অবস্থা থেকে এমনভাবে অন্ধকারে রাখল যে মামুন কিছুতেই তা জানতে পারলেন না।

সা'দাতরা তো খিলাফতকে ভাবত তাদের চির অধিকারের বস্তু। সব সময়ে তারা তাই সেটাকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে সচেষ্ট থাকত এবং সুযোগ পেলেই গোটা খিলাফত তোলপাড় করে ফেলত। এ অবস্থায় দেশবাসী আব্বাসীয় খলীফাদের সহানুভূতি আশা করত তাদের দৌরাত্মের হাত থেকে বাঁচার জন্যে। কিন্তু মামুন হযরত আলী রেজাকে ভাবী খলীফা হিসাবে মনোনয়ন দান করে তাদের সে আশার গুড়ে বালু ঢেলে দিলেন। ফলে প্রশ্রয় পেয়ে যুগ যুগ ধরে তারা বিদ্রোহ অব্যাহত রেখে চলল। সেটা বেশি দীর্ঘ হয়ে চলল এই কারণে যে, মামুন তাদের বিরুদ্ধে মোটেও কঠোরতা অবলম্বন করতে সমর্থ হন নি ! একে তো তিনি ছিলেন কোমলপ্রাণ মানুষ, তার ওপরে তাঁর ভেতরে শিয়াদের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। ফলে, তিনি সা'দাতদের প্রতি খুবই অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাদের বারবার পরাস্ত করেও ক্ষমা করে দিতেন প্রতিবারেই। এর ফলেই তারা দীর্ঘ দিন ধরে তাদের বিদ্রোহাত্মক কার্যাবলী জোরদারভাবে চালিয়ে যেতে সমর্থ হয়।

এ ছাড়া আর যেসব বিদোহ সংঘটিত হয় তা এমন সব বিদ্রোহ যা সাধারণত রাজতন্ত্রের ভেতরে দেখা দিয়ে থাকে। এশিয়ায় এমন কোন দেশ নেই যেখানে এ ধরনের বিদ্রোহ আমরা সচরাচর ঘটতে দেখি না। আমাদের এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, সে যুগে প্রজাদের থেকে কেড়ে

কিছু নেবার কোন আইন ছিল না। তাই সরকার ও জনসাধারণের ক্ষমতার ভেতরে তেমন পার্থক্য ছিল না।

এ ব্যাপারের সাথে আরও একটা কথা জুড়ে নিয়ে বিবেচনা করতে হবে যে, যারা বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উঁচু করেছিল তাদের অধিকাংশই ছিল আরব গোত্রের লোক। তারা তো আজ পর্যন্তও অপরের আনুগত্য মেনে নিতে অভ্যস্ত নয় বলেই স্বাধীন থেকে চলছে। ভবিষ্যতেও হয়ত তারা এভাবে স্বাধীন জীবন যাপন করে চলবে।

হয়ত কেউ এ অভিযোগ তুলতে পারে যে, যে যুরিয়াসাতাইনের বদৌলতে মামুন প্রায় হারানো রাজ্য এমনকি খিলাফতের অধিকারী হলেন অথচ স্বয়ং মামুনের ইংগিতেই তাকে হত্যা করা হয়েছিল। আমি তদুত্তরে বলব যে, এ ছাড়া মামুনের করবারই বা কি ছিল? যুরিয়াসাতাইন কিছুতেই তার সর্বময় কর্তৃত্বের মোহ ছাড়তে পারছিল না, আর আরবরাও তার কাছে মাথা ঝুঁকাতে পারছিল না। অবস্থা এই দাঁড়িয়েছিল যে, যুরিয়াসাতাইন আর খিলাফত এ দুটো একসাথে টিকিয়ে রাখার কোনই উপায় ছিল না। হয় যুরিয়াসাতাইনের বিনিময়ে খিলাফত রাখতে হত, নয় খিলাফতের বদলে যুরিয়াসাতাইনকে বাঁচাতে হ'ত। অগত্যা মামুন যুরিয়াসাতাইনকে খিলাফতের যজ্ঞে বলি দিলেন। এও যদি প্রতিবাদের যোগ্য হয় হোক, তা থেকে মামুনকে বাঁচাবার শক্তি আমার নেই। হাঁ—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি সত্যিই অপারগ যে, যুরিয়াসাতাইনের হত্যাকারীদের আবার মামুন কেন হত্যা করান। সম্ভবত রাষ্ট্রীয় কূটনীতির বিধানে এটা সিদ্ধ ছিল।

একবার মামুন আহমদ বিন দাউদকে সামনে রেখে একটা বিশেষ রাজনৈতিক বক্তৃতা দান করলেন। এখানে সেটা উদ্ধৃত করা অত্যাবশ্যক মনে করি। তিনি বললেন ঃ

"বাদশাহ তাঁর অমাত্যবর্গের সাথে কখনও এমন সব ব্যবহার করে বসেন যার ভাল-মন্দ বিচারের ক্ষমতা জনসাধারণ হারিয়ে ফেলে। তারা বাইরের থেকে দেখে শুনে ভাবতে শেখে যে, অভিযুক্ত উযীর বা গভর্নর খুবই বিশ্বস্ততার সাথে বাদশাহর এমন সব কাজ আঞ্জাম দিয়েছে যার জন্যে তার প্রতি বাদশাহর চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ ছিল। তারা অমনি সরাসরি রায় দিয়ে ফেলে যে, এ ক্ষেত্রে বাদশাহ যা করলেন, তা নেহাৎ

হিংসা ও সংকীর্ণতার বশবর্তী হয়েই করেছেন। কিন্তু তারা তো আর ভেতরের খবর রাখে না যে, তার এমন কাজও ছিল যা রাষ্ট্রের মূলোচ্ছেদের জন্যে যথেষ্ট।

এরূপ ক্ষেত্রে বাদশাহ উভয় সংকটে পড়েন। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার খাতিরে সেই গোপন তথ্যও উদঘাটন করে জনসাধারণকে জানাতে পারেন না, আর সে উযীর বা গভর্নরকেও ক্ষমা করতে পারেন না। অগত্যা তিনি এমন কাজ করতে বাধ্য হন যা বাহ্যত অসংগত বলেই মনে হয়। তিনি তখন এ কথা জানেন যে, জনসাধারণ তো দূরের কথা, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিরাও এ ব্যাপারে তাঁর প্রতি সুবিচার করবেন না। কিন্তু দেশ ও জাতির স্বার্থে বাদশাহ যে কাজ প্রয়োজন মনে করেন, কোনরূপ সমালোচনার ভয়ে তিনি তা থেকে বিরত হতে পারেন না।'

সন্দেহ নেই, একনায়কত্বের শাসন মামুনের যুগেও পুরাদমে চলছিল কিন্তু তিনি তো আর এর উদগাতা বা প্রবর্তক নন। যদি তিনি তা বদলাতে পারতেন তা হলে অবশ্য একটা কল্যাণকর বিপ্লব সাধিত হ'ত। বনু উমাইয়া ও আব্বাসীয় উভয় শাসকরাই খিলাফতকে গোত্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করে গেছেন। মামুন প্রথম ব্যক্তি যিনি এ অন্যায়কে লোপ করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনিও সফলকাম হননি।

মামুন অত্যন্ত বিচার-বিবেচনার পরে এমন এক বুযুর্গ ও সর্বমান্য ব্যক্তিকে খিলাফতের জন্যে মনোনীত করেছিলেন, শাহী বংশের সাথে যার কোনই সম্পর্ক ছিল না। পরন্ত, শাহী খান্দান উক্ত ব্যক্তির বংশকে খিলাফতের প্রশ্নে প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্র হিসেবেই ভাবত। তাই তার মনোনয়ন লাভের কথা শুনে আব্বাসীয়গণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং দেশব্যাপী বিদ্রোহ শুরু করল। তবুও মামুন যা সত্য ভেবেছিলেন তা থেকে তিলমাত্র বিচ্যুত হননি।

যখন তাঁকে বিষ প্রয়োগে মারা হল, তখন মামুন নিশ্চিন্তরূপে বুঝতে পারলেন যে, দেড়শ বছর ধরে যে গোত্র খিলাফতকে কুক্ষিগত করে মৌরুসী সম্পদে পরিণত করেছে, তাদের তা থেকে কিছুতেই হটানো যাবে না। তখন তিনিও এ ক্ষেত্রে পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করতে বাধ্য হলেন।

এখানেও দেখা গেল যে, তিনি তাঁর উপযুক্ত পুত্র বর্তমান থাকা সত্ত্বেও খিলাফতের জন্যে যোগ্যতর বিবেচনায় ভাইকে উত্তরাধিকারী মনোনীত

করলেন। তাঁর এই মনোনয়নের ভেতর দিয়ে আমরা তাঁর ভেতরে নিঃস্বার্থপরতা ও ন্যায়নিষ্ঠার এরূপ এক অতুলনীয় নিদর্শন দেখতে পাই যার তুলনা ইসলামের ইতিহাসে খুব কমই মিলবে। যদিও মামুনের পুত্র খিলাফতের জন্যে যোগ্য পাত্রই ছিল, তথাপি তাঁর ভাই মুতাসিম বিল্লাহ নিঃসন্দেহে যোগ্যতর ব্যক্তি ছিলেন।

মামুনের যুগে অপরাপর জাতির যত সব সুবিধা-সুযোগ ছিল, সভ্য থেকে সভ্যতম সরকারের যুগেও তার চাইতে অধিক দেখা যায় না। য়াহুদী মজুসী, ঈসায়ী, নাস্তিক সবাই তাঁর রাষ্ট্রে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতেন। খাস বাগদাদেও নতুন নতুন বহু গীর্জা ও চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে দিনরাত খৃস্টান ধর্মের রীতি-নীতি খুব জাঁকজমকের সাথে প্রতিপালিত হ'ত। দরবারে সব ধর্মের ও শ্রেণীর পাদ্রী ও পুরোহিতরা উপস্থিত থাকতেন। মামুন তাদের অত্যন্ত মর্যাদার চোখে দেখতেন। জিব্রাইল নামক এক ঈসায়ী নেতাকে তিনি এতখানি শ্রদ্ধা করতেন যে, তিনি সর্বসাধারণ্যে এ কথা পরিষ্কারভাবে ঘোষনা করে দিয়েছিলেন, যদি কেউ কোন চাকুরী প্রার্থী হয় তা'হলে যেন জিব্রাইলের সনদ নিয়ে আসে।

খোরাসানে মামুন স্বয়ং যে উচ্চ শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার অধ্যক্ষ ছিলেন জনৈক খৃস্টান শিক্ষাবিদ। তাঁর নামছিল মায়সু'। মামুনের ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে প্রমাণস্বরূপ একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি।

আবদুল মসীহ্ ইবনে ইসহাক কান্দী নামক জনৈক খৃস্টান পণ্ডিত রাষ্ট্রের এক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মামুনের হাশিমীর বংশের এক প্রিয়ব্যক্তির তিনি ছিলেন বন্ধু। সেই হাশিমী একবার খুব বন্ধুত্ব সুলভ বিনম্র ভাষায় তাঁর বন্ধুর কাছে লিখলেন—যদি আপনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, তাহলে খুবই ভাল হয়। অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে, ইসলামের মত মহান ধর্মের প্রতি অপনি এখনও আকৃষ্ট হলেন না।

এর জবাবে আবদুল মসীহ্ যা লিখলেন তা কেউ নিজে পাঠ করার আগে ভাবতেই পারবে না। সে ইসলামের মহান প্রবর্তক হযরত মুস্তফা (স) পবিত্র কুরআন ও হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামদের সম্পর্কে এমন জঘন্য মন্তব্য করলেন যা শুনলেও শিউরে উঠতে হয়। কিছুদিন আগে চিঠিখানাই পুরোপুরি উদ্ধার করে লণ্ডনের গালবার্ট ও রিভিংটন প্রকাশনা থেকে ছেপে বের করা হয়েছে। আমি নিজে সে জবাবখানা পাঠ করা

এবং আমার পাঠকদের দৃঢ়তার সাথে জানাচ্ছি যে, তার প্রতিটি শব্দ পাঠ করতে আমার আত্মায় কাঁপন জেগেছে। যদি আজ আবদুল মসীহ্ বেঁচে থাকত তা হলে ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে তার সাজা অনিবার্য ছিল।

এতবড় মারাত্মক চিঠিও যখন মামুনের হাতে দেয়া হল, তখন তিনি তা পাঠ করে শুধু এতটুকু মন্তব্য তাতে লিখলেন পার্থিব প্রয়োজনে যরদশতের ধর্মমত কার্যকরী এবং শুধু পরকালের প্রয়োজনে ঈসায়ী ধর্ম চলতে পারে; কিন্তু ইসলাম ইহ ও পরকাল উভয় লোকের কল্যাণের একমাত্র পন্থা।

আক্ষেপের ব্যাপার এই যে, এতেও ইউরোপীয় লেখকরা সুখী হতে পারেন নি। তবুও তারা ইতিহাস লেখার নামে মুসলিম খলীফা ও শাসকদের ওপরে এরূপ হামলা চালিয়েছেন যার উদ্দেশ্য ইসলামকেই আঘাত করা অজ্ঞ ইতিহাসবেত্তাদের কথা নাহয় বাদই দিলাম কিন্তু মিঃ পামরের আরবী ভাষায় অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমাদের দ্বিমত পোষণ করার কোনই অবকাশ নেই। তাঁর আরবী ও ফার্সী ভাষায় রচিত গদ্য ও পদ্য গ্রন্থাবলী সম্প্রতি ছাপান হয়েছে। তিনিও হারুন-অর-রশীদের ইতিহাসে লিখতে গিয়ে ১২৪ পৃষ্ঠায় লিখেছিলেন: তাঁর যত সব বাজে অমাত্যবর্গ তাঁর মাথায়, এমনকি সব মুসলমানের ভেতরই এ চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছিল যে, কাফিরদের আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বলা চলে না। সে ভাবনা আজও মুসলমানদের কতকের ভেতরে অব্যাহত রয়েছে।

আমার জানা নেই পামর সাহেব এরূপ পাইকারী হারে মুসলমানদের উপরে দোষারোপ করার প্রবণতা ও সাহস সাধারণ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে কিসে জোগাল? যেই ইতিহাস নিয়ে তাঁর এত অহংকার তা তো আমাদের সামনেই পড়ে আছে। পামর সাহেবের তো এতটুকু কথা স্মরণ থাকা উচিত ছিল যে, আল্লাহ্ যখন প্রায় অর্ধ দুনিয়ার শাসনভার মুসলিম খলীফাদের হাতে ন্যস্ত করেছিলেন, তখনও তাঁরা অসংখ্য চার্চ ও গীর্জা তৈরী করে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, প্রতিশ্রুতি লিখে দিয়েছিলেন এবং ফরমান জারী করেছিলেন। তাঁরাই ছিলেন সমগ্র দুনিয়ার মুসলিম খলীফা ও শাসকদের আদর্শ ও পথের দিশারী খুলাফায়ে রাশেদীন। আমি জিজ্ঞেস করছি, খলীফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ কি দামেশকের শাসনকর্তাকে এরূপ ফরমান পাঠান নি যে, "ওয়ালিদ খৃস্টানদের গীর্জার যে অংশ ভেংগে মসজিদের সাথে যুক্ত করেছিল, তা আবার খৃস্টানদের প্রত্যার্পণ

করা হোক গীর্জারূপে ব্যবহারের জন্যে?" তাঁকে কি এরূপ ন্যায়পরায়ণতার জন্যে দ্বিতীয় উমর আখ্যা দেয়া হয়নি? তিনি কি লাখো কোটি মুসলমনের-মুখপাত্র ছিলেন না? খাস আব্বাসীয় খিলাফতের সময় কি রাজধানী বাগদাদে হাজার হাজার বিরাট বিরাট গীর্জা গড়ে ওঠেনি? আর সেগুলোতে কি অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে সব রকমের ধর্মকার্য চালানো হ'ত না? পামর সাহেবের সমচিন্তাধারার লেখকদের আমি জানাতে চাই যে তাদের যদি আমার কথায় সন্দেহ থাকে তা হলে দিয়ারে রুম, দিয়ারে শমুলী ও দিয়ারে সোয়ালেনের অবস্থা যেন 'মো'জেমুল বোলদান' থেকে দেখে নেন।

দায়লামী রাজবংশের শিরোমণি আজদুদ্দৌলা যখন বাগদাদের ভাগ্য-বিধাতা সাজলেন, নসর বিন হারুন নামক তার এক প্রিয় ব্যক্তি তাঁর অনুমতি নিয়ে সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যের উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহে চার্চ ও গীর্জা তৈরী করিয়েছিল।

সন্দেহ নেই মুসলমানদের ভেতরে কিছু সংকীর্ন দৃষ্টির শাসক ছিলেন যাঁরা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর ধর্মীয় স্বাধীনতায় কখনও কখনও হস্তক্ষেপ করতেন। কিন্তু তা হচ্ছে ব্যক্তিবিশেষের অপরাধ। তা থেকে কোন সাধারণ নীতি ধরে নেয়া যায় না। আমাদের জানা আছে মিসরের গভর্নর আলী বিন সালমান সেখানে খৃস্টানদের কতিপয় গীর্জা ধ্বংস করেছিলেন সাথে সাথে এও আমাদের জানা আছে যে, তার পরে আব্বাসী খান্দানের বিন মুসা যখন মিসরের গভর্নর হয়ে গেলেন, সরকারী খরচে সে সব গীর্জা আবার নতুন করে নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

মুসলিম সরকারে অধীনে অমুসলিমরা যেরূপ উচ্চতম পদমর্যাদা লাভ করতেন, তা দুনিয়ার আর কোন সম্প্রদায়ের সরকার কি দিতে সমর্থ হয়েছে? তারীখে ইবনে খালকান 'ওয়া ফতুল ওকিয়াত' এ আমরা দেখতে পাই যে, বহু য়াহুদী ও ঈসায়ী বিভিন্ন সময়ে ইসলামী খিলাফতের বড় বড় পদ দখল করেছিলেন। ইসলামের প্রারম্ভ থেকে খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারোয়ান পর্যন্ত সিরিয়া ও ইরাকের রাষ্ট্রভাষা ছিল যথাক্রমে রোমান ও ফার্সী ভাষা। এই দীর্ঘকাল অবধি তাই রাজস্ব বিভাগের মালিক মুখতার ভিন্ন ধর্মীয় লোকই ছিল। আকবর ও জাহাঙ্গীরের উদারতার কথা তো ভারতের প্রতিটি শিশুও ভালভাবে জানে। সাধারণ আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ইতিহাসের পাতায় পাতায় আমরা মুসলমানদের

উদারতার পরিচয় পাই। আব্বাসীয় খলীফাদের দরবারে যে অসংখ্য য়াহুদী ও খৃস্টান পুরোহিত পণ্ডিতদের সমাবেশ আমরা দেখতে পাই, তাদের সাথে খলীফাদের ব্যবহার দেখলে আজও বিস্মিত হতে হয়। জিব্রাইল নামক ঈসায়ী পণ্ডিতের সাথে খলীফা হারুন-অর-রশীদের ব্যবহার তো এই ছিল যে, তাকে বিরাট জায়গীরের মালিক করে দিয়ে সরকারী কার্যেও এতখানি অধিকার দান করেছিলেন যে, তাঁর সুপারিশ ব্যতিরেকে কাউকে কোন চাকুরী দেয়া হয়া হ'ত না। তার পুত্র বখতিশু' এতখানি সম্পদ ও প্রতিপত্তির মালিক ছিল যে, শান-শওকত ও পোশাক-পরিচ্ছদে সে খলীফা মুতাওয়াক্কাল বিল্লাহ্‌র সাথে পাল্লা দিয়ে চলত। খলীফা মুতাওয়াক্কাল বিল্লাহ্ হেকীম সালমুভিয়ার অসুস্থতার সময়ে নিজে গিয়ে সেবা-শুশ্রূষা করেছেন। যখন সে মারা গেল, একদিনের ভেতরে তিনি কোনরূপ খাদ্য স্পর্শ করলেন না। এমনকি তিনি নির্দেশ দিয়ে তার জানাযার ব্যবস্থা ঈসায়ী তরীকা অনুসারে নিজেই করালেন এবং নিজেই সে নামায পরিচালনার কার্যে আঞ্জাম দিলেন।

খলীফা মুতাজিদ বিল্লাহ্‌র কঠোরতায় যখন গোটা দরবার সর্বদা যুক্তকরে দাঁড়িয়ে থাকত, তখনও তার ঈসায়ী উযীরে আযম সাবেত বিন কোর্রা তাঁরই হাতে হাত রেখে ঘুরে বেড়াতেন। একবার এভাবে তারা দু'জন ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, হঠাৎ মুতাজিদুদ্দৌলা হাত টেনে নিলেন। সাবেত ভড়কে গেলেন! মুতাজিত তা দেখে বললেন—ভয় পাবার কিছুই নেই। আমার হাত আপনার হাতের ওপরে ছিল। জ্ঞানীর হাতের ওপরে থাকবে নাদানের হাত, এ বেয়াদবী আমার পছন্দ হল না বলেই হাত টেনে নিলাম।

প্রথম দিকে মুসলমানরা যাদের কাছেই জ্ঞান শিখতে পেয়েছে, এ ভাবে মর্যাদা দিয়ে তাদের থেকে জ্ঞান অর্জন করেছে। যখন তারা নিজেরাই গুরুর পর্যায়ে পৌঁছল, তখন এ ভাবের মহানুভবতা অশেষ উদ্দীপনা নিয়ে তা বিতরণ করে শিষ্য থাকাকালীন ঋণ পরিশোধ করেছে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জ্ঞানী-মনীষীদের সাথে তাদের যে গভীরতর হৃদ্যতা বিরাজ করতো তা দেখে আজও বিস্মিত হতে হয়। মুসলমানদের বিরাট এক শ্রেনীর ধর্মনেতা আল্লামা শরীফুর রাজী আবু ইসহাক সাবী নামক এক ঈসায়ীর মৃত্যুতে বড়ই মর্মস্পর্শী এক শোকগাঁথা রচনা করেছিলেন। যদি কোন ঈসায়ী বন্ধুও তার কোন শোকগাঁথা লিখিত, তাও অতখানি মর্মস্পর্শী হ'ত কিনা সন্দেহ। এর চাইতে বেশী সম্মান আর কি দেখানো

যেতে পারে যে, যখনই উক্ত আল্লামা তার সমাধির পাশ দিয়ে যেতেন, তক্ষ্ণি সোয়ার থেকে নেমে খালি পায়ে সে পথটুকু অতিক্রম করতেন।

আমাকে দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, অতি সংক্ষেপে আলোচনা করতে গিয়েও আমাকে বেশ কিছু দীর্ঘ আলোচনা করতে হল। পাঠকরা যেন আমাকে ক্ষমা করেন। কিন্তু তারা যেন স্মরণ রাখেন আমার এ আলোচনার লক্ষ্য শুধু পামর সাহেবই নন, ইউরোপে তার মতের সমর্থক লেখক আরও অনেক রয়েছেন। এ কথা চিন্তা করে এখানে আমি অনিচ্ছা সত্বেও আলোচনাটা দীর্ঘ করে ফেললাম।

এ সত্বেও মামুনের জীবনেতিহাসকে আমরা সম্পূর্ণ কালিমামুক্ত বলতে পারি না। আমার ভয় হয় এর পরে যখন মামুনের ধর্মমত নিয়ে আলোচনা করব, তখন একটা বিশেষ মসআলা নিয়ে তার অহেতুক উন্মাদনার চিত্র দেখে পাঠকগণ সহসা তার ভাল দিকগুলোই ভুলে যাবেন।

মামুনের জ্ঞানস্পৃহা

যদিও গৃহবিবাদ, দেশব্যাপী বিদ্রোহ, রোম অভিযান ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজে মামুনের দিনরাত দুর্ভাবনায় কাটাতে হয়েছিল তবুও তাঁর জ্ঞান-স্পৃহার অন্তরায় হতে পারে নি। যখন তিনি মিসরে গিয়েছিলেন, এক ব্যক্তি তাঁকে এই বলে মুবারকবাদ জ্ঞাপন করেছিল যে, আজ ইরাক, সিরিয়া, হেজাজ, মিসর সবই আপনার পদতলে লুটে পড়েছে। তার ওপরে আপনি আবার রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর চাচাত ভাই হবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তদুত্তরে তিনি বললেন—তবুও আমার এখন এ আকাঙ্খা বাকী রয়ে গেছে যে, আমার সামনে সবাই রসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদীস সংকলন করবেন এবং আমি তাদের বলে দিব যে, হাম্মাদ এ হাদীস অমুক থেকে এবং তিনি অমুক থেকে বর্ণনা করেছেন ইত্যাদি।

বাল্যকালেই তিনি ইসলামী শিক্ষার চরমে পৌঁছেছিলেন। এরপরে দর্শন শাস্ত্রের প্রতি ঝুঁকলেন এবং দিন রাত সে আলোচনাই কাটিয়ে দিতেন। তার জ্ঞানস্পৃহার প্রমাণ এতেই পাওয়া যায় যে, তাঁর জামার আস্তিনে ইউক্লিডাসের সিলোজীজমের পঞ্চম ফরমুলা চিহ্নিত ছিল। কারণ এগুলো ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয় হাতিয়ার। এই জন্যেই আরবী ভাষায় এই ফরমূলার অপর নাম হলো 'শেকলে মামুনী,। সম্ভবত, মামুন ছাড়া ইসলামের ইতিহাসে এমন কোন বাদশাহ্ নেই যার নামে কোন শিক্ষাগত বিষয়ের পরিভাষা সৃষ্টি হয়েছে।

হারুন-অর-রশীদের 'বায়তুল হিকমাত' বা 'সাধনালয়' তাঁর যুগে পূর্ণোদ্যমে চলেছিল। তাতে পার্শী, ঈসায়ী, য়াহুদী ও হিন্দু পণ্ডিতরা বিভিন্ন এলাকার ও ভাষার গ্রন্থাবলী আরবীতে অনুবাদ করতেন। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও দর্শনের বই-পুস্তক রচনা ও অনুবাদের কাজ খুবই জোরে শোরে চলত। আজ পর্যন্তও আরবী ভাষায় এসব বিষয়ে যেসব অমূল্য বই পুস্তক পাওয়া যায়, তা মামুনের জ্ঞানস্পৃহার সুফল বই নয়।

একদা মামুন স্বপ্নে দেখলেন যে, এক মহামান্য ব্যক্তি সিংহাসনে বসে আছেন। মামুন তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আপনার পবিত্র নামটি জানতে পারি কি ?

সিংহাসনারোহী ব্যক্তি জবাব দিলেন—অ্যারিস্টোটল।

মামুন—হযরত ! পৃথিবীতে কোন বস্তু ভাল ?

অ্যারিস্টোটল—জ্ঞান যাকে ভাল বলে।

মামুন—আমাকে মূল্যবান কোন উপদেশ দান করুন।

অ্যারিস্টোটল—একত্ববাদ ও সৎসংসর্গ হাতছাড়া হতে দেবেন না।

মামুন এমনিতেই ছিলেন দর্শনগত প্রাণ, তার ওপরে অ্যারিস্টোটলের এই স্বপ্নযোগে সাক্ষাৎ লাভ তাতে ঘৃতাহুতি যোগাল। তিনি রোমের কায়সরকে লিখলেন—অ্যারিস্টোটলের রচিত বই যতখানা পাওয়া যায় সবই যেন রাজধানী বাগদাদে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এ তো ছিল সেই যুগ যখন ইসলামের খলীফাদের সাধারণ একখানা চিঠি কায়সর ও ফাগফুরের নিকট ফরমানের মর্যাদা রাখত।

কায়সর তো পত্র পেয়েই তা প্রতিপালনের জন্যে লেগে গেলেন। কিন্তু তখন রোমক সাম্রাজ্যের কোথাও দর্শন পুস্তকের চিহ্নমাত্র ছিল না। স্বয়ং দর্শনই সে দেশ থেকে উধাও হয়েছিল। বহু খোঁজ-খবর নেয়ার পরে তিনি এক পাদ্রীর কাছে কিছুটা খবর পেলেন। তা হল এই যে, গ্রীসে একখানা মজবুত কুঠরীতে কন্সটান্টাইনের যুগেই দর্শনের যা কিছু বই-পুস্তক সবখান থেকে এনে আটকে রাখা হয়েছে। এরপর থেকে যত সম্রাট এসেছেন ; সবাই সেখানে একটা করে তালা বাড়িয়ে গেছেন। কন্সটান্টাইনের এরূপ ব্যবস্থার কারণ ছিল এই যে, যদি দর্শন ও বিজ্ঞানের স্বাধীনতা দেয়া হয় তা হলে ঈসায়ী ধর্ম খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

পাদ্রীর থেকে খবর নিয়ে যখন সেই বিপজ্জনক কুঠরী খোলা [illegible] দেখা গেল যে, সেখানে বেশ কিছু বই সুরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু [illegible] হঠাৎ খেয়াল জাগল যে, মুসলমানদের প্রতি এই উদারতা ধর্মের দৃষ্টি[illegible] অবৈধ নয় তো ? অমনি তিনি দরবার বসালেন। তারা সবাই [illegible] বাক্যে বলে দিল—কোন দোষ নেই এতে। পরন্তু, মুসলমানদের [illegible] যদি এই দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রভাব ছড়াতে পারে, তা হলে তাদের [illegible] প্রাণ-শক্তিও নির্ঘাত লোপ পাবে।

কায়সরের এ যুক্তি খুবই মনঃপূত হল। তিনি তক্ষুনি পাঁচটি উট বোঝাই করে সেসব নিষিদ্ধ বই-পুস্তক মুসলমানের রাজ্যে পার করে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

মামুন সেগুলো পাওয়া মাত্র ইয়াকুব বিন ইসহাক কান্দীকে নিযুক্ত করলেন অ্যারিস্টোটলের রচনাগুলো অনুবাদের কাজে। তিনি বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞ সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত ছিলেন। সে যুগে তার জুড়ি মেলা ভার ছিল। মামুন এতেও তৃপ্ত হলেন না। স্বয়ং মানমন্দিরের পরিচালকবৃন্দ যথা হাজ্জাজ ইবনুল মাতার, ইউহান্না ইবনুল বাতরীক ও সালমাকে এই উদ্দেশ্যে রোমে পাঠালেন যে, তারা স্বচক্ষে দেখে শুনে প্রয়োজনীয় সব বই-পুস্তক নিয়ে আসবে।

আর্মেনিয়া, মিসর, সিরিয়া, কাব্রিস ও অন্যান্য স্থানে দূত পাঠানো হল এবং লাখ লাখ টাকা ব্যয় করা হল দর্শনভিত্তিক বই-পুস্তক যেখানে যা পাওয়া গেল তা সংগ্রহের জন্যে। এই সময়ে কেস্তা বিন লোকা নামক বিখ্যাত এক দার্শনিক রোমে পৌঁছলেন এবং বহু দর্শনের পুস্তক সাথে নিয়ে এলেন। মামুন এ খবর পেয়ে তাঁকে ডেকে 'মানমন্দির'-এর অনুবাদ কার্যে নিযুক্ত করলেন। সহল বিন হারুন নামক এক পার্শী ডাক্তারকে নিযুক্ত করলেন মযুসী সভ্যতার মূল্যবান বই-পুস্তকগুলো অনুবাদ করার জন্যে।

মামুনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখে দরবারের সবার ভেতরেই অনুরূপ প্রেরণা দেখা দিল। মুহাম্মদ, আহমদ ও হাসান ছিলেন মামুনের বিশেষ সহচর। তারা রোমের দিকে দিকে দূত পাঠালেন বিজ্ঞান ও দর্শনের যেখানে যা কিছু পুস্তক পাওয়া যায় যে-কোন মূল্যে তা সংগ্রহ করার জন্যে। তারপর বিভিন্ন দেশ থেকে ভাষাবিদ পণ্ডিতদের অগ্রিম ভাতা দিয়ে ডেকে এনে সেগুলোর অনুবাদ কার্যে নিয়োজিত করলেন। জিব্রাইল বিন বখতিশু'ও অনুবাদের কাজে যথেষ্ট সহায়তা করছিলেন। বলা বাহুল্য, হারুন ও মামুনের মহানুভবতা তাঁকে এক মুকুটবিহীন রাজার মর্যাদা ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রেখেছিল।

এ যুগে যেসব বই-পুস্তক অনূদিত হয়েছিল তা গ্রীক ফার্সী, কলতী, কিবতী ও শামী ভাষায় লিপিবদ্ধ ছিল।

যেসব রাজা বাদশাহর সাথে মামুনের বন্ধুত্ব ছিল, তাঁরাও উপঢৌকন পাঠাতে গিয়ে মামুনের রুচি মুতাবিক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করে

পাঠাতেন। ভারতের এক রাজা তাঁর দেশের বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী দোবানকে মামুনের কাছে উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করেন। তিনি সে প্রসংগে মামুনকে লিখেছিলেন, যে উপঢৌকন আমি আপনাকে পাঠালাম, পৃথিবীতে তার চাইতে বেশী মূল্যবান, বিখ্যাত ও সম্মানজনক উপঢৌকন আর হতে পারে না।

এই বিজ্ঞ হেকীম জানতেন যে, পারস্য সম্রাট খসরুর শাহী প্রাসাদে একটা সিন্ধুক পুঁতে রাখা হয়েছে। তার ভেতরে বিশ্ববিখ্যাত ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ নওশেরোয়াঁর উযীরের অতি মূল্যবান গ্রন্থ নিহিত রয়েছে। মামুনের কাছে বলে তিনি সিন্ধুক চেয়ে আনালেন। যখন তা খোলা হল, দেখা গেল যে তাতে রেশমের কাপড়ে জড়ানো একশ' পৃষ্ঠাসম্বলিত একখানা পাণ্ডুলিপি রয়েছে। মামুন তার অনুবাদ শুনে অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ফজল বিন সহলকে উদ্দেশ্য করে বললেন—আল্লাহ্‌র শপথ! কথার মত কথা হচ্ছে এগুলো। আমরা যা বলি তা কথা নয় আদৌ।

ইজ্জোজ বিন ইউসুফ কুফী, কেস্তা বিন লোকা বা'লাবাক্কী, সালমান, হোনায়েন ইবনে ইসহাক, সহল বিন হারুন, আবু জ'াফর ইয়াহিয়া, মুহাম্মদ বিন মুসা খাওয়ারেজমী, হাসান বিন শাকের, আহমদ বিন শাকের, আলী ইবনুল আব্বাস বিন আহমদ জওহারী, ইয়াকুব কান্দী, ইউহান্না বিন শসুভিয়া, ইবনুল বতরীফ, মুহাম্মদ বিন শাকের, ইয়াহিয়া ইবনে আবিল মনসুর প্রমুখ মামুনের দরবারের বিখ্যাত অনুবাদক ছিলেন এবং 'মানমন্দির'-এর সদস্য ছিলেন। এঁদের প্রত্যেকের মাসিক বেতন বর্তমান হিসাব মতে আড়াই হাজার টাকা করেছিল। অনুবাদের কাজ আব্বাসীয় যুগে খলীফা মনসুর থেকে শুরু হয়। দীর্ঘদিন ধরে খুব জমকালোভাবে তা চলতে থাকে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, গ্রীক, ইতালী, সিসিলী ও আলেকজান্দ্রিয়ায় এমন কোন জ্ঞানগর্ভ পুস্তক ছিল না যার অনুবাদ করা হয়নি। এই কারণেই আব্বাসীয় বংশ জ্ঞানের জগতে অমর খ্যাতি ও গৌরব অর্জন করেছে।

কিন্তু মামুনের যুগই ছিল জ্ঞানচর্চার স্বর্ণযুগ। আব্বাসীয়দের গৌরবের মুকুটমণি ছিলেন তিনি। মামুন ছাড়া অন্যান্য খলীফা যথা হারুন, আমীন, মুতাসিম প্রমুখ দর্শনশাস্ত্রে হয় অনভিজ্ঞ নয় স্বল্পজ্ঞানী ছিলেন। তাই সে ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব খুব বেশী সক্রিয় ছিল না। মামুন ছিলেন নিজেই দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শী। সৌভাগ্যবশতঃই হোক কিংবা মামুনের

বিচক্ষণতার জন্য হোক, তাঁর যুগের অনুবাদকরা বৈজ্ঞানিক ও গবেষক হিসেবেও খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ইয়াকুব কান্দী ছিলেন দরবারের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক। মুসলমানদের ভেতরে তিনি অ্যারিস্টোটলের সমকক্ষ বলে বিবেচিত হতেন। সুলায়মান বিন হাসান লিখেছেন যে, ইসলাম জগতে কান্দী ভিন্ন আর কোন দার্শনিক খ্যাতিলাভ করেন নি। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান, অংক-শাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, সংগীতশাস্ত্র মনস্তত্ব, সাংখ্যদর্শন, জ্যামিতি জ্যোতিষশাস্ত্রে সমান পারদর্শী ছিলেন।

এসব বিষয়ে তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি রয়েছে। আল্লামা ইবনে আসবী'আ তাঁর রচিত 'তবাকাতুল আতিব্বা গ্রন্থে কান্দীর রচনাবলীর এক ফিরিস্তি দান করেছেন। তাতে দু'শ বিয়াল্লিশখানা গ্রন্থ ও পুস্তিকার নাম রয়েছে। তার কতিপয়ের ভেতরে তিনি গ্রীক দার্শনিকদের ভুলভ্রান্তি খতিয়ে দেখিয়েছেন। কতিপয় পুস্তক আধুনিকতম বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছে। একখানা পুস্তিকা লিখেছেন তিনি এক নতুন যন্ত্রের আবিষ্কার নিয়ে। তা দিয়ে বহু দূরের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। আরেকটি যন্ত্র আবিষ্কার নিয়ে যে পুস্তক লিখেছেন তা থেকে এক বস্তু থেকে অপর বস্তুর দূরত্ব বুঝা যায়। এ ধরনের আরও বহু আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে তিনি বেশ কিছু বই লিখে গেছেন।

দর্শন শাস্ত্রের অনুবাদকের মৌলিক প্রতিভা থাকা চাই। এদিক আলোচনা প্রসংগে আবু মা'শার 'কিতাবুল মাকারাত-এ লিখেছেন যে, ইসলামী দুনিয়ায় উত্তম অনুবাদক ছিলেন চারজন—ইয়াকুব কান্দী, হোনায়েন বিন ইসহাক, সাবেত বিন কোর্রা ও আমর ইবনুল ফরখানুল বতরী। ইয়াকুব কান্দী অনুবাদ করার সাথে সাথে মূল গ্রন্থের জটিলতা ও অস্পষ্টতা দূর করে দিয়েছেন। তাই তার অনুবাদ এক হিসেবে ব্যাখ্যা গ্রন্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তর্কশাস্ত্রের ওপর ইয়াকুব কান্দীর যেসব মৌলিক রচনা রয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে তা ইসলাম জাহানে পাঠ্য-পুস্তকরূপে পঠিত হতো। আবু নসর ফারাবীর গ্রন্থ বাজারে প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত এ বইয়ের আর পরিবর্তন ঘটেনি। ইয়াকুব কান্দীর শিষ্যদের ভেতরে হাসনুভিয়া, নফতুভিয়া, সালমুভিয়া, আহমদ ইবনুত্‌ তাইয়েব প্রমুখ মনীষীদের যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে। আহমদ ইবনুত্‌ তাইয়েব দর্শন শাস্ত্রের একজন মস্তবড় পণ্ডিত ছিলেন।

তিনি অ্যারিস্টোটল ও অন্যান্য দার্শনিকের গ্রন্থাবলীতে টীকা সংযুক্ত করে গেছেন ও সেগুলোর ব্যাখ্যা পুস্তক লিখেছেন।

মামুনের দরবারের দ্বিতীয় অনুবাদ হোনায়েন ইবনে ইসহাক যিনি মামুনের যুগেই খ্যাতিলাভ করেছিলেন, তিনি অনুবাদকার্যের বিখ্যাত নায়ক ছিলেন। তিনি আরবী অভিধানের প্রথম রচয়িতা ও অলংকার শাস্ত্রের স্রষ্টা খলীল ইবনে আহমদ বসরীর কাছে আরবী ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। গ্রীক ভাষা শিখেছেন তিনি রোম শহর গিয়ে। প্রথমে তিনি জিব্রাঈল বিন বখতিশুর কাছে আশ্রয়লাভ করেন। সেখান থেকে ধীরে ধীরে পরিচিত হয়ে মামুন কর্তৃক দরবারী অনুবাদকরূপে নিযুক্তি লাভ করেন। সেদিন থেকেই তিনি মামুনের উদার হস্তে দক্ষিণা লাভ করে যথেষ্ট অর্থ ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়ে উঠেন। মাসিক আড়াই হাজার টাকা বেতন ছাড়াও যাঁকে নানাবিধ পুরস্কার ও পারিতোষিক দেয়া হত প্রায়ই। কথিত আছে যে, মামুন প্রতিটি অনুবাদ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির ওজন মেপে স্বর্ণদান করতেন। তবে, হোনায়েন স্বয়ং তাঁর এক পুস্তিকায় দীনারের স্থলে দেরদাম প্রদানের কথা উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা ইবনে আসবি'আ তাঁর ৬৪৩ হিজরীতে রচিত তাবাকাতে আতিব্বা' গ্রন্থে লিখেছিলেন—আমি স্বয়ং হোনায়েনের পাণ্ডুলিপি স্বচক্ষে দেখেছি। তাঁর মুহরী আরযাকের হস্তলিপি। মামুন-অর-রশীদের শাহী সিলমহর তার ওপরে তখনও বিদ্যমান। লেখাগুলো সুস্পষ্ট। কাগজও বেশ পুরু। প্রতি পৃষ্ঠায় মাত্র কয়েক ছত্র লেখা। সম্ভবত হোনায়েন ইচ্ছা করেই পাণ্ডুলিপি ভারী করার পক্ষপাতী হয়েছিলেন। কারণ, পাণ্ডুলিপি মেপেই বিনিময়ে রৌপ্যদান করা হবে। অবশ্য, এ ধরনের কাগজে এরূপ না লিখলে হয়ত অদ্যাবধি লিপিগুলো সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দিত না।

আল্লামা ইবনে আসবি'আ হেকীম জালীনুসের আলোচনা প্রসংগে তাঁর একশ একুশখানা গ্রন্থের নাম ও তার ওপরে এক প্রবন্ধ লিখে গেছেন। তারপর লিখেছেন যে, হোনায়েন এর প্রায় সবগুলো বই-ই অনুবাদ করে গেছেন আরবীতে। হোনায়েন স্বয়ং এবং পুস্তকে জালীনুসের বইগুলোর বিবরণ দান করেছেন। তাতে তিনি কত কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে সেসব পুস্তক সংগ্রহ ও অনুবাদ করেছেন, তাও লিখেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ কিতাবুল 'বুরহান, অনুসন্ধান করতে গিয়ে ফিলিস্তিন, মিসর, আলেকজান্দ্রিয়া ও সমগ্র

সিরিয়া চষে বেড়িয়েছেন। কিন্তু তার অর্ধখণ্ড শুধু দামেশকে পাওয়া গিয়েছে।

জালীনুসের বইয়ের অনুবাদ আরও কতিপয় অনুবাদ করেছেন। আল-তাস ইবনে মক্কী, বতরীক আবু সাঈদ উসমান, মুশকী এবং মূসা বিন খালেদও অনুবাদ করেছেন। কিন্তু হোনায়েনের অনুবাদের সাথে তার কোনই তুলনা হয় না। আল্লামা ইবনে আসবী'আ' স্বয়ং মূসা বিন খালেদের অনুবাদ দেখেছেন। তিনি লিখেছেন যে, এ দুই অনুবাদের ভেতরে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। আশ্চর্য যে, এত কিছু অনুবাদ করেও হোনায়েন বহু সার্থক মৌলিক পুস্তক লিখে গেছেন। তারাকাতুল আতিব্বা গ্রন্থে তিন পৃষ্ঠাব্যাপী তার ফিরিস্তি দান করা হয়েছে। বইয়ের কলেবর বেড়ে যাবার ভয়ে আমি তা বর্জন করলাম।

হোনায়েনের স্বনামধন্য ছেলে ইসহাক ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র জায়েশও অনুবাদকার্যের অনেকখানি প্রসার করেছেন। অ্যারিস্টোটলের অধিকাংশ দর্শনের বই ইসহাক অনুবাদ করেছেন।

কেস্তা, বিন লোকা বা'লাবাক্কীও একজন বিখ্যাত মনীষী ও ভাষাবিদ ছিলেন। ইবনে নদীম লিখেছেন—তিনি চিকিৎসা, বিজ্ঞান, দর্শন জ্যামিতি অংক, সংগীত প্রভৃতি বিদ্যায় অশেষ পারদর্শী ছিলেন। আল্লামা ইবনে আবি আসবি'আ লিখেছেন—তিনি গ্রীক ভাষায় অনুবাদ গ্রন্থের সংশোধন করেছেন। এ ছাড়া তিনি মৌলিক পুস্তকও রচনা করেছেন। তারাকাতুল আতিব্বা গ্রন্থে সেগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

শুধু মামুনের যুগেই যতগুলো গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে এবং টীকা ও ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে, তার ফিরিস্তি দিতে গেলেই পৃথক একখানা বই লেখা প্রয়োজন।

মামুন দিন দিন যত বেশি দর্শনের সাথে পরিচিত হয়ে চললেন, ততই তিনি তার গবেষণা ও অনুবাদকার্যের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। ইসলামী দুনিয়ার অ্যালজাবরার উপরে প্রথম বই লিখেন মামুনের যুগের বিখ্যাত মনীষী মুহাম্মদ ইবনে মূসা খাওয়ারেজমী এবং তাঁরই নির্দেশে রচনা করেন। এ পুস্তক আজও বিদ্যমান এবং তা এতখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সুবিন্যস্ত যে, তারপরে ইসলাম জাহানের বহু মনীষী এ বিষয়ে অজস্র পুস্তক লিখেছেন বটে, কিন্তু তা থেকে সে সব আদৌ উন্নত মানের হয়নি।

গ্রীসের বিজ্ঞান গ্রন্থে তিনিই প্রথম পাঠ করেছিলেন যে, পৃথিবীর আয়তন চব্বিস হাজার বর্গমাইল ; তক্ষুণি তিনি তার যথার্থতা নির্ণয়ের জন্যে তার বিশেষ সহচর মুহাম্মদ, আহমদ ও হাসানকে নির্দেশ দিলেন যে, দরবারে এ বিষয়ে আরও যেসব বিশেষজ্ঞ রয়েছেন তাদের নিয়ে কোন এক সমভূমিতে গিয়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও অংকশাস্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর পরিমাপ নির্ণয় কর।

এই পরীক্ষাকার্যের জন্যে সঞ্জারের প্রশস্ত ময়দানকে উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করা হল। তারা সবাই প্রথমে একটা নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উত্তরের ধ্রুবতারার উচ্চতা নির্ণয় করল এবং সে স্থানে একটি খুঁটি গেড়ে তার সাথে লম্বা একটা রশি বেঁধে সোজাসুজি উত্তর দিকে চলল। রশিটা যেখানে শেষ হয়ে গেল সেখানে আরেকটি খুঁটি গাঁড়ল। সেখান থেকে আরেকটা রশি বেঁধে নিয়ে আবার উত্তর দিকে চলল এবং কিছুদূর গিয়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে পেল যে, উত্তরের ধ্রুবতারার উচ্চতা একধাপ বেড়ে গেছে। যতটুকু স্থান অতিক্রম করে তারা এই পার্থক্য দেখতে পেল, সেই স্থানটুকু মেপে দেখা গেল যে, ৬৬⅔ মাইল হয়।

এ থেকে তারা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে, আসমানের প্রতি স্তরের বিপরীত দিকের পৃথিবীর অংশটুকুর পরিমাপ যখন ৬৬⅔ মাইল, এর পরে ঠিক সেখান থেকেই আবার রশি বেঁধে নিয়ে দক্ষিণ দিকে সোজাসুজি চলল এবং পূর্বানুরূপ রশি বেঁধে বেঁধে অগ্রসর হল। শেষ পর্যন্ত গিয়ে উত্তরের ধ্রুবনক্ষত্রের উচ্চতা মেপে দেখতে পেল যে, একধাপ কমে গেছে। এক্ষণে তারা স্থির করল যে, প্রতি স্তর আকাশের বিপরীত দিকের পৃথিবীর অংশটুকুর পরিমাপকে ৩৬০ দ্বারা পূরণ করলেই পৃথিবীর সর্বমোট আয়তন বের করা যাবে। কারণ আকাশের পরিমাপ সম্পর্কে আগে থেকেই তাদের এ ধরনের একটা ধারণা হয়েছিল। এই হিসেবে দেখা গেল যে, পৃথিবীর পরিধি যথার্থই চব্বিশ হাজার মাইল।

ইসলাম জাহানে মামুনই প্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্রের প্রচলন ও উন্নয়ন সাধন করেন। এ ব্যাপারে তিনি দরবারের পণ্ডিতবর্গ ছাড়াও অন্যান্য দেশের জ্যোতির্বিদ ও জ্যামিতিকারদের সমাবেশ ঘটিয়ে ৮২৯ খৃস্টাব্দে শেমাসিয়া নামক স্থানে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের কেন্দ্র স্থাপন করেন। তার পরিচালনার ভার ছিল ইয়াহিয়া বিন আব্বাস মনসুর, খালেদ বিন আবদুল মালেক, সনদ

বিন আলী আব্বাস বিন সাঈদ জওহারী ও অন্যান্য কতিপয় বৈজ্ঞানিকের। সেখানে বহু মূল্যবান দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী করা হ'ত। তা দিয়ে সূর্যের দূরত্ব, যার উদয়স্থল, তার উচ্চতা এবং কতিপয় ঘূর্ণায়মাণ ও স্থির তারকার অবস্থা জানা গিয়েছে।

মামুনের যুগ পর্যন্ত এসব ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য ছিল মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম ফাজারীর রচিত পুস্তক। কিন্তু নতুন তথ্যানুসন্ধানের পরে মামুনের দরবারে বিখ্যাত জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদ আবু জাফর মুহাম্মদ বিন মুসা খাওয়ারেযমী যে জ্যোতিষশাস্ত্রের পুস্তক প্রণয়ন করলেন, তার জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি আগেকার সব পুস্তকের খ্যাতি লোপ করে দিল। এ গ্রন্থ দুনিয়ার যতসব নির্ভরযোগ জ্যোতির্বিজ্ঞানের পুস্তক অবলম্বনে লেখা হয়েছে, ভারতের গ্রন্থের সাথে এর মিল রয়েছে। পারস্যে রচিত গ্রন্থাবলীর সাথেও এর যোগ আছে। বাতলিমুসের অভিমতও এতে স্থান পেয়েছে। আর তা সাজানো ও নামকরণের ব্যাপারে তিনি মৌলিক প্রতিভার আশ্রয় নিয়েছেন।

মামুনের দরবারের অন্যতম জ্যোতির্বিজ্ঞানী হাবশ সাহেব মারওয়ারযীও এ বিষয়ে তিনখানা পুস্তক রচনা করেন। তার ভেতরে আধুনিক গবেষণাভিত্তিক যে বইখানা মামুনের নামে লেখা হয়েছে সেটাই অধিকতর খ্যাতিলাভ করেছে।

এশিয়ার দেশগুলোতে কোন কিছুর খ্যাতি লাভের জন্যে এটাই যথেষ্ট, যে কোন রাজা-বাদশাহ তার মর্যাদা দেয়। কিন্তু মামুনের যুগে সে জন্যে আরও কয়েকটি কারণ দেখা দিয়েছিল।

তখনও মুসলমানদের ভেতরে দৃঢ়তা ও অগ্রগতি অব্যাহত ছিল। প্রতিটি মুসলমানের অন্তর তখনও উৎসাহ-উদ্দীপনায় উজ্জীবিত ছিল। তাই তারা যেদিকেই লক্ষ্য সন্নিবেশ করত, সেদিকে কোন জটিলতাই বাধা তাদের জন্য সৃষ্টি করতে পারেনি। তার সাথে খলীফা মামুনের গুণীর আদরসুলভ মহানুভবতা আরও উৎসাহ যোগিয়েছে। মামুন যেহেতু নিজেও ছিলেন অত্যন্ত বিজ্ঞ ও বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী, তাই তার দরবারে পৃষ্ঠপোষকতা লাভের ব্যাপারটি খুব সহজসাধ্য ছিল না। সারাদেশে তাই প্রতিযোতিযোগিতা মূলকভাবে জ্ঞানের সাধক সৃষ্টি হয়েছিল।

২০৪ হিজরীতে তিনি যখন বাগদাদ পৌঁছলেন, তখন কাজী ইয়াহিয়া

বিন আকতানকে নির্দেশ দিলেন যে, দেশের সুধী সমাজের ভেতর থেকে বিশজন লোক বেছে নাও যাঁরা সর্বদা আমার সাথে জ্ঞানচর্চার মজলিসে অংশ গ্রহণ করবেন। তক্ষুণি ফরমান পাঠিয়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে সাহিত্যিক, ফিকাহ্‌বিদ, কবি, দার্শনিক ও চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের ডেকে এনে উপযুক্ত বেতন নির্দিষ্ট করে দেয়া হল।

আরবী অভিধানের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ যাঁর মতামতের ওপরে ভিত্তি করে রচিত, সেই মহাপণ্ডিত আসমা'ঈ তখন অশীতিপর বৃদ্ধ হয়েছিলেন। মামুন তাঁকেও বসরা থেকে রাজধানীতে ডেকে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বার্ধক্যজনিত অক্ষমতা প্রকাশ করায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হল যে আরবী ভাষা সম্পর্কিত যে কোন জটিল সমস্যার সমাধান তার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে। নেওয়াজের বাদশাকে মামুন লিখে পাঠালেন যে, বৈজ্ঞানিক লিও যেন তাঁকে দর্শন শেখাবার জন্যে বাগদাদ আসার অনুমতি লাভ করে। তার বিনিময়ে মামুন স্থায়ী সন্ধি স্থাপন ও পাঁচ টন স্বর্ণ দানের ওয়াদা করলেন।

ইলমে নাহ্‌বুর অন্যতম স্রষ্টা ফর্রাকে নির্দেশ দিলেন উক্ত বিষয়ে এমন একখানা পূর্ণাংগ গ্রন্থ লেখার জন্যে যাতে সব রকমের নিয়মপদ্ধতি ও আরবী ভাষাভাষীদের ভেতরে প্রচলিত বিভিন্ন বাক্যরীতি ও সেসবের প্রয়োগের ধারা স্থান পায়। এ উদ্দেশ্যে তাঁর জন্যে শাহী প্রাসাদের একটা কক্ষ ছেড়ে দেয়া হল। তাঁর পরিচর্যার জন্যে সেবক-সেবিকা বিশেষভাবে নিয়োজিত করা হল। কোন প্রয়োজনে কাউকে কিছু বলতে গিয়ে যেন তাকে মুহূর্তের জন্যেও অন্যমনস্ক হতে না হয় তার সর্ববিধ ব্যবস্থা মামুন করে দিলেন। শুধু নামাযের সময়ে সেবক তাকে খবর দিত যে, ওয়াক্ত হয়েছে।

বহু লিপিকার ও নকলনবীশ নিয়োজিত করা হল ফর্রার প্রতিটি কথা যখন তখন লিখে নেবার জন্যে। প্রায় দু'বছরের অক্লান্ত সাধনার পরে একখানা বিস্তারিত গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হল। মামুন নির্দেশ দিলেন এর অনেকগুলো কপি করে বিভিন্ন লাইব্রেরীতে পাঠানো হোক। এই গ্রন্থের নাম রাখা হল 'কিতাবুল হদুদ'।

এরপরে ফর্রা মৌখিক বক্তৃতার সাহায্যে 'কিতাবুল মাআনী' (অলংকার শাস্ত্র) লেখালেন। তার সেই বক্তৃতা শুনতে এতসব পণ্ডিতের ভিড় হ'ত যে, জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী লিখছেন—আমি তাদের সংখ্যা নির্ধারণের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত শুধু কাজীদের সংখ্যা গণনা করলাম। দেখলাম—এই মজলিসে প্রতিদিন আশীজন কাজী যোগদান করতেন।

মামুনের যুগের আরেকটি অবিস্মরণীয় ব্যাপার এই যে, ফার্সী ভাষায় কাব্যচর্চা তখন থেকেই শুরু হয়। যদিও ইসলাম প্রসার লাভের আগেই পারস্যে সাহিত্যচর্চা চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল ; কিন্তু আরবের জয়যাত্রার স্রোত তা যে কোথায় ভাসিয়ে নিয়েছে তার পাত্তা নেই। আজ বড় বড় লেখকদের বিরাট গ্রন্থের হাজার হাজার পৃষ্ঠা উল্টিয়েও সে যুগের রচনার সামান্যতম একটা অংশ বা ক্ষুদ্রতম একটা কবিতা খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই পারস্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে মামুনের অবদান এই যে তাঁরই যুগে পারস্যের লুপ্ত সাহিত্য-প্রতিভা নবজন্ম লাভ করল।

মামুনের মাতৃভাষা ফার্সী ছিল। তাঁর শাসনকার্যের প্রাথমিক যুগ খোরাসানেই কেটেছে। কিন্তু দরবারে শুধু আরব কবি ও সাহিত্যিকের আসরই জমত। আব্বাস মারোয়ারজী নামক এক ইরানী মনীষীর ভেতরে তার ফলে প্রেরণা সৃষ্টি হল। তিনি পারস্যের মৃত কাব্যশক্তির পুনর্জন্ম দানের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন এবং মামুনের প্রশংসাপূর্ণতা কবিতা লিখে কাব্যচর্চা শুরু করলেন।

সরকারের প্রভাব দেখুন। আরবী ভাষা হাজার হাজার বছর ধরে প্রচলিত এক বিশেষ দেশের বিশেষ ধরনের ভাষাকে এরূপভাবে চাপা দিল যে, জনৈক দেশপ্রেমিক কবি তা উদ্ধার করতে গিয়েও ব্যর্থ হলেন। কারণ, তার রচিত ফার্সী ভাষা এতই পরিবর্তিত রূপ পেল যা আরবী ভাষার সাথে প্রায়ই সমগোত্রীয় ও প্রাচীন ভাষার সাথে প্রায় সম্পর্কহীন হয়ে দাঁড়াল।

মামুনের যুগে এশিয়ার অন্যতম বিশেষ সম্পদ লিপি-কৌশলেরও চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। এর আগেও নানান ধরনের লিপি সৃষ্টি হয়েছিল। মনসুর বিন মাহদী আব্বাসীয় যুগে ইসহাক বিন হাম্মাদ বিখ্যাত লিপিকার ছিলেন। তাঁর শিষ্যরা বার ধরনের লিপি আবিষ্কার করেন। কিন্তু তখন অবধি কেউই সেসবের কোন নিয়ম-নীতি শিক্ষণীয় পর্যায়ের বিবেচিত হতে পারেনি।

সর্বপ্রথম এ বিষয়ে নিয়ম-পদ্ধতি প্রণয়ন করেন মামুনের দরবারেরই অন্যতম মনীষী আহওয়াল মোহারার। মামুনের উজীরে আযম যুরিয়া-সাতাইনও এক ধরনের লিপি আবিষ্কার করেছিলেন। তা তারই নামের সাথে যুক্ত হয়ে নাম গেল 'কলমুর রিয়াসী'।

মামুনের চরিত্র ও আচার-ব্যবহার

মামুন সম্পর্কে সব ইতিহাসকারের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, আব্বাসীয় খলীফাদের ভেতরে তাঁর মত জ্ঞান, স্থৈর্য, ধৈর্য, শিক্ষা, বিবেক, সাধনা, বীরত্ব, উচ্চাকাংখা ও মহানুভবতার অধিকারী আর কেউ ছিলেন না। তাঁর এ দাবী আদৌ অসংগত নয় যে, "মা'আবিয়ার শক্তি ছিল আমর ইবনুল আস, আবদুল মালেকের শক্তি ছিল হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আর আমার শক্তি আমি নিজেই।"

হারুন-অর-রশীদ প্রায়ই বলতেন, "আমি মামুনের ভেতরে মনসুরের বিচক্ষণতা, মাহদীর আল্লাহ্ ভীরুতা ও হাদীর শৌর্য দেখতে পাই।" এর সাথে যদি তাঁর ক্ষমা ও বিনয়, অকপটতা ও সরল মন-মেজাজ মিলিয়ে বিবেচনা করা হয়, তা হলে শুধু আব্বাসীয় খলীফাই নয়, বরং মুসলিম জাহানের স্বনামধন্য খলীফাদের সাথেই তাঁর তুলনা দেয়া যেতে পারে।

মামুন নিজেই বলতেন, "ক্ষমার ভেতরে আমি এত আনন্দ পাই যে, তার সাওয়াবের তোয়াক্কা রাখি না।' আবদুল্লাহ্ বিন তাহের বলেছেন—"আমি একবার মামুনের দরবারে হাজির হলাম। তিনি তক্ষুণি ভৃত্যকে ডাকলেন। কিন্তু তার কোনই সাড়া মিলল না। তিনি আবার ডাকলেন। এবারে এক তুর্কী ভৃত্য বক বক করতে করতে এল এবং রুক্ষভাবে বলতে লাগল—"গোলামের কি আর খানা-পিনার দরকার নেই? যখনই বেচারারা একটু এদিক ওদিক যায়, অমনি ডাক চীৎকার শুরু হয়—ও গোলাম! ও গোলাম! তওবা! ও গোলাম, ও গোলাম, করার তো একটা সীমা থাকা চাই!

মামুন চুপ হয়ে গেলেন এবং মাথা নত করে রইলেন। ভাবলাম, এবারে আর গোলামের রক্ষা নেই। মামুন আমার দিকে মাথা তুলে বললেন—নম্র প্রকৃতির হওয়াতে বিপদ এটাই যে, দাস-দাসীদের পর্যন্ত স্বভাব খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু এ তো আর সম্ভবপর নয় যে, তাদের সৎস্বভাব ফিরিয়ে আনার জন্যে আমি রুক্ষ প্রকৃতির হয়ে দাঁড়াব!"

একদা তিনি দজলা নদীর তীরে বসে ছিলেন। দরবারের সবাই তাঁর সামনে করজোড়ে দণ্ডায়মান। সামনে একটা পর্দা টানানো ছিল। নদী বেয়ে নৌকা যাচ্ছিল কয়েকটা। একজন মাঝি আরেকজনকে উদ্দেশ্য করে বললেন—"যে মামুন ভাইকে হত্যা করেছে, আমাদের চোখে তাঁর আবার কি মর্যাদা থাকতে পারে?"

মামুন তা শুনে মৃদু হেসে দরবারের লোকদের প্রতি তাকিয়ে বললেন—সমবেত ভদ্রমণ্ডলী! কোন উপায় অবলম্বন করলে আমি এই মহান ব্যক্তিটির দৃষ্টিতে মর্যাদাবান হতে পারি?

পাঠকবর্গরা শুনে অবশ্যই অবাক হবেন যে, মামুনের এ মাত্রাহীন ক্ষমাশীল ও দয়ার্দ্র প্রাণ যদিও শাসন-শৃংখলার স্বার্থে খলীফার জন্যে শোভনীয় ছিল না, তথাপি এটা তিনি পরম গৌরবের ব্যাপার ভাবতেন। তিনি সগৌরবে বলতেন—খাস ভৃত্যরা অনেক সময়ে আমাকে প্রকাশ্য মজলিসে বসে মন্দ বলে, আমি তা নিজের কানে শুনেও শুনি না।

কবি হোসায়েন বিন জেহাক ছিলেন আমীনের প্রিয় সহচর। আমীন নিহত হবার পরে তিনি খুবই মর্মস্পর্শী এক শোকগাঁথা রচনা করেন। তাতে তিনি মামুনের যথেষ্ট কুৎসা বর্ণনা করে প্রাণের ঝাল মিটিয়েছেন। মামুন তা দেখে এতটুকু বললেন যে, অন্যান্য কবির সাথে সে যেন দরবারে না আসে। এর পরে একদিন তিনি তাঁকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন—সত্যি করে বল তো, আমীন হত্যা ও বাগদাদ বিজয়ের দিনে কোন কুরায়শী নারীকে তুমি নিহত বা অপমানিত হতে দেখেছ? হোসায়েন জবাব দিল—কাউকে দেখিনি। মামুন তখন তাঁকে অভিযুক্ত করার জন্যে তাঁরই রচিত কয়েক লাইন কবিতা পাঠ করলেন। তাতে সে অত্যন্ত হৃদয়বিদারক বর্ণনা দান করেছে—বাগদাদ বিধ্বস্ত করা হচ্ছে এবং হাশিম বংশীয় কোমলাংগী নারীরা সে পাশবিক অভিযানের হাত থেকে কিছুতেই নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে পারছে না।

হোসায়েন তখন জবাব দিল—হে আমীরুল মুমিনীন! এ এমনি এক উত্তেজনা ও ভাবপ্রবণতার ফল যা থেকে আমাকে আমি কিছুতেই রক্ষা করতে পারিনি। আমীনের শোকে সত্যাসত্য বিচার-বিবেচনা আমার যথার্থই লোপ পেয়েছিল। সেই মরহুম খলীফার শোক প্রকাশের প্রবণতা যে ভাবে ফুটে উঠেছে, তার ব্যতিক্রম করার শক্তি ছিল না

আমার। যদি সে জন্যে আপনি আমাকে অভিযুক্ত করেন, করতে পারেন এবং যদি ক্ষমা করে দেন তা আপনার মেহেরবানী বটে।

এ কথা শুনে মামুনের দু'চোখ আঁসু উছলে উঠল। তক্ষুণি তিনি হুকুম দিলেন—হোসায়েনের পূর্বভাতা আবার বহাল হোক।

এই হোসায়েনই এর পরে একবার একটা প্রশংসাগীতি লিখে হাজেবকে দিল মামুনের কাছে পৌঁছাবার জন্যে। কাব্যগত গুণ বিবেচনায় সেটা অনুপম ছিল। মামুন তার যথাযথ বিনিময় দান করলেন। তবে সাথে সাথে হাজেবকে বললেন যে, এ দুটো লাইনও হোসায়েনের রচিত ঃ

لا تفرحن امامون بالملك بعده
ولا زال فى الدنيا طريدا مشرد

(লা তাফরাহিন মামুন্ বিল মুলকি বা'দাহ
ওয়ালা যালা ফিদ্দুনিয়া তরীদাস মুশাররদা।)

অর্থাৎ ঃ আমীনের পরে যেন গো মামুন নাহি পায় রাজসুখ
ভাগ্যে যেন গো লেখা হয় তার চিরজনমের দুঃখ!

মামুন এ লাইন দু'টো পড়ে হাজেবকে বললেন নিন্দা ও প্রশংসা মিলে সমান হয়েছে। এখন কবির আর কোন পাওনা থাকতে পারে না।

হাজেব আরজ করল তা হলে হুযুরের ক্ষমার অভ্যেসটা হারালেন কি?

মামুন বললেন—ঠিকই বলেছ। যাক, তাকে যথাযোগ্য পুরস্কার দান কর।

আমীন যে সময়ে বাগদাদে আবদ্ধ ছিলেন, তাঁর প্রিয় ভৃত্য কাওসার যুদ্ধের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য বের হল। হঠাৎ একটা পাথর এসে তার মুখমণ্ডলে লাগল এবং রক্ত ঝরতে লাগল। আমীন তাঁর প্রিয় ভৃত্যের এ দশা দেখে আর অশ্রুসম্বরণ করতে পারলেন না। তীব্র সমবেদনা নিয়ে তিনি এ দু'টি চরণ আবৃত্তি করলেন ঃ

ضربوه قرة عينى - ومن اجلى ضربوه
اخذ الله بحقى من - اناس احرقوه

যরাবুহু কুররতা 'আয়নী
ওমিন আজলী যরবুহু

আখযাল্লাহু য়াক'অনী মান
আনা মান আহরাতুহু

অর্থাৎ ঃ আমার কারণে হানিল আঘাত
যারা মোর প্রিয় দাসে
মম প্রাণ যারা জ্বালাল তাদের
যেন খোদা প্রাণ নাশে।

যেহেতু মামুনের অন্তর্বেদনার তীব্রতা তাঁর কণ্ঠরোধ করে দিয়েছিল, তাই তিনি আর অগ্রসর হতে পারলেন না। তাই আবদুল্লাহ্ নামক দরবারের অন্যতম কবিকে বাকী চরণ ক'টি পূরণ করে দেয়ার জন্যে বললেন। সে এ নিয়ে পূর্ণ একটা কবিতা লিখে ফেলল। তার শেষ লাইন দু'টো এরূপ ঃ

من راى الناس له فضل - عليهم حسدوه
مثل ما حسد القائم - بالملك اخوه

(মান রা আন্নাসা লাহু কাযলুতন
আলায়হিম হাসাদুহু
মিসলু মা হাসাদাল কায়িমু
বিলমুলকি আখুহু)

অর্থাৎ ঃ গুণীকে হিংসা করা লোকের স্বভাব
খলীফার সাথে যথা মামুনের ভাব।

আমীন নিহত হবার পরে এই কবিই আবার মামুনের দরবারে হাজির হলেন তাঁর প্রশংসাগীতি পাঠ করে পুরস্কার লাভের জন্যে। মামুন তাঁর দিকে চেয়েই বললেন—আচ্ছা, ওই যে কি একটা কবিতায় তুমি লিখেছিলে "খলীফার সাথে যথা মামুনের ভাব?"

কবি বেচারা তখন বড়ই অসহায়ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করল। মামুন তক্ষুণি তাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দান করলেন।

মামুন বড় গলায় এ দাবী করে বেড়াতেন যে, যত বড় অপরাধই হোক না কেন, আমাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে পারে না। এক ব্যক্তি বার বার অপরাধ করে প্রতিবারেই এসে ক্ষমা চাইত। মামুন তাকে প্রতিবারেই ক্ষমা করে অবশেষে বলেছিলেন—তুমি যত বার অপরাধ করবে

আমি ক্ষমা করেই চলব। অবশেষে এই সীমাহীন ক্ষমায় একদিন বিরক্ত হয়ে তুমি ঠিক হয়ে যাবে।

মামুনের এই মাত্রাহীন দয়ার্দ্র প্রাণ মানুষকে এতই নিঃশংক করে দিয়েছিল যে, প্রত্যেকেই এসে মামুনের কাছে নির্ভয়ে যার যার মারাত্মক অপরাধও স্বীকার করত। যেই আবদুল মালেকের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অভিযোগ উত্থাপন সম্পর্কে আগেই বলে এসেছি, মামুন তাকে একদিন ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন বলতো, আসল ব্যাপারটা কি ?

আবদুল মালেক সেসব অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করল। মামুন জিজ্ঞেস করলেন তবে তোমার বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ আসে কেন ? আবদুল মালেক তদুত্তরে বলল আমিরুল মু'মিনীন ! আমি যখন জানি যে, যত বড়ই অপরাধ করি না কেন শেষ পর্যন্ত আপনার ক্ষমাই জয়ী হবে, তখন জেনে শুনে সত্য কথনের মত অমূল্য সম্পদ হাতছাড়া হতে দেব কেন ?

মামুন যদিও দেশের খুঁটিনাটি সব খবর রাখতেন এবং এই জন্যে তিনি লাখ টাকা খরচ করতেন, কিন্তু নিন্দুক ও অপবাদকারীদের ছিলেন তিনি প্রাণের শত্রু। এ সম্পর্কে তার একটা মন্তব্য স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকার যোগ্য। যখনই তাঁর সামনে কুৎসাকারীদের সম্পর্কে আলোচনা হ'ত, তখনই তিনি বলতেন—তাদের কথা আর কি আলোচনা করছ যাদের আল্লাহ্ সত্য ভাষণের জন্যে অভিশাপ দান করেছেন। যে ব্যক্তি কুৎসা গেয়ে আমার চোখে একবার স্বীয় মর্যাদাহানি ঘটিয়েছে, সে কোন দিনই তার প্রতিকার করতে পারবে না।

মামুন যদিও খুব শান-শওকতের বাদশাহ ছিলেন এবং ইতিহাসবেত্তারা জগদ্বিখ্যাত বাদশাহদের দফতরে তাঁর শৌর্য-বীর্যের কাহিনীই স্পষ্টাক্ষরে লিখে গেছেন, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে তাঁর জীবনেতিহাস উজ্জ্বল হয়েছে সংস্বভাব ও সরল প্রাণের গরীমায়। সমগ্র মুসলিম জাহানের শাহী তখতে আরোহণ করে যেভাবে তিনি জনসাধারণের সাথে সাধারণ মানুষের মত মেলামেশা করে ফিরতেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। অধিকাংশ আলেম ও পণ্ডিত ব্যক্তিই তাঁর অতিথি হবার এমন কি তাঁর সাথে একত্রে শোবারও সুযোগ লাভ করেছেন যেন গভীর হৃদ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ বন্ধুত্বের পারস্পরিক যোগাযোগ।

কাজী ইয়াহিয়া এক রাত্রে তাঁর মেহমান হলেন। হঠাৎ অর্ধরাত পার হতেই তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং পিপাসা অনুভব করলেন। চোখ-মুখে এ জন্যে তাঁর অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল, তাই মামুন পাশ থেকে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—ভাল আছেন তো ?

কাজী সাহেব তখন পিপাসার কথা উল্লেখ করলেন। মামুন নিজেই উঠে গিয়ে অন্য কোঠা থেকে সোরাহী নিয়ে এলেন। কাজী সাহেব তা দেখে বিচলিত হয়ে বললেন—ভৃত্যকে বললেন—না কেন ? মামুন জবাব দিলেন—না, প্রিয় রসুল বলেছেন···জাতির সেবকই জাতির নায়ক।

রাত্রে যখন দাস-দাসী সব শুয়ে পড়ত, তিনি নিজেই সব বাতি নিবিয়ে বিছানাপত্তর ঠিক করে শুতেন।

একবার তিনি বাগানে বেড়াতে গেলেন। কাজী ইয়াহিয়াও তাঁর সংগে ছিলেন। মামুন তাঁর হাতে হাত রেখে ঘুরে ফিরে দেখছিলেন। যাবার সময়ে রোদ্দুর কাজী সাহেবের ওপরে ছিল এবং মামুন তাঁর ছায়ায় গিয়েছিলেন। আসার সময়ে ব্যাপারটা বিপরীত হয়ে গেল। কাজী সাহেব তাই স্থান বদল করতে চাইলেন। কিন্তু মামুন বাধা দিয়ে বললেন—তা কখনও ইনসাফের কাজ হতে পারে না। যাবার সময়ে আমি ছায়ায় ছিলাম ; এখন ছায়ায় থাকার অধিকার আপনার।

মামুনের এই উদার স্বভাব ও সারল্যকে আরব বংশের প্রভাব বলে মেনে নেয়া চলে না। কারণ, আব্বাসীয় বংশ অবশ্য আরবের বিখ্যাত ভদ্র খান্দান সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রায় শতাব্দীকাল ধরে তারা শাহী তখতের মালিক মুখতার হয়ে মেজাজটাও শাহী মেজাজ করে ফেলেছিল। খলীফা মাহদীর আগে তো কোন খলীফাকে দেখার সৌভাগ্যও জনসাধারণের হ'ত না। সিংহাসনের বিশ হাত দূরে এক পর্দা টানানো থাকত। দরবারের লোকজন তারও কিছু দূরে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকত। খলীফা পর্দার আড়ালে বসে যত সব ফরমান জারী করতেন। মাহদী যদিও বাদশাহ্‌র মুখের এ ঘোমটা তুলে দিয়েছিল, তথাপি নানা ধরনের বিধিনিষেধ ও রীতি-নীতির বেড়ি তখনও বিদ্যমান ছিল।

মামুনের পূর্ব পর্যন্ত সব খলীফার দরবারে সে ধরনের প্রতিবন্ধকতা অব্যাহত ছিল। মামুনের একবার হাঁচি এল। দরবারে উপবিষ্টদের ভেতর থেকে কেউই রসুলের সুন্নত পালনার্থে "ইয়ারহামুকুল্লাহ" বলল

না। মামুন তার কারণ জানতে চাইলেন। সবাই সমস্বরে বলে উঠল—শাহী দরবারের বিধানে তা নিষিদ্ধ ছিল। মামুন তৎক্ষণাৎ বললেন—আমি সেসব বাদশাহ্‌র দলে নই, যাঁরা দোয়া চায় না। যেহেতু মামুন এসব অহেতুক বাড়াবাড়ি আদৌ পছন্দ করতেন না, তাই দরবারের সবাই যেন দরবারী রীতিনীতির নামে অযথা হয়রানির থেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

এতকিছু সত্ত্বেও এ কথা ভাবলে ভুল হবে যে, মামুনের এই উদারতা ও সারল্য তার ভেতরকার শাহী প্রভাব ও প্রতিপত্তি দূর করে দিয়েছিল। তাঁর দৈনিক খানাপিনার জন্যে দশ হাজার দিরহাম খরচ হ'ত। জনৈক ইউরোপীয় ঐতিহাসিক খুলাফায়ে রাশেদীনের সরল জীবন যাপনের সাথে এ যুগের খলীফাদের জীবন-যাপন পদ্ধতির এক আশ্চর্য বৈসাদৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছেন।

তিনি লিখেছেন ঃ

হযরত উমর (রা.) সিরিয়া সফরে বের হলেন, তখন তাঁর এই দীর্ঘ সফরে প্রয়োজনীয় সব বস্ত বহনের জন্যে মাত্র একটা উটই যথেষ্ট ছিল। পক্ষান্তরে, মামুন যখন শিকারে বের হ'ত, তখন এই স্বল্পকালীন প্রমোদ ভ্রমণের জন্যে তার সাধারণ মালপত্তর বহন করতেই তিনশ উট যথেষ্ট ছিল না।

উমাইয়া শাসকদের থেকে এই শাহী জাঁকজমক শুরু হয় এবং মামুন পর্যন্ত এসে মাত্র এ কয়টি বছরের ভিতরে ইসলামের খলীফাদের জীবন পদ্ধতিতে এত বড় বিপ্লব সাধিত হল, যা কল্পনাও করা অসম্ভব।

মামুনের সৎমা যোবায়দা খাতুন ছিলেন অত্যন্ত রুচিবতী নারী। তাঁর উদ্ভাবনী ক্ষমতা এতখানি ছিল যে, নারীদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকারাদির ব্যাপারে তিনি আবহমান কালের ধারাকে সম্পূর্ণ নতুন খাতে বইয়ে দিলেন। তিনি এমন সব নতুন পোশাক ও অলংকার আবিষ্কার করলেন যা সর্বত্র সানন্দে ও আগ্রহভরে ব্যবহৃত হতে থাকে। দরবারের সব আমীর উমরাহ্‌ ও জ্ঞানী-গুণীরা তার সমাদর করত। আম্বরের সুগন্ধি 'আগর বাতি' পয়লা তিনিই তাঁর নিদ্‌মহলে প্রজ্জ্বলিত করেন। মণিমুক্তা খচিত জুতা তাঁরই আবিষ্কার। রৌপ্য, আব্‌নুস ও সুগন্ধি কাঠ দ্বারা গম্বুজ তৈরী তিনিই পয়লা করিয়েছিলেন এবং সেগুলোকে বিভিন্ন রঙের রেশম ও পশম দ্বারা সাজিয়েছিলেন। কাপড় তৈরীর ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টায় যথেষ্ট

উন্নতি ঘটেছিল। তাঁর ব্যবহারের জন্যে এক এক থান কাপড় তৈরীর খরচ ছিল পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা।

মামুনের এক বিয়ের অনুষ্ঠান এত জাঁকজমকপূর্ণ হয়েছিল যে, সে যুগের ব্যয়বাহুল্যের সেটাই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ নজীর। আরব ইতিহাসকারদের দাবী এই যে, অতীতে ও বর্তমানে আজ পর্যন্ত এমন কোন অনুষ্ঠান এর চাইতে জাঁকজমকপূর্ণ ও ব্যয়বহুল হয়নি। আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞানে যতখানি জানি তাতে তাদের সে দাবীর কেউ প্রতিবাদ করতে সমর্থ হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

এই সৌভাগ্যবতী কনে ছিলেন মামুনের উযীরে আযম হাসান বিন সহলের কন্যা। ফজল বিন সহলের পরে তিনি উযীরে আযম পদে অধিষ্ঠিত হন। কন্যাটির নাম ছিল বুরান। খুবই শিক্ষিতা ও যোগ্যা নারী ছিলেন তিনি।

মামুন তাঁর খান্দানের সব লোক, দরবারের সব সদস্য, রাষ্ট্রের সব উল্লেখযোগ্য নেতা, বিভিন্ন এলাকার সব শাসনকর্তা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সেনাবাহিনীর সব সৈন্য ও সেনানায়ক এবং সমস্ত দাস-দাসী নিয়ে হাসান বিন সহলের মেহমান হয়েছিলেন। একে একে উনিশ দিন ধরে মহা ধুমধামে এই মেহমানদারী চলল। সাধারণ থেকে সাধারণতর ব্যক্তিও উনিশ দিনের এই শাহী জীবনের অংশীদার হতে পেরেছিল।

হাশিমী খান্দানের লোক, সেনানায়ক দল ও রাষ্ট্রের সব কর্মকর্তাকে মিশক ও আম্বর মাখানো বটিকা তৈরী করে ছুঁড়ে দেয়া হল। তাতে যে সব কাগজ জড়ানো ছিল তার ভেতরে কোনটায় নগদ টাকা কোনটায় সুন্দরী দাসী, কোনটায় সুন্দর ভৃত্য, কোনটায় বিশেষ বিশেষ রাজ্য, কোনটায় বিশেষ ধরনের শাহী উপঢৌকন, ঘোড়া জায়গীর ইত্যাদির সংখ্যা উল্লেখ ছিল। বলা বাহুল্য, যার হাতে যে বটিকা পড়ল সে সেই সবের মালিক হল। তাতে এ নির্দেশ লেখা ছিল যে, যার হাতে যে বটিকা আসবে, তাঁকে তক্ষুণি রাজভাণ্ডার থেকে তা আদায় করে দেয়া হবে।

সর্বসাধারণের জন্যেও মিশক ও আম্বরের বটিকা উৎসর্গ করা হল এবং দীনার ও দিরহাম ছুঁড়ে দেয়া হল।

মামুনের জন্যে বড়ই জাঁকজমকপূর্ণ এক বিছানা পাতা হল। সোনার তারকায় ছিল তা ভরপুর। মণিমুক্তা খচিত ছিল সে বিছানা। মামুন

যখন সেখানে বসলেন, মহামূল্যবান অজস্র লাল জহরৎ, পান্না, চুনি উৎসর্গ করা হলো তার চরণে। সেগুলো ছড়িয়ে পড়ল সারা বিছানা জুড়ে। ফলে অপূর্ব দ্যুতিতে ঝলমল করে উঠল সে বিছানা। অমনি মামুনের মনে পড়ল আবু নোয়াসের এক কবিতা। তা থেকে দুটা চরণ আবৃত্তি করে তিনি বললেন—আজ আবু নোয়াসের কল্পিত অপূর্ব দৃশ্য স্বচক্ষে দেখলাম। কবিতার দু'লাইন এরূপ ঃ

كان صغرى وكبرى من فواقعها

حصباء در على ارض من الذهب

(কানা সুগরা ওয়া কুবরা মিন কওয়াকি'উহা
হিসাআ দুর্‌রা 'আলা আরদি মিনায্ যাহবি।)

জামে শরাবের বুদ্বুদগুলো যেন
সোনার ভূমিতে ছড়ানো মুক্তা হেন।

মিলনের রাতে যখন বর-কনে একত্রে বসলেন, বুরানের দাদী মহামূল্য মণিমুক্তা উভয়ের ওপরে ঢেলে দিলেন।

মোট কথা, এই বিবাহ অনুষ্ঠানের সর্বমোট খরচ ছিল মাত্র পাঁচ কোটি দিরহাম।

আরব ইতিহাসকাররা মামুনের দান-দক্ষিণা ও উদারতা নিয়ে যথার্থই গৌরব করে থাকেন। কারণ, মামুনের জীবনেতিহাস সেসবের বিস্ময়কর উদাহরণে ভরপুর। তাঁর এ গুণ সম্পর্কে যতখানি বাড়িয়ে বলা কল্পনা করা যেতে পারে, তিনি অহরহ তাই বাস্তবায়িত করে গেছেন। বিখ্যাত ইতিহাসকার গীবন লিখেছেন ঃ

"মামুনের মহানুভবতার প্রশংসায় রাষ্ট্রের কর্মকর্তারা পঞ্চমুখ ছিলেন। কারণ, ঘোড়ার রেকাব থেকে পা তুলে আনার আগেই তাঁরা নিজ নিজ জেলার সর্বমোট আমদানীর চার পঞ্চমাংশ বিশ লাখ চার হাজার দীনার পেয়ে যেতেন। এ তো সামান্য একটা উদাহরণ মাত্র। কবি সাহিত্যিক ও বিভিন্ন বিষয়ের পণ্ডিতদের হাজার বা লাখ দিরহাম বখশিশ দেয়া মামুনের নিত্যকার স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। মুহাম্মদ বিন ওহায়েবের রচিত এক প্রশংসাগীতির বিনিময়ে তিনি নির্দেশ দিলেন যে, তার প্রতিটি লাইনের পরিবর্তে এক হাজার দিরহাম দেয়া হোক। তাতে মোট পঞ্চাশটি চরণ ছিল এবং তাতে তার বিনিময়ে পঞ্চাশ হাজার দিরহাম দেয়া হল।"

বুরানের বিয়েতে জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি উপঢৌকনস্বরূপ লবণ ও গোসলের সুগন্ধি উপকরণ দু'বস্তা পাঠিয়ে দিয়ে লিখল—যদিও দারিদ্র্যের চাপে সাহস ভেংগে যায়, তথাপি উপঢৌকনদাতাদের দফতরে আমার নাম থাকবে না এটা পছন্দ হল না। লবনের বরকত ও সুগন্ধি উপকরণের আনন্দ আমার বিবেচনায় হুজুরকে উপঢৌকন দানের জন্যে যথাযোগ্য বিবেচিত হয়েছে।

মামুন এ সামান্য উপঢৌকন পেয়ে এতই খুশী হলেন যে, তক্ষুণি নির্দেশ দিলেন বস্তা দুটো আশরাফী পূর্ণ করে ফেরৎ দেবার জন্যে।

এ ধরনের অজস্র উদাহরণ মামুনের বদান্যতার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই। আমাদের শিক্ষিত তরুণরা তো এশিয়ার ইতিহাসবেত্তাদের বাক্য-বাগীশ ভেবে বিশ্বাসই করতে চায় না। এটা আমাদের মারাত্মক ভুল যে, বর্তমান শাসকদের সামনে রেখে আমরা অতীতের শাসকদের কার্যকলাপ ধারণা করতে চাই। নবীনরা আজ এ ধরনের বর্ণনাকে অতিরঞ্জন ভাবতে শিখেছে। তারা ভাবে যে, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন খাতে ব্যয় করে এবং দেশরক্ষা ও দেশ জয়ের কাজে অজস্র অর্থ ব্যয় করে এত টাকা তাঁরা পেতেন কোথায়? অথচ তারা ভুলে যায় যে, অতীতে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের এত বেশী খাত ছিল না এবং ফৌজ ও অন্যান্য বিভাগে বেতনাদিও এত বেশী ছিল না। তাই সেসব খরচ সেরেও রাজ-ভাণ্ডারে অজস্র অর্থ জমে যেত। সেগুলোই এভাবে দান-দক্ষিণায় ব্যয় করা হতো। অবশ্য আজকে আমাদের দৃষ্টিতে তাঁদের সে সব মহানুভবতার কাজগুলো বাহুল্য বলেই মনে হয়। তবে এসব ঐতিহাসিক ঘটনাবলী থেকে আমাদের বেশ কিছু উপদেশ লাভ করার রয়েছে। মাত্র দু'শতাব্দীর ব্যবধানে ইসলামের খলীফাদের জীবন ধারার যে বিস্ময়কর বিপ্লব সাধিত হয়েছে, তা সত্যিই ভাবনার বিষয়। খলীফা উমর (রা.) একবার মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—আমার কথা শোন ও মেনে চল। তাঁর এ ধ্বনি শেষ হতে না হতেই এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলল—শুনব না এবং মানবও না। হযরত উমর (রা.) অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কেন ভাই? সে জবাব দিল—ইয়ামনের চাদর সব মুসলমানদের ভেতরে সমানভাবে ভাগ করে দেবার কথা। তাতে তারা যে অংশ পেয়েছে, তুমিও তাই পাবে। অথচ তোমার দেহে যে জামা দেখছি তা গড়তে অবশ্যই সেটুকু অংশের চাইতে বেশী কাপড় লেগেছে। তোমাকে বেশী পাবার অধিকার কে দিয়েছে? হযরত উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে

তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ্ এ প্রশ্নের জবাব দিলেন। তিনি বললেন—আব্বার জামা তৈরীতে যেটুকু কাপড় কম পড়েছিল, আমার অংশ থেকে তা পুরা করে দিয়েছি। এ উত্তর পেয়ে খুশী হয়ে বেচারা বসে গেল এবং বলল—হ্যাঁ। এখন তোমার কথা শুনব এবং মানব।

এই ঘটনার সাথে মামুনের যুগের অমিতব্যয়িতার তুলনা করুন। তাদের এতসব বাহুল্য খরচের বিরুদ্ধে সমালোচনা করার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা ছিল না কারোর। গোটা 'বায়তুল মাল' (জনসাধারণের ধনভাণ্ডার) এক ব্যক্তি অধিকার ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। তিনি যেভাবে ইচ্ছা মুক্তপ্রাণে খরচ কর চলতেন। এর থেকে আমরা এটাও অনুমান করে নিতে পারি যে, তখন কার দিনে রাষ্ট্রীয় পদসমূহের সংখ্যা ছিল নগন্য এবং তাদের বেতনও ছিল অল্প।

আমাদের পাঠকরা যে মামুনকে হাদীস ফিকাহ্র আলোচনায় সতত মশগুল দেখে এসেছেন, জ্ঞানীদের সাথে অহরহ জ্ঞানচর্চায় নিয়োজিত দেখে ছেন, অবাক হয়ে দেখতে পাবেন যে, তিনি প্রমোদ মজলিসেও সামনে উপস্থিত আছেন। খোলা প্রাণের খোশালাপে বন্ধু বান্ধব জুটেছে এক পাশ ডানাকাটা পরীর মত দাসীরা ঘিরে আছে সবাইকে। শরাবের সয়লাব ব চলছে। ফুলবদনী দাসীরা গান জুড়েছে ললিত কন্ঠে। বন্ধুরা শরাব গানে প্রভাবে বেহুঁশ হয়ে চলেছে।

অবশ্য খিলাফতের পয়লা বিশ মাস মামুন এসব থেকে একেবারেই দূ ছিলেন। এর পরই আবার তাঁর পুরনো আকাঙ্ক্ষা মাথা চাড়া দিল। ত এরপর থেকে তিনি মাঝে মাঝে গানের আসরে বসতেন। এ অবস্থাও তাঁ বছর চারেক অব্যাহত ছিল। তারপর থেকে এমনি অবস্থা দাঁড়ান যে একদিনও তিনি প্রমোদ মজলিস ছাড়া কাটাতে পারতেন না।

কিন্তু যদি ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখা হয়, তা হলে এতে তেমন আশ্চর্যে কি থাকতে পারে? স্বাধীন স্পৃহা, নির্ভিকতা, আমুদে স্বভাব, যৌবনে উম্মাদনা প্রভৃতি তো সর্বদা কৃচ্ছতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এসে এতো শুধু মামুনের বেলায়ই নতুন নয়। সে সময়কার প্রায় গোটা ইসলা সমাজ এমনই ভোগ বিলাসময় ছিল। সে যুগে মুসলমানদের শান্তি, স্বচ্ছ লতা, ও ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ছিল। তাই আর কোন বস্তু তাদের জীবনে চরম লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে? একমাত্র ধর্মের কঠোর অনুশা

এ পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তাও ভোগের প্রয়োজনে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তন করে নেওয়া হয়েছিল। শরাবের স্থলে নাবীজ (খেজুরের তাড়ী) মওজুত ছিল। ইরানের ধর্মীয় নেতারা তো সেটাকে হালাল করেই দিয়েছিলেন। অসংখ্য দাসী রাখার প্রথা পাশবিক বাসনা চরিতার্থ করার পূর্ণ সুযোগ করে দিয়েছিল। গান-বাজনাকে তো জ্ঞানচর্চার অন্যতম অংগ মনে করা হ'ত।

বনু উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলীফাদের ভেতরে এরূপ কোন খলীফা ছিলেন না যিনি সঙ্গীতের সাথে সংযোগ রাখতেন না। বড় বড় ধর্মীয় নেতারাও গানের মজলিস থেকে দূরে থাকতেন না। মহান খলীফা উমর ইবনে আবদুল আজীজও গানের বহু সুরের স্রষ্টা।

মামুনের দরবারে গায়কদের একটা বিরাট দল মওজুদ ছিল। তারা সংগীত বিদ্যার চরম উৎকর্ষ সাধন করে গেছে। তাদের ভেতরে মোহারেক, আলুভিয়া, আমর বিন বানাতা, উকায়েদ ইয়াহিয়া, মকী সোসান, মরযুদ প্রমুখ এ বিদ্যার প্রবর্তক হিসেবে গণ্য। কিন্তু ইসহাক মুসেলী সবচেয়ে অধিক খ্যাতিলাভ করেছেন।

ইসহাকের পিতা ইবরাহীম সংগীত বিদ্যার অন্যতম গুরু ছিলেন। খলীফা হারুন-অর-রশীদের দরবারে এ বিদ্যা শিখিয়ে তিনি মাসিক দশ হাজার দিরহাম লাভ করতেন। ইসহাক সাহিত্য, কোষ্ঠীনামা, কাহিনী, ধর্মশাস্ত্র ও ব্যাকরণে মৌলিক গবেষণায়ও পণ্ডিত ছিলেন। এটা একটি শিক্ষণীয় ব্যাপার যে, সংগীত শাস্ত্রের পারদর্শিতার খ্যাতি তাকে অন্যসব মর্যাদাপূর্ণ সুনাম থেকে বঞ্চিত করে নগণ্য গায়কের পর্যায়ে নিয়ে এসেছিল। কিছুতেই সে তার এই অনভিপ্রেত খ্যাতি চাপা রাখতে পারেনি। অবশ্য সে এ খ্যাতি খুবই ঘৃণ্য ভাবত। কিন্তু জনসাধারণের অসংখ্য মুখ সে কি করে বন্ধ রাখবে? মামুনেরও এ আক্ষেপ ছিল যে, ইসহাক বিচারক হবার যোগ্যতা রেখেও গায়ক নামে খ্যাত হওয়ার কারণে উচ্চমর্যাদা লাভ করতে সমর্থ হতে পারে নি। তবুও তাকে এতটুকু মর্যাদা দেয়া হয়েছিল যে, খলীফার সহ-চরদের দফতরে তারও নাম লেখা হয়েছিল। ইসহাক এতেও তৃপ্তি হতে পারেনি। তাই সে একবার মামুনের কাছে প্রার্থনা জানাল যে, খলীফার কালো চাদর জড়িয়ে যেন সে মসজিদের মকসুরায় (বাদশাহ্র নামাযের স্থান) প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়। মামুন মৃদু হেসে বললেন—ইসহাক!

তাতে তোমার কোন কাজ হবে না। তোমাকে এ প্রার্থনার বিনিময়ে আমি একলাখ দিরহাম দিচ্ছি। এই বলে তিনি নির্দেশ দিলেন যে, এক্ষুণি ইসহাকের ঘরে একলাখ দিরহাম পৌঁছিয়ে দাও।

ইসহাক বর্ণনা করে গেছে—"শিক্ষালাভের পর্বটা আমার এরূপ কেটেছে যে, দীর্ঘ দিন ধরে আমার নিত্যকার প্রোগ্রাম ছিল এই যে, সকালে তুর্কে হাশীমের সমীপে হাজির হয়ে হাদীস শুনতাম। এর পরে কাসাঈ অথবা ফর্রার কাছে গিয়ে কুরআন শিখতাম। সেখান থেকে গিয়ে মুনসেনের কাছে বাদ্য বাজানো শিখতাম। তারপর শোহদার থেকে রাগরাগিনী সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতাম। এসব শেষ করে গিয়ে আসমাঈ এবং আবু উবায়দার খিদমতে হাজির হয়ে কিছু স্বরচিত কবিতা শুনতাম এবং কিছুটা সাহিত্য-চর্চাও করে আসতাম। সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে সারাদিন যা শিখে এলাম তা' এক এক করে শোনাতাম।"

সে আরও বলেছে—আমি বিভিন্ন সময়ে কিছু কিছু করে যখন এক লাখ দিরহাম মুনসেনকে নজর দিতে পেরেছি, তখন আমার বাজানো শেখা শেষ হয়েছে।

খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ্ প্রায়ই বলতেন—ইসহাক যখন গাইতেন, তখন আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভাবতাম যে, আমার রাজ্যে নিশ্চয়ই মঙ্গল নেমে এল

ইসহাক তার রচিত পুস্তকে সংগীত বিদ্যার যেসব নিয়ম পদ্ধতি লিখে গেছেন, তা গ্রীক গবেষণার সাথে প্রায়ই মিলে যায়। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সে ইউনানী ভাষা জানত না এবং এ বিষয়ে কোন অনুবাদ বইও ছিল না। তাই সব পণ্ডিতরাই পরবর্তীকালে অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করল যে, এ বিষয়ের স্রষ্টা হিসেবে পিলানোরাসের চাইতে সে কোন অংশে কম দাবীদার নয়।

এই গায়কদল ছাড়া আরেকটি দলও মামুনের মজলিসকে উজ্জ্বল করেছিল। রোম ও এশিয়া মাইনরের বহু অনিন্দ্যসুন্দরী নারী যুদ্ধে মালে গনিমত হিসাবে নীত হয়ে বাজারে বিক্রী হ'ত। দালালরা তাদের সস্তা দামে কিনে নিয়ে নাচ, গান, কাব্য রচনা, সাহিত্য, হস্তলিপি, উপস্থিত বুদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শী করে বেশ চড়া দামে বাজারে বিক্রী করত। মামুনের নিদ্‌মহলে এ ধরনের ডানাকাটা পরীদের একটা দল সর্বদাই থাকত।

যাদের খরিদ ও প্রতিপালনে রাজভাণ্ডারের বিরাট একটা অংশ ব্যয় হ'ত।

একদা এক দাসী বিক্রয়ার্থে আনা হল। তার জ্ঞান গরীমা মার্জিত ভাষা, সাহিত্য প্রতিভা ও কথাবার্তায় পারদর্শিতার জন্য তার মূল্য বিক্রেতা দাবী করল দু'হাজার দীনার। মামুন বললেন, আমি একটা কবিতার চরণ বলব, সে যদি দ্বিতীয় চরণ বলতে পারে তা হলে যা দাবী করছে তার চাইতেও বেশী কিছু দেয়া হবে। মামুন পড়ল ঃ

ما تقولين فيمن شفه أرق من جهد حبك حتى صار حيرانا

(মাতাকুলীনা ফীমন সকাহু আদক্কু মিন
জাহদি হুব্বিকা হাত্তা সারা খরক্ক আনা)

দাসীটি তৎক্ষণাৎ বলে দিল ঃ

إذا وجدنا محبا قد أضر به داء الصبابة أوليناه إحسانا

ইযা ওবাজাদনা মুহিব্বান কাদ আবররাহু
দাআস্ সব্বাবাতি আওয়ালনাহ্ ইহসানা

মামুন খুশী হয়ে বেশ কিছু বেশি মূল্যেই তাকে ক্রয় করল।

উরায়ের নাম্নী এক দাসী ছিল সর্ববিষয়ে সমান পারদর্শী। তাকে এক লাখ দিরহামে খরিদ করা হয়। সে ছিল মামুনের বিশেষ প্রেয়সী। সে হাজার রাগ আবিষ্কার করেছিল। স্বয়ং ইবরাহীমও তার কতিপয় রাগ কণ্ঠে অনুসরণ করতে সমর্থ হ'ত। তার যোগ্যতা সম্পর্কে এতটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, আরবের শেষ কবি ও ইলমেবদী'র প্রবর্তক খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ্ তার প্রসংগে স্বতন্ত্র একখানা পুস্তক লিখেছিলেন।

উরায়ের একবার কোন এক ব্যাপারে মনঃকষ্ট পেয়ে মামুনের সাথে মেলামেশা ছেড়ে দেয়। মামুন তখন কাজী আহমদ বিন আবু দাউদকে গিয়ে অনুরোধ জানালেন একটা মীমাংসা করে দেবার জন্যে। দাসী তা আড়াল থেকে শুনতে পেয়ে তক্ষুনি গেয়ে উঠল ঃ

فخلط الهجر بالوصال ولا يدخل في الصلح بيننا أحد

(ফখিলতুন হিজরা বিল বিসালে ওয়ালা
য়াদখুলু কিস্‌সুলহি বায়নানা আহাদুন।)

সন্দেহ নেই মিলন মোদের

দূর হটাবে এই বিরহ
তাই বলে সে মিলন মাঝে
কাজ দিবে না অন্য কেহ।

মামুনের অন্য এক দাসীর নাম ছিল 'বজল'। সংগীত শাস্ত্রের গুরুদের অন্যতমা সে। আলী বিন হিশাম তার সাত হাজার রাগ নিয়ে লেখা একখানা পুস্তক দশ হাজার দিরহাম দিয়ে খরিদ করেছিলেন। আল্লামা আবুল ফারাজ ইস্পাহানী 'উরায়ের' ও 'বজলের' চিত্তাকর্ষক জীবনেতিহাস প্রসংগে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাবুল আগানী'-এর বিশ পৃষ্ঠা উৎসর্গ করেছেন। পাঠক বন্ধুরা ইচ্ছে হলে সেটা একবার দেখে নিতে পারেন।

সেযুগে আমীর-উমারাহ্ ও স্বচ্ছল পরিবারে প্রায়ই দাসী থাকত। যেহেতু প্রত্যেক পরিবারেই স্বামীরা স্ত্রীদের সমান অধিকারই লাভ করত, তাই তার মুক্তির ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাত না।

মামুনের বিলাসের মজলিসে যদিও রঙ্-বেরঙের আমোদ-প্রমোদের ব্যাপার চলত, তবুও তা জ্ঞানচর্চা থেকে বিরত ছিল না। যদি এ ধরনের জলসা মার্জিত রুচির প্রভাবে কাব্য ও সাহিত্য চর্চার প্রেরণাস্থল হিসেবে সর্বোতোভাবে ব্যবহৃত হয়, তা হলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে তা অত্যন্ত সুফলদায়ক হয় তাতে সন্দেহ নেই। মজলিসে অংশগ্রহণকারী সহচররা সবাই ছিলেন বড় বড় পণ্ডিত ও সমালোচক। কথায় কথায় কবিতা সৃষ্টি হ'ত। কখনও সংগীতের গুণাগুণ নিয়ে বহাস শুরু হ'ত। কখনও মামুনের সৃষ্ট কবিতার ওপরে অপরাপর কবিদের কবিত্বের পরীক্ষা চলত।

চিত্তবিনোদনের এক মজলিস বসলে শরাব ও সাকীর লীলাখেলা চলত। বিশজন ঈসায়ী দাসী শেমের ঝলোমলো বস্ত্রে আবৃত হয়ে কাঁধে স্বর্ণের বেড়ি লাগিয়ে কোমরে সোনালী পৈতা ঝুলিয়ে হাতে রঙিন ফুলের মালা জড়িয়ে গুলজার করত সে জলসা। এ পরিবেশে মামুন কিছুতেই তার মনকে সামলাতে পারতেন না। অজ্ঞাতে তার মুখ থেকে অনর্গল কবিতা বেরিয়ে আসত। আহমদ বিন সাদকা নামক গায়ককে ডেকে তার সেই কবিতায় সুর দিতে বললে আহমদ সুর দিয়ে তা গাইতে শুরু করল। সাথে সাথে ঝুমুর ঝুমুর তালে নৃত্য করে চলল বিশজন দাসী। তাদের মদিরা প্রভাবিত ঢুলু ঢুলু চাউনি ও শরাব সাকীর লীলা মামুনকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছিল। নেশায় বেহুঁশ হয়ে কখন যে তিনি দাসীদের প্রত্যেকের

চরণে তিন হাজার করে আশরাফী লুটিয়ে দেয়ার আদেশ করেছেন, তাঁরও তিনি বুঝতে পারেন নি।

মামুনের চাচা ইবরাহীম যিনি খিলাফত দাবী করেছিলেন এবং যিনি সংগীত শাস্ত্রে ইসহাকের সমপারদর্শী ছিলেন, মামুনের এক চিত্তবিনোদনের এক মজলিসে তিনি উপস্থিত ছিলেন। মামুনের ডানে ও বামে বিশ জন পরী বিশেষ এক রাগ বাজিয়ে চলছিল। এমন সময় ইসহাক এসে উপস্থিত হল এবং এসেই সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

মামুন তা দেখে প্রশ্ন করলেন—ওভাবে দাঁড়ালে কেন? কোন ত্রুটি পেলে কি বাজনার ভেতরে?

ইসহাক – হাঁ, হুজুর।

ইবরাহীমের দিকে চেয়ে মামুন জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কি বলেন এ সম্পর্কে? ইবরাহীম—না, কোনই ত্রুটি নেই।

মামুন তখন ইসহাকের দিকে তাকালেন। ইসহাক বলল—আমি এখন নির্দিষ্ট করে বলে দিতে পারি যে, এই কাতারে কারুর সেতারে ভুল রাগিনী বাজছে। ইবরাহীম তখন সেদিকে কান পেতে আবার শুনে নিলেন। তবুও তিনি কোনরূপ ত্রুটি আবিষ্কার করতে পারলেন না।

ইসহাক তখন এক বিশেষ দাসীর দিকে ইংগিত দিয়ে বলল—ও এখন একাই বাজাবে। আর সবাই বন্ধ করবে বাজনা।

এতক্ষণে ইবরাহীম টের পেলেন এবং স্বীয় অজ্ঞতার জন্যে লজ্জিত হলেন। মামুন তখন বললেন—চাচা! এতগুলো লোকের সমান বাজনার ভেতরে সূক্ষ্মতম ব্যতিক্রমও যার কান এড়ায় না তার সাথে কি করে আপনি সমকক্ষতা দাবী করেন?

এটাই ছিল প্রথম দিন, যেদিন ইবরাহীম ইসহাকের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিলেন। একদিন মুতাসিম মামুনকে দাওয়াত করলেন। যে ঘরে তাঁর মেহমানদারীর ব্যবস্থা হল, তার ছাদের ওপরে এখানে সেখানে সাজানো দীপগুলোতে কাঁচ লাগানো ছিল। মজলিসে আহমদ ইয়াযিদী ও সায়মা তুর্কীও ছিল। তারা মুতাসিমের খাস ভৃত্য ও সৌন্দর্যসুষমায় অদ্বিতীয় ছিল। সূর্যের আলো রঙিন কাচে পড়ে তার প্রতিচ্ছবি যখন সায়মার ওপরে পড়ল তখন তাকে অদ্ভুত সুন্দর বলে মনে হল। মামুন তা দেখে উচ্ছ্বসিত কন্ঠে বলে উঠল,

"দেখ দেখ, সূর্যের প্রতিবিম্ব এসে সাগ্নমাকে কিরূপ অপরূপ সুন্দর করছে"। মামুন তক্ষুণি কবিতা রচে ফেললেন—قد طلعت الشمس على شمس

কাদ তালা 'আতিশ শামসু আলা শামসিন।

অর্থাৎ সূর্যের ওপরে জ্বলছে সূর্য। যদিও ওটা মামুনের সাময়িক রসিকতা ছিল, তবুও মুতাসিম চিন্তিত হল ভৃত্য হারাবার ভয়ে। মামুন তা বুঝতে পেরে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—এতো নেহাৎ সাময়িক ব্যাপার।

দ্বিতীয় খণ্ড

আল মামুন

প্রথম খণ্ড